CONVERTED TO PDF

BY

--- RoNy

E-mail: tanvir_ahmad_rony@yahoo.com

(c) **Tanvir Ahmad rony**

Mechanical Engineering , Batch -2004

KUET

অশ্রুসিক্ত মাতৃভূমি

ফর ডিবেট অন ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ইস্যুজ



মোঃ ওসমান গনি

অশ্রুসিক্ত মাতৃভূমি

গ্রন্থনায় ঃ মোঃ ওসমান গনি

প্রকাশনায় ঃ এ, এইচ, ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউজ
ক-৭৯ কুড়াতলী, খিলক্ষেত, বাড্ডা, ঢাকা-১২১২
ফোনঃ ৮৮১৯৯২০, মোবাইলঃ ০১৭৫-০২২৯২৭

প্রথম প্রকাশ ঃ নভেম্বর, ২০০৪

ISBN-984-8360-012-8

পরিবেশনায় ঃ

সোসাইটি ফর ডিবেট অন ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ইস্যুজ (এস.ডি.এন.ডি.আই)	মহিউদ্দিন এন্ড সন্স
ফোন ঃ ৮০১৭৭৫১, ৮০১৬০৭২	১৪৩, নিউ মার্কেট
ফ্যাক্স ঃ ০৮৮-২-৮০১৭৭৫১	ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ
	ফোন ঃ ৮৬২৭৫০

তত্ত্বাবধানে ঃ টি.এ.এম নূরুল বাসার ● মশিউর রহমান
কো-চেয়ারম্যান, এস.ডি.এন.ডি.আই

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ মোঃ গোলজার হোসেন

প্রচ্ছদ ঃ পারফরম কালার গ্রাফিক (প্রাঃ) লিঃ

শুভেচ্ছা মূল্য ঃ বাংলাদেশ- ২০০ টাকা, বিদেশ-$ ১০ ডলার, € ৮ ইউরো

- বিষয়সূচী -

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
	• মুখবন্ধ	৬-৭
	• প্রসঙ্গ কথা	৮-১০
	• ভূমিকা	১১-১৫
এক.	এ এক বিস্ময়কর রাজনীতি	১৬-২৩
দুই.	প্রকৃত গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক চর্চা সংকটাপন্ন	২৩-৩১
তিন.	ব্যর্থমান শাসনে আইনের শাসন ও আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি বিপন্ন	৩১-৪২
চার.	চাঁদাবাজিতে স্বাভাবিক জীবন অতিষ্ঠ	৪২-৪৫
পাঁচ.	বাংলাদেশ দুর্নীতিতে 'বিশ্ব-সেরা' দেশ!	৪৫-৫৯
ছয়.	গণবিমুখ শিক্ষানীতি এবং বৈষম্যময় শিক্ষা পদ্ধতি দক্ষ জাতি গঠনে প্রতিবন্ধক	৬০-৬৫
সাত.	শিক্ষাঙ্গন দক্ষ শিক্ষক সংকটে, অনিয়মে এবং দলীয় রাজনৈতিক অপসংস্কৃতিতে দুর্দশাগ্রস্ত	৬৫-৭৪
আট.	মানব উন্নয়ন ও মানবাধিকার পরিস্থিতি হতাশাব্যঞ্জক	৭৪-৭৯
নয়.	অর্থনৈতিক অবকাঠামো ও পরিকল্পনা গণদারিদ্র্য বিমোচনে অপারগ	৮০-৯০
দশ.	কর-নীতি শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানে অনোপযোগী	৯০-৯২

চলমান পাতা →

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
এগার.	শিল্প-সংকোচন শিল্প খাতে বিরাজমান বিশৃংখলার ফলশ্রুতি	৯৩-৯৫
বার.	কৃষি খাত অবহেলিত — আধুনিকায়নের গতি মন্থর	৯৫-৯৮
তের.	স্থল-বন্দরগুলোর বিদ্যমান অবস্থা মর্মান্তিক	৯৮-১০০
চৌদ্দ.	সমুদ্রসীমা ও সমুদ্র বন্দর সর্বোচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ	১০০-১০১
পনের.	বিনিয়োগে জটিল পরিবেশ অর্থনীতির গতিরোধক	১০১-১০৬
ষোল.	বেকারত্বের গতি আশংকাজনক	১০৬-১০৮
সতের.	অফিস-আদালতে বিরাজমান পরিবেশ অরাজক	১০৮-১১০
আঠার.	আবাসিক পরিবেশ কর্তৃপক্ষের ঔদাস্য ও অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতিবিম্ব	১১০-১১১
উনিশ.	ধর্ম নিয়ে রাজনীতি ইসলামী আদর্শ বিশ্বাসে বিদ্যমান দুর্বলতা ও বিচ্যুতির ফসল	১১১-১১৫
বিশ.	গণমুখী স্বাস্থ্যনীতি ও ব্যবস্থার অভাবে জনস্বাস্থ্য রুগ্নকায়	১১৬-১১৮
একুশ.	ভারসাম্যহীন প্রাকৃতিক পরিবেশ ও আর্সেনিক-এর বিস্তৃতি মারাত্মক!!	১১৯-১২৩
বাইশ.	প্রাকৃতিক দুর্যোগ—বন্যা প্রলয়ংকরী ও সর্বগ্রাসী	১২৪-১৩৯
তেইশ.	টাইম ম্যাগাজিন ও দাতাদের দৃষ্টিতে বাংলাদেশ	১৩৯-১৪৩
•	উপসংহার	১৪৩-১৪৪

প্রসঙ্গ কথা

দেশ ও দেশের সমস্যাবলী নিয়ে গ্রন্থনায় এ আমার প্রথম প্রয়াস। বাংলাদেশের সমস্যা অনেক। এ গ্রন্থে আমি আমার নির্বাচিত সমস্যাগুলোকে সংক্ষেপে কয়েকটি অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট করার চেষ্টা করেছি। '৭০-এর দশকে নিরক্ষরতাই ছিল আমার কাছে দেশের একক প্রধান সমস্যা। সমস্যাটি নিরসনে দেশের সরকারকে সহায়তা করার লক্ষ্যে আমি আমার ক'জন বন্ধুকে নিয়ে ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ সাক্ষরতা সমিতি (বিএলএস) প্রতিষ্ঠা করি এবং একটি শিক্ষিত-উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্ন ও গভীর প্রত্যয়-প্রতিজ্ঞা নিয়ে একটানা সাতাশ বছর তার রূপায়নে নিরলস সংগ্রাম, সাধনা করি। সে সময় অর্থাৎ '৭০-এর দশকে নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতার কারণে দেশের প্রায় আশি শতাংশ প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ জীবনের মৌলিক অধিকার সম্পর্কেই সচেতন ছিল না। নিজ দেশের স্বাধীনতা ও বিজয় দিবস, ভাষা দিবস, নির্বাচন পদ্ধতি, সরকার পদ্ধতি ইত্যাদি জানার মৌলিক বিষয়গুলোতো তাদের কাছে 'বড় লোকদের' বিষয় বলেই মনে হতো। ফলে, এসব জানার কোন আগ্রহও তাদের মধ্যে কদাচিৎ লক্ষ্য করা যেতো। বিগত প্রায় তেত্রিশ বছরে তাদের মধ্যে এসব মৌলিক ক্ষেত্রে কতটুকু উন্নতি ঘটেছে তার কোন সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। তবে এ সময়ে দেশের লোকসংখ্যা বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হলেও সাক্ষর লোকের সংখ্যা যে সে পরিমানে বাড়েনি তা তো সচেতন দেশবাসী জানেন। দেশের অর্ধেকের বেশী প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ এখনও নিরক্ষর; প্রাথমিক স্কুলত্যাগী (School-Dropout) এবং স্কুল বহির্ভূতের (Out of School) সংখ্যা এখনও উদ্বেগজনক। জনসংখ্যা সমস্যাকে যুগ যুগ ধরে দেশের প্রধান সমস্যা বলে তা' নিয়ন্ত্রণে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে অনেক বড় বড় কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু তাতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়নি বরং তা' ১৯৭১ এর সাড়ে সাত কোটি থেকে বাড়তে বাড়তে ২০০৪ সালে প্রায় চৌদ্দ কোটি হয়ে গেছে। এ কারণে আমি এ গ্রন্থে জনসংখ্যা সমস্যাকে অন্যতম প্রধান সমস্যার তালিকায় না এনে মানব উন্নয়ন ও জনসংখ্যা পরিকল্পনার ওপর গুরুত্ব দিয়েছি, যার অনুপস্থিতির কারণে এ ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিরাজমান নিরক্ষরতা, অজ্ঞানতা, অদক্ষতা, বেকারত্ব ও দারিদ্র্য '৭০-এর দশকে আমাকে যেমন বিচলিত ও আহত করতো, নূতন মিলেনিয়ামের শুরুতে তা' আরও বেশী বেশী করে। ১৯৭৫ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত জীবনের এ সুদীর্ঘ পরিক্রমায় অর্জিত অভিজ্ঞতা আমাকে দেশ ও দেশের সমস্যা সম্পর্কে যতটা জ্ঞান-চেতনা দিয়েছে তার চেয়ে

অনেক বেশী বেদনা-ভারাক্রান্ত করেছে। কারণ, ইতোমধ্যে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ এক সমস্যাবহুল দেশে পরিণত হয়েছে। জাতীয় সমস্যাগুলোর কোনটিই এখন আর একক ভাবে প্রধান সমস্যা নয়। অনেক সমস্যার মধ্যে যেগুলো প্রধান প্রধান সমস্যা ছিল সেগুলোর অধিকাংশই ইতোমধ্যে মহাসমস্যা হয়ে উঠেছে এবং তার কোনটিই বিচ্ছিন্ন সমস্যা নয়; একটি অন্যটির পরিপূরক। 'সমস্যার দুষ্ট চক্রে' জাতির ঘোর-পাক খাওয়ার কথা আগে যেমন শুনেছি এখনও শুনি। সময়ের এত বড় ব্যবধানেও 'দুষ্ট চক্র'টি দুর্বল না হয়ে সবল হয়েছে। ফলে, আমাদের 'এত চেষ্টা' সত্ত্বেও দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে তেত্রিশ বছরেও তার 'রানওয়ে' ধাপ থেকে 'টেক-অফ্' ধাপে নিয়ে যেতে আমরা সক্ষম হতে পারিনি; কবে পারা যাবে তা'ও নিশ্চিত করে বলতে পারি না। কারণ, ইতোমধ্যে সমস্যার দুষ্ট চক্রে অনেক মহাসমস্যারও সমাবেশ ঘটেছে। যেমন- বিস্ময়কর রাজনীতি, সংকটাপন্ন গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক চর্চা; ব্যর্থমান শাসন, বিপন্ন আইনের শাসন, ব্যাপক সন্ত্রাস ও চরম অবনত আইন শৃংখলা; সর্বব্যাপী দুর্নীতি, গণমুখী শিক্ষানীতির অনুপস্থিতি ও বৈষম্যময় শিক্ষা পদ্ধতি; দক্ষ শিক্ষক সংকট, অনিয়মে, দুর্নীতিতে এবং দলীয় রাজনৈতিক অপসংস্কৃতিতে দূর্দশাগ্রস্থ শিক্ষাঙ্গন; হতাশাব্যঞ্জক মানব উন্নয়ন ও মানবাধিকার পরিস্থিতি, গণদারিদ্র্য বিমোচনে অক্ষম অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, অর্থনীতির প্রাণ শিল্প খাতে বিশৃংখলা, কৃষি খাতে অবহেলা; স্থল বন্দরগুলোর বেহাল দশা এবং সমুদ্রসীমা ও সমুদ্র বন্দরে সর্বোচ্চ ঝুঁকি; বিনিয়োগে জটিলতা ও পরিবেশ বান্ধবহীনতা; আশংকাজনক বেকারত্বের গতি; দলীয় ট্রেড ইউনিয়নের দাপটে বিপর্যস্ত অফিস-আদালত ও শিল্প-কারখানা; ধর্ম নিয়ে রাজনীতি ও ধর্মীয় আদর্শ বিশ্বাসে বিদ্যমান দুর্বলতা ও বিচ্যুতি; স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় গণমুখিতা ও কার্যকর স্বাস্থ্যনীতির অনুপস্থিতি এবং সুস্থ জীবন-প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সর্বগ্রাসী-প্রলয়ংকরী প্রাকৃতিক দুর্যোগ—বন্যা।

বিরাজমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে দেশী ও বিদেশী পত্র-পত্রিকার রিপোর্টে এবং দাতা ও উন্নয়ন অংশীদারদের দৃষ্টিতে বাংলাদেশ একটি 'ভঙ্গুর রাষ্ট্র' এবং অকার্যকর বা ব্যর্থ রাষ্ট্র' হতে চলেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বন্যার মত অনেক মহাসমস্যার মধ্যে ব্যর্থতার পাশাপাশি বাংলাদেশের সফলতাও আছে। তবে তার মাত্রা সঙ্কীর্ণ, যাকে ব্যর্থতার ব্যাপক মাত্রা ম্লান করে দেয়; অনেক ক্ষেত্রে গ্রাসও করে নেয়। এতসব মহাসমস্যায় জর্জরিত আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশ ব্যর্থতার গ্লানিতে কাঁদে। দেশের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন সবাই সে

কান্না নিশ্চয়ই শুনতে পান। আমি মাতৃভূমির কান্না হয়ত বেশী শুনতে পাই এবং তাকে অশ্রুসিক্ত দেখতে পাই। অতএব, আমি এ গ্রন্থের নাম করেছি **'অশ্রুসিক্ত মাতৃভূমি'**। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি এ ব্যর্থতার গ্লানি থেকে মুক্তি চায়। আমার বিশ্বাস, থীম্ বা বিষয়বস্তু হিসেবে এ গ্রন্থে বর্ণিত সমস্যাগুলোর ওপর **জন ও জাতীয় বিতর্কই** সে মুক্তির দিক-নির্দেশনা দিতে পারে।

আমার এ গ্রন্থনা কাউকে অসম্মান বা খাটো করার জন্য নয়। আমি রাজনীতিক নই এবং রাজনীতি করি না। কোন রাজনৈতিক দলের প্রতিও আমার কোন আনুগত্য বা অনুরাগ নেই। আমি একজন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নাগরিক এবং নাগরিক হিসেবে আমি আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। এ গ্রন্থনা তার একটি নিদর্শন মাত্র। নাগরিক হিসেবে স্বাধীনতা আমার মৌলিক অধিকার। এ গ্রন্থনা সে অধিকারের আংশিক প্রয়োগ মাত্র। আমি আমার মাতৃভূমি বাংলাদেশকে বিগত তেত্রিশ বছর ধরে যে ভাবে দেখছি, সন্তান হিসেবে আমি তার অবস্থা সম্পর্কে লেখার চেষ্টা করে তার প্রতি সামান্য দায়িত্ব পালন করেছি মাত্র। আমার মতে এ গ্রন্থে বর্ণিত কোন সমস্যার রূপই এক দিনের বা এক সরকারের আমলের রূপ নয়; এ রূপ বিগত তেত্রিশ বছরে বেড়ে উঠা রূপ এবং যার জন্য কেউ একক ভাবে দায়ী নয়; স্বাধীন বাংলাদেশের সব সরকার এবং সরকারের অংশ হিসেবে সব সরকার-বিরোধী দল ও তার নেতৃবৃন্দই কম-বেশী দায়ী। রাজনীতিকদের কারও দল সরকারে গেলে দেশ পরিচালনায় তাঁদের দায়িত্বের চাইতে সরকারের বাইরের রাজনীতিকদের দায়িত্ব কোন অংশেই কম নয়। দেশের সার্বিক স্বার্থে যে অব্যাহত জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজন, দেশ পরিচালনায় সরকার ও সরকার বিরোধীদের পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্য দিয়েই তা' প্রতিষ্ঠা পায়। আমি এ গ্রন্থনার মাধ্যমে সে জাতীয় ঐক্যেরই প্রত্যাশী। যে সব কারণে যারা দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং গণতন্ত্র হুমকির সম্মুখীন বলে বিবৃতি-বক্তব্য দেন তাঁরা দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্রকে অক্ষুণ্ন ও সমুন্নত রাখার স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হতে পারলে এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালাতে পারলে সে সব কারণ অবশ্যই দূর হয়ে যাবে বলে আমার এবং দেশপ্রেমিক সকল নাগরিকের দৃঢ় বিশ্বাস। আমি আশা করি, এ গ্রন্থনায় কোন ভুল-ত্রুটি থেকে থাকলে সম্মানিত পাঠক তা' ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

ঢাকা
তারিখ ঃ ২৩ নভেম্বর, ২০০৪

অধ্যাপক মোঃ ওসমান গনি
গ্রন্থকার

অশ্রুসিক্ত মাতৃভূমি

ভূমিকাঃ

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত প্রায় চব্বিশ বছর ধরে পাকিস্তানের একটি প্রদেশ হিসেবে বাংলাদেশ ভূখণ্ডের নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে পূর্ব পাকিস্তান হলো স্বাধীন বাংলাদেশ। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে তৎকালীন পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ নয় মাসের এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মাতৃভূমির স্বাধীনতাকামী বীর সন্তানেরা অর্জন করে বাংলাদেশের এ স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতার ইতিহাস অনন্য এবং অতুলনীয়। এ স্বাধীনতার মূল্যও অপরিসীম। কারণ, যে ত্যাগের বিনিময়ে এ স্বাধীনতা—তা' ছিল অপরিমেয়। পরাধীনতার শৃংখলমুক্ত সাড়ে সাত কোটি সদ্য স্বাধীন মানুষের এক নূতন জাতির বুকে ছিলো তখন শুধু বিজয়ের আনন্দ-উন্মাদনা; নূতন করে জীবনকে সাজানো, অর্থনৈতিক উন্নতি আর জীবনের সমৃদ্ধিকে আলিঙ্গনের অপেক্ষা। অপেক্ষার পর অপেক্ষা; শুধু অপেক্ষা। বছরের পর বছর এবং যুগের পর যুগ সে অপেক্ষাতেই কেটে গেল; কিন্তু সমৃদ্ধি আর উন্নতি এলো না তাদের জীবনে। স্বপ্ন আর মরিচীকার মতই রয়ে গেলো সে সমৃদ্ধি আর উন্নতি। সময়ের আবর্তে সে অপেক্ষাও একদিন গভীর হতাশায় নিমজ্জিত হল। জাতি যখন দেখতে পেলো, স্বাধীনতার প্রায় তিন যুগেও 'দরিদ্রতম' দেশ বলে লজ্জাকর উপাধিটাই মুছে ফেলা সম্ভব হলো না তখন এ গভীর হতাশাগ্রস্থ জাতির কপালে আর এক নতুন কলংকের উপাধিও যুক্ত হলো; প্রায় চৌদ্দ কোটি মানুষের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ না-কি পৃথিবীর 'সেরা দুর্নীতিবাজ' একটি দেশ! **২০০১ সালের ২৭ জুন বার্লিন ভিত্তিক দুর্নীতি বিরোধী আন্তর্জাতিক সংস্থা 'ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল' এর জরীপে প্রথম এ জঘন্য উপাধিটা পেয়ে লজ্জায় মুখ ঢেকেছে সচেতন দেশবাসী আর নীরবে-নিভৃতে কেঁদেছে মাতৃভূমি বাংলাদেশ।** জাতি আশা করেছিল, সরকার ও দেশ-প্রেমিক বলে দাবিদার দায়িত্বশীল রাজনীতিকবর্গ এবং রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত প্রশাসনিক 'মুরুব্বীরা' নিশ্চয়ই এ মহালজ্জার চরম কলংক থেকে প্রিয় মাতৃভূমিকে উদ্ধার করতে সচেষ্ট হবেন। কিন্তু না, ২০০২ সালেও 'ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল' এর মূল্যায়নে পুনরায় যখন একই ঘৃণ্য উপাধিতে বাংলাদেশ ভূষিত হলো তখন

দেশবাসী বুঝতে পারলো যে, দুর্নীতি নির্মূলে বিগত বছরে কার্যকর কোন ব্যবস্থা-ই নেয়া হয়নি। সচেতন জনমনে প্রশ্ন জাগলো, কেন এ ঘৃণ্য অবস্থান বাংলাদেশের? জাতীয় বিপর্যয়ের এহেন দুঃসময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনকারী বীর মুক্তিযোদ্ধারাও নীরব নিষ্ক্রিয় কেন? ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকরা দুর্নীতির মত এ মহা অপরাধ-পাপের বিরুদ্ধে জিহাদ থেকে বিরত কেন? ক্ষমতাসীন রাজনীতিক-শাসকবর্গই—বা কি করছেন? রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাহারা বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরের স্থায়ী অসহযোগ-সংস্কৃতির আগ্রাসী প্রভাবে শুধু বিলাসবহুল রাষ্ট্র-ক্ষমতা রক্ষার সংগ্রামেই কি তাঁরা সদা ব্যস্ত রয়েছেন? জাতির এত বড় মন্দটা দেখার সময় কি তাঁদের কারোর-ই নেই? স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রাক্কালে বা যুদ্ধকালের সে জাতীয় ঐক্য কোথায় গেলো! সে ঐক্য আসলেই নির্বাসিত! নাগরিকত্বে দেশের সবাই বাংলাদেশী হলেও একই জাতিতে কেউ বাংগালী, কেউ মুসলিম, আবার কেউ স্বাধীনতার স্বপক্ষ—কেউ বিপক্ষ গোত্র বা শক্তি হিসেবে দ্বিধা-বিভক্ত। অতএব, এ বিভক্তির অনৈক্য দেশ ও জাতির জন্য এক চরম সংকট, যা' দেশকে অনাকাঙ্খিত এ নাজুক অবস্থানে দাঁড় করেছে। এখানেই যে তার সমাপ্তি তা' নয়। এ সংকটে জাতীয় জীবনে অসংখ্য সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, যা সমস্যার এক দুষ্ট চক্রের রূপ নিয়েছে। কিন্তু এ দুষ্ট চক্র থেকে মুক্তির জন্য যে সুস্থ রাজনীতি আবশ্যক তার অস্তিত্ব তো বাংলাদেশে নেই! দেশে প্রচলিত রাজনীতিকে কেবল 'ক্ষমতার লড়াই-নীতি-ই' বলা চলে; এ রাজনীতি মাতৃভূমির প্রতি প্রেম-ভালবাসা বা দেশ-প্রেমের স্বাক্ষর বহন করে না। দেশে ব্যর্থমান শাসনের সুযোগে প্রচলিত রাজনৈতিক সংস্কৃতি ক্রমান্বয়ে অপসংস্কৃতির রূপ লাভ করেছে। ফলে ব্যক্তি, সমাজ তথা জাতীয় জীবনে স্থবিরতা নেমে এসেছে। জাতির যথার্থ বিকাশ তথা উন্নতির সোপান রচনার সুতিকাগার শিক্ষাঙ্গনও রাজনৈতিক অপসংস্কৃতির শিকার, যা' সর্বস্তরের শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করে দিয়েছে। ফলে, ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে দলীয় রাজনৈতিক স্বকীয়তা এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে, শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রদের অধ্যয়ন-তপস্যা বা অনুরাগে ভাটা পড়েছে, শিক্ষকদের শিক্ষকতায় নিমগ্নতার নৈতিকতা ও আদর্শে বিঘ্ন-বিচ্যুতি ঘটেছে; আর সর্বস্তরের শিক্ষক ও শিক্ষা মানে ধস নেমেছে; সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার ও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে এবং জাতীয় জীবনে নেমে এসেছে এক মহা হতাশা। মৌলিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার অভাবে দেশের সিংহভাগ মানুষ

আজও তার প্রিয় দেশ, দেশের সরকার পদ্ধতি, সংবিধান, আইন-কানুন, নাগরিক অধিকার, মানবাধিকার, রাজনীতি, অর্থনীতি, উন্নয়ননীতি তথা দেশের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সচেতন নয়। কেন্দ্রীয় দলনেতা-নেত্রীর মনোনীত প্রার্থীকেই নির্বাচনে ভোট দেয়ার গণতন্ত্র চর্চা ছাড়া দেশের অন্যসব কর্মকাণ্ড থেকেও তারা বিচ্ছিন্ন। তারা এও জানে না যে, তাদের এভাবে রাখাই হয়েছে এবং যারা রেখেছে তারা কারা!!

স্বাধীনতার বিগত প্রায় তিন যুগেও দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা পায়নি বলে ক্রমশঃ দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটে এবং গোটা প্রশাসন দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কোন দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসন কখনও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারে? এ ব্যর্থমান শাসনে প্রকৃত গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি, কৃষ্টি-সভ্যতা-ভদ্রতা চর্চার স্থলে প্রায় সর্বত্রই অসভ্যতা, অভদ্রতা, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, লুট-তরাজ, ছিনতাই, অপহরণ, জিম্মি-মুক্তিপন, হত্যা-খুন, রাহাজানি, ডাকাতি, নারী নির্যাতন, নারীধর্ষণ, ভোট-কারচুপি, ভোট-ডাকাতি, ইত্যাদির ব্যাপক প্রাদূর্ভাব ঘটে; মেধা, দক্ষতা ও যোগ্যতার প্রকৃত মূল্যায়ন হয় না। চাটুকার, কালো টাকার মালিক আর পেশী শক্তির উত্থান ও প্রতিপত্তিতে মধ্যযুগীয় বর্বরতা—'জোর যার রাজ্য তার' প্রতিষ্ঠা পায়; দেশের শাসন-প্রশাসন স্বার্থপর-লুটেরাদের আখড়ায় পরিণত হয় এবং জাতীয় উন্নতি-সমৃদ্ধির নীতি-পরিকল্পনা অনেকটা রাজনৈতিক শ্লোগান ও প্রতিবেদন-সর্বস্ব হয়ে পড়ে আর জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণহীনতা ও বিশৃংখলাই বিরাজ করে। বিদ্যমান এহেন একটি নাজুক পরিস্থিতিতে গোটা জাতি হতাশ—দিশেহারা। এখানে ব্যক্তি বা সামাজিক জীবনে নিরাপত্তার অভাব প্রকট; নির্বিঘ্ন জীবন-যাপনের কোন পরিবেশও নেই। অথচ দেশটি তেত্রিশ বছর বয়সী একটি স্বাধীন দেশ। একটি দেশের প্রকৃত স্বাধীনতা তার নাগরিকের মৌলিক অধিকার তথা জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবং প্রকৃত গণতান্ত্রিক চর্চার অধিকার প্রয়োগ ও ভোগে সক্ষম করে এবং তাতে সার্বিক স্বাধীনতা ও স্বচ্ছতার নিশ্চয়তা দেয়। বাংলাদেশের নাগরিক জীবনে সে প্রকৃত স্বাধীনতা ও স্বচ্ছতা আজও অর্জিত হয়নি। অথচ, এ-ই ছিল ১৯৭১-এর সে রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধের মূল চেতনা।

আবারও একই মহাকলংক! ২০০৩ সালেও সে দুর্নীতিবিরোধী আন্তর্জাতিক সংস্থা টিআই'র জরীপে বাংলাদেশ দুর্নীতিতে শীর্ষ স্থান লাভ

করে। তাহলে, রাজনীতিক-শাসক-প্রশাসকরা সবাই কি পুরোপুরিই দুর্নীতিগ্রস্ত? না হয়, পর পর তৃতীয় বারের মতও কেন বাংলাদেশ দুর্নীতিতে প্রথম স্থান অধিকার করবে? বিশ্বের সেরা দুর্নীতিবাজ আখ্যায় বাংলাদেশকে তৃতীয় বারের মত কলংকিত করলো দেশের ব্যর্থমান শাসন এবং দুর্নীতিবাজ প্রশাসন? পৃথিবীর সেরা দুর্নীতিবাজ রাষ্ট্র হিসেবে সংশ্লিষ্ট সংস্থার এহেন জরীপ-রিপোর্টকে রাজনৈতিক ভাষায় প্রত্যাখ্যান করলেও বাংলাদেশের শাসকবর্গ তাকে চ্যালেঞ্জ করে অসত্য বলে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়নি। ২০০৪ সালেও (২০ অক্টোবর সারা বিশ্বে একযোগে প্রকাশিত) ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) এর জরীপ প্রতিবেদনে বাংলাদেশ চতুর্থ বারের মত দুর্নীতিতে বিশ্ব সেরা দেশ। অর্থাৎ দুর্নীতিতে বাংলাদেশের প্রথম স্থান অটুটই রয়ে গেল। ফলে, দেশবাসীর মনে সংস্থার এ মূল্যায়নের সত্যতা নিয়ে আর কোন প্রশ্নের অবকাশ রইলো না। কারণ, তাদের নিজেদেরকেই প্রতিদিন প্রায় প্রতি পদে পদে দুর্নীতির মুখোমুখি হতে হয়। আর জনমনে এ স্বাভাবিক প্রশ্নটিও জাগে যে, সত্যি-সত্যি সেরা দুর্নীতিবাজ না হলে মূল্যায়ক সংস্থা টিআই শুধু বাংলাদেশকেই পর পর চার বার দুর্নীতিতে বিশ্বসেরা আখ্যা দিতে যাবে কেন? এতে তার লাভ কি? তারা তো বাংলাদেশের জনগণের শত্রু নয়; ক্ষমতাসীন বিএনপি জোট বা বিগত নির্বাচনে ক্ষমতা হারা বিরোধী দল আওয়ামী লীগেরও শত্রু নয়! বিশ্ব-মানচিত্রে বাংলাদেশ আজ যে চরিত্রের অধিকারী তাতে সচেতন দেশবাসী বিচলিত; আহত এবং কিংকর্তব্যবিমুঢ়। তাঁদের মনে আজ অনেক প্রশ্ন ঃ এ অবস্থা আর কতদিন চলবে? স্বাধীনতার তেত্রিশ বছর ধরে দেশের 'বিজ্ঞ রাজনীতিকবর্গ' দেশ ও জাতির উন্নয়নের রাজনীতিই করে আসছেন বলে দাবী করেন। অথচ সর্বগ্রাসী প্রলয়ংকরী বন্যার মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় কার্যকর কোন ব্যবস্থা গ্রহণেও তাঁদের আন্তরিকতার কোন প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রশ্ন হচ্ছে, বিরাজমান এ করুণ অবস্থার পরিবর্তন সাধনে তাঁরা আর কত সময় চান? দেশের নীরব সংখ্যাগরিষ্ঠ গণমানুষ তাদের জীবন-প্রতিকূল অবস্থার পরিবর্তনের আশায় রাজনীতিকবর্গকে ভোট দিয়ে দেশের রাজা বানায় না; তাদের উন্নতি সাধনার্থে প্রতিনিধি নির্বাচিত করে। কিন্তু জনপ্রতিনিধিদের আচার-আচরণ রাজার মত কেন? ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যেসব রাজারা প্রজাদের অধিকারের কথা ভুলে গিয়ে ভোগ-বিলাসেই লিপ্ত ছিল পরিণামে তাদের সবারই পতন

ঘটেছে এবং তার ইতিহাস অতি করুণ। বাংলাদেশের 'নব্য রাজারা' সে ইতিহাস থেকে এখনও কি শিক্ষা গ্রহণ করবে না? বাংলাদেশ আজ প্রায় চৌদ্দ কোটি মানুষের এক অশ্রুসিক্ত মাতৃভূমি। দেশপ্রেমিক সচেতন নাগরিকদের কানে মাতৃভূমির এ কান্না শোনা যায়। অশ্রুসিক্ত মাতৃভূমি বাংলাদেশ চিৎকার করে যেন বলছে, "ওহে আমার দেশপ্রেমিক সন্তানেরা, তোমরা তোমাদের অতি প্রিয় অথচ মহাসমস্যায় জর্জরিত মাতৃভূমি বাংলাদেশের দিকে একটু ফিরে তাকাও; দেশের শত্রুদের সত্বর প্রতিহত কর। তোমরা সুরাজনীতির চর্চা করে সুশাসন প্রতিষ্ঠা কর; যার যে কাজ তাই কর এবং করতে দাও। যার যে কাজ নয় তা' তার ওপর চাপিয়ে স্বীয় স্বার্থ উদ্ধারে লিপ্তদের তা' থেকে বিরত হতে বাধ্য কর। স্বার্থান্বেষী জাতীয় শত্রুদের স্বীয় রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারে ব্যবহৃত ছাত্র সমাজ সহ পেশাদার ও বেকারদের পথচ্যুতি বা বিপথগামীতা থেকে রক্ষা কর। তোমাদের অতি প্রিয় মাতৃভূমিকে সন্ত্রাসের কবল থেকে এবং দুর্নীতির কলংক থেকে পরিত্রাণ দাও এবং তোমরাও তা' থেকে মুক্তি লাভে সচেষ্ট হও। 'দরিদ্রতম', সেরা 'দুর্নীতিবাজ' এবং অবশেষে 'ব্যর্থ জাতি', 'ভঙ্গুর দেশ' এবং 'ব্যর্থ তুল্য রাষ্ট্র' বলে সারা পৃথিবীর অন্যসব দেশের মানুষ তোমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশকে এবং তোমাদেরকে তিরষ্কার ও ঘৃণা করছে! ও-হে আমার দেশপ্রেমিক সন্তানেরা, তোমরা তোমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশকে কলংকমুক্ত কর এবং স্বাধীনতার পবিত্র পতাকার মত তোমাদের নব-বীরত্বের পতাকায় আবার মাতৃভূমিকে আবৃত কর। অশ্রু মুছে ১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবসের সে গর্বিত মাতৃভূমির মত আমি বাংলাদেশ আবার হাসতে চাই। তোমরা আমাকে আবার একটু হাসাও।"

এক

এ এক বিস্ময়কর রাজনীতি

বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক দল বা জোট যখন বা যতদিন রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন ততদিন তাঁরা যা করেন, ক্ষমতাচ্যুত হয়ে বিরোধী দলে গেলে তার প্রায় সবই ভুলে যান। আর যখন বা যতদিন যে দল বা গোষ্ঠী বিরোধী দলে থাকে তখন যা যা করেন, রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর তাঁরাও তার প্রায় সবই ভুলে যান। অর্থাৎ সরকার থেকে বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার পর সরকারে থাকাকালীন কোন ব্যর্থতাই সংশ্লিষ্ট রাজনীতিক বা তাঁর দল মনে রাখেন না, আর সরকারে গেলে বিরোধী দলীয় ভূমিকার কথা ভুলে যান। অতএব, এ রাজনীতি কি বিস্ময়কর নয়? এ রাজনীতি নীতিবিহীন রাজনীতি এবং এ রাজনীতি জাতীয় জীবনে এক মহা জটিল সমস্যাও। তেত্রিশ বছর বয়সী একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের রাজনীতির প্রকৃত সংজ্ঞা প্রদান আজও সম্ভব নয়। কারণ, এ দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি পৃথিবীর কোন উন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির মত নয়। রাজনৈতিক ইস্যু নয় এমন ইস্যু নিয়ে দেশে অহেতুক বিতর্ক করা বা বিতর্কের সৃষ্টি করে রাজনৈতিক পরিবেশ অসুস্থ করে তোলার প্রবণতা মারাত্মক ভাবে বিদ্যমান। কোন নন্-ইস্যুকে রাজনৈতিক ইস্যু করে যে বিতর্ক মহান জাতীয় নেতাদের হেয় বা খাটো করে তাকে কি রাজনীতি বলা যায়? যেমন 'জাতির জনক', 'স্বাধীনতার ঘোষক'-এর মত জাতির সর্বোচ্চ ঐতিহ্যের বিষয়ে যে কোন রাজনৈতিক বিতর্ক লজ্জাজনক নয় কি? 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তি সংগ্রামের ঘোষক বন্ধবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান' এবং 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে মেজর জিয়াউর রহমান', এ বাস্তব সত্য দু'টি নিয়ে তো বিতর্কের কোন অবকাশ থাকতে পারে না। 'জাতির জনক' বিষয়ে যে কোন বিতর্কই বঙ্গবন্ধুর প্রতি অবমাননা মাত্র। বাংলাদেশের স্বাধীনতায় বঙ্গবন্ধুর অবদান এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে মেজর জিয়ার অবদান কোন বিতর্কের বিষয়ই হতে পারে না। জনৈক সংবিধান বিশেষজ্ঞ ও অন্যতম প্রধান সংবিধান প্রণেতার মতে, মূল সংবিধানে অর্থাৎ ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানে বঙ্গবন্ধুকে 'জাতির জনক' হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি। বঙ্গবন্ধু নিজে যেমন তা' চাননি তেমনি সংবিধান খসড়া প্রণয়ন কমিটিতে এ নিয়ে

কোন আলোচনাও হয়নি। এমনকি, এই সময়ে প্রণীত আওয়ামী লীগের ঘোষণাপত্রেও জাতির জনক হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নামের কোন উল্লেখ ছিল না। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি আসলেই লজ্জাজনক ও বেদনাদায়ক। বাংলাদেশের রাজনীতি যেন সংশ্লিষ্ট রাজনীতিকদের স্বীয় স্বার্থে এবং ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য সাধনে প্রতিপক্ষের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের এক জঘন্য লড়াই। এ লড়াই-এ হরতাল তাঁদের প্রধান হাতিয়ার। সংসদীয় গণতন্ত্রে 'সংসদ' সকল রাজনৈতিক বিতর্কের প্রাণকেন্দ্র। এতদ্সত্ত্বেও 'সংসদ'কে পাশ কাটিয়ে হরতালের মতো ধ্বংসাত্মক কর্মসূচীর রাজনীতি কি গণতান্ত্রিক? সংসদে প্রধান বিরোধী দল হিসেবে সরকারের যে কোন জনস্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ডের যেমন গঠনমূলক সমালোচনা ও প্রতিবাদ করবে, তেমনি সংসদীয় গণতন্ত্রকে শক্তিশালী ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে এবং সংসদকে কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় ভূমিকাও পালন করবে। সংসদকে অকার্যকর রেখে হরতাল-অবরোধের মতো কর্মসূচীর ওপর নির্ভরতা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করে, যা অবশ্যই অপ্রত্যাশিত। অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, একটি নির্বাচিত সরকারকে তার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতাচ্যুত করতে চায়। এজন্য একের পর এক হরতাল এবং লাগাতার কর্মসূচী দিয়ে দেশকে অচল করে দিতে তাঁরা মোটেই কুণ্ঠাবোধ করেন না। শুধু ক্ষমতা দখলের প্রবণতাই বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে সম্পূর্ণ 'হরতাল নির্ভর' করে তুলেছে। হরতাল-অবরোধের মতো রাজনৈতিক কর্মসূচীগুলো দেশের যে অপূরণীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষতি সাধন করে তা বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো বুঝেও না বোঝার ভান করে। অথচ, ক্ষমতাসীন অবস্থায় হরতালের বিপক্ষে তাঁদের জোরালো অবস্থান ও আপোসহীন মনোভাব কারও নজর এড়াবার মত নয়। রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে যত দ্রুত দেশপ্রেমিক বনে যেতে পারে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে তত দ্রুত দেশের স্বার্থ ভুলে যেতে পারে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর এ 'ডাবল স্ট্যাণ্ডার্ড' ভূমিকা সত্যিই বিস্ময়কর। সাবেক আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে তৎকালীন বিরোধী দলের ডাকে হরতালের বিরুদ্ধে সরকারের অবস্থান ছিল লক্ষ্যণীয়। তখন বিএনপি'র চেয়ারপার্সন ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারী দল ও তার সঙ্গে জোটভুক্ত দলগুলো বিরোধী দল হিসেবে যখনই হরতাল আহ্বান করতো, তখন বিরোধীদের আহূত হরতাল

প্রতিরোধে সরকার ও সরকারী দল আওয়ামী লীগের 'সর্বাত্মক প্রতিরোধ' ভুলে যাওয়ার মত ছিল না। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ ব্যাপারে জোরালো অবস্থান এবং ঘোষণা ছিল, তাঁর দল আওয়ামী লীগ বিরোধী দলে গেলেও কখনও হরতাল করবে না। সপ্তম জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়েও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভবিষ্যতে আর কোন দিন হরতাল করবেন না বলে সমগ্র জাতির কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। রাজনৈতিক কৌশলে শেখ হাসিনার ওই 'সময়োপযোগী' প্রতিশ্রুতি সরল দেশবাসীকে আশ্বস্ত করেছিল। কারণ, বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ হরতালের নাগপাশ থেকে চিরতরে মুক্তি চায়। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস, — শেখ হাসিনা তাঁর কথা রাখেননি। নিছক দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থে ও উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর প্রদত্ত ওয়াদা ভঙ্গ করলেন। দেশবাসী অবাক বিস্ময়ে এবং লজ্জাবনত দৃষ্টিতে তা প্রত্যক্ষ করে। প্রয়োজনে একের পর এক হরতাল দিয়ে দেশকে অচল করে দেয়ার হুমকিও দিলেন শেখ হাসিনা ও তাঁর দল আওয়ামী লীগ। প্রধান বিরোধী দল হিসেবে তাঁদের এহেন নেতিবাচক ভূমিকায় দেশবাসী এটাই উপলব্ধি করতে সক্ষম হল যে, দেশের রাজনীতিতে 'নীতি' বলতে আর কিছু অবশিষ্ট নেই। তাছাড়া, তথ্যবঞ্চিত ও অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত জনসাধারণের প্রশংসা অর্জন করতে এবং ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করতে কোন রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতৃত্ব মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন না; জনসাধারণের সচেতন অংশ তা নতুন করে নয়; সব সময়েই বুঝতে পারে। এরশাদ সরকারের পতনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র চর্চার সুযোগ ফিরে এলেও গত এক দশক ধরে যারাই বিরোধী দলে ছিলেন, তাঁরাই হরতালের রাজনীতি করেছেন। নির্বাচিত সরকারকে হটানোর নামে একের পর এক হরতাল ডেকে দেশের অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করেছেন। হরতালের এ অশুভ চক্রের মধ্যে অবিরাম ঘুরপাক খাচ্ছে বাংলাদেশের রাজনীতি। কিন্তু প্রশ্ন হল, বাংলাদেশে হরতালের রাজনীতি আর কতকাল চলবে? এ অপসংস্কৃতি থেকে জাতিকে মুক্ত করার বিকল্প কোন উপায় কি নেই? নির্বাচনের প্রাক্কালে জনগণের কাছে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভুলে গিয়ে নানা জনস্বার্থ-বহির্ভূত অজুহাত-আবদারে সরকারের সঙ্গে সরকার বিরোধীদের বাক-বিতন্ডায় লিপ্ততা আর মান-অভিমানে সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ পূর্বক পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত সময় পার করে দিতে পারলেই কি বিরোধী রাজনীতিকদের যোগ্যতা ও দক্ষতা বাড়ে? আর বিরোধী সাংসদরা বিজ্ঞ সাংসদ বা বিজ্ঞ

পার্লামেন্টারিয়ান হয়ে যান? যে সব কারণে বা ইস্যুতে সংসদ বর্জন করা হয় তা' যদি জনস্বার্থ-সম্পৃক্ত না হয়, সংসদে যোগ না দিয়েও বা হাজির না থাকলেও যদি সাংসদদের বা সংসদে বিরোধী দলীয় নেতার মর্যাদা অক্ষুণ্ন থেকে যায় এবং তার সুবাদে রাষ্ট্রের সকল সুযোগ-সুবিধাদি ভোগ করার অধিকার অব্যাহত থেকে যায় এবং তাতেও যদি তাঁদের প্রকৃত জনপ্রতিনিধিত্ব, জননেতৃত্ব বা দেশনেতৃত্ব বলবৎ থেকে যায় তবে এ রাজনীতি বা রাজনৈতিক সংস্কৃতি অবশ্যই বিস্ময়কর।

দেশের দু'টি বড় দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র মধ্যে বিদ্যমান দক্ষ ও পারদর্শী ব্যক্তিত্বের অভাব না থাকলেও ঐতিহাসিক কারণে শীর্ষ নেতৃত্বে তার বিরাজমান সংকটের ফলে বাংলাদেশের সর্বস্তরের রাজনীতিতে অপেক্ষাকৃত অদক্ষতা, অদূরদর্শিতা ও অজ্ঞতার ব্যাপক প্রাদুর্ভাব ঘটেছে এবং অবাঞ্চিতদের ব্যাপক সমাবেশ ঘটেছে। রাজনীতির মূল আদর্শ জনকল্যাণ সাধনে প্রয়োজনীয় ধৈর্য, ত্যাগ ও পরমত সহিষ্ণুতার আদর্শ অনুসারীদের স্থলে শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের জন্য 'গায়ের জোরে' প্রতিপক্ষকে প্রতিহত করতে সক্ষম পেশী শক্তি ও কালো টাকার মালিকদের অভাবনীয় অনুপ্রবেশের ধারাই রাজনীতিতে অব্যাহত রয়েছে। **এক কথায়, বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে রাজনীতিক বেশে জাতীয় স্বার্থের দোহাইতে স্বীয় স্বার্থ উদ্ধারের ঘৃণ্য তৎপরতায় তথাকথিত রাজনীতিকদের গভীর লিপ্ততার অপসংস্কৃতিও বলা চলে। প্রকৃত ও সৎ রাজনীতিকরা এ ঘৃণ্য রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে নিতান্তই অসহায় ও নিষ্ক্রিয়।** অতএব, দেশের এ রাজনৈতিক অপসংস্কৃতির অবসান ঘটাবে কে বা কারা? দেশের সব পেশাদার সমাজের মত সুশীল সমাজও দ্বিধাবিভক্ত। এ সমাজের পেশাদার শিক্ষাবিদ-বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশ শুধুই কোন না কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষপাতদুষ্টই নয়, উপদেশ-পরামর্শ দাতাও। কথিত রাজনৈতিক মুরুব্বীদের অনুগ্রহে তাঁদের জীবন হতাশা ও বেদনামুক্ত, সুরক্ষিত, নিরাপদ এবং স্বাচ্ছন্দ্য-সুখময়। জীবনে বর্তমান এ পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগের প্রয়োজনীয় অংশ জাতীয় স্বার্থে ত্যাগ করার কোন মানসিকতা তাঁদের কারও মধ্যে কদাচিৎ প্রত্যক্ষ করা যায়। সংস্কারপন্থীদের দ্বারা প্রশ্নবিদ্ধ হলে ব্যক্তি-স্বাধীনতার দোহাইতে তাঁরা পার পেয়ে গেলেও তাঁদের দেশ ও জাতীয় স্বার্থবিবর্জিত এ ধরণের ব্যক্তি-স্বাধীনতা কখনও জনগণের অশ্রদ্ধা ও গ্লানিমুক্ত নয়।

প্রতিরোধে সরকার ও সরকারী দল আওয়ামী লীগের 'সর্বাত্মক প্রতিরোধ' ভুলে যাওয়ার মত ছিল না। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ ব্যাপারে জোরালো অবস্থান এবং ঘোষণা ছিল, তাঁর দল আওয়ামী লীগ বিরোধী দলে গেলেও কখনও হরতাল করবে না। সপ্তম জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়েও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভবিষ্যতে আর কোন দিন হরতাল করবেন না বলে সমগ্র জাতির কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। রাজনৈতিক কৌশলে শেখ হাসিনার ওই 'সময়োপযোগী' প্রতিশ্রুতি সরল দেশবাসীকে আশ্বস্ত করেছিল। কারণ, বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ হরতালের নাগপাশ থেকে চিরতরে মুক্তি চায়। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস, — শেখ হাসিনা তাঁর কথা রাখেননি। নিছক দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থে ও উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর প্রদত্ত ওয়াদা ভঙ্গ করলেন। দেশবাসী অবাক বিস্ময়ে এবং লজ্জাবনত দৃষ্টিতে তা প্রত্যক্ষ করে। প্রয়োজনে একের পর এক হরতাল দিয়ে দেশকে অচল করে দেয়ার হুমকিও দিলেন শেখ হাসিনা ও তাঁর দল আওয়ামী লীগ। প্রধান বিরোধী দল হিসেবে তাঁদের এহেন নেতিবাচক ভূমিকায় দেশবাসী এটাই উপলব্ধি করতে সক্ষম হল যে, দেশের রাজনীতিতে 'নীতি' বলতে আর কিছু অবশিষ্ট নেই। তাছাড়া, তথ্যবঞ্চিত ও অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত জনসাধারণের প্রশংসা অর্জন করতে এবং ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করতে কোন রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতৃত্ব মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন না; জনসাধারণের সচেতন অংশ তা নতুন করে নয়; সব সময়েই বুঝতে পারে। এরশাদ সরকারের পতনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র চর্চার সুযোগ ফিরে এলেও গত এক দশক ধরে যারাই বিরোধী দলে ছিলেন, তাঁরাই হরতালের রাজনীতি করেছেন। নির্বাচিত সরকারকে হটানোর নামে একের পর এক হরতাল ডেকে দেশের অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করেছেন। হরতালের এ অশুভ চক্রের মধ্যে অবিরাম ঘুরপাক খাচ্ছে বাংলাদেশের রাজনীতি। কিন্তু প্রশ্ন হল, বাংলাদেশে হরতালের রাজনীতি আর কতকাল চলবে? এ অপসংস্কৃতি থেকে জাতিকে মুক্ত করার বিকল্প কোন উপায় কি নেই? নির্বাচনের প্রাক্কালে জনগণের কাছে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভুলে গিয়ে নানা জনস্বার্থ-বহির্ভূত অজুহাত-আবদারে সরকারের সঙ্গে সরকার বিরোধীদের বাক-বিতন্ডায় লিপ্ততা আর মান-অভিমানে সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ পূর্বক পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত সময় পার করে দিতে পারলেই কি বিরোধী রাজনীতিকদের যোগ্যতা ও দক্ষতা বাড়ে? আর বিরোধী সাংসদরা বিজ্ঞ সাংসদ বা বিজ্ঞ

পার্লামেন্টারিয়ান হয়ে যান? যে সব কারণে বা ইস্যুতে সংসদ বর্জন করা হয় তা' যদি জনস্বার্থ-সম্পৃক্ত না হয়, সংসদে যোগ না দিয়েও বা হাজির না থাকলেও যদি সাংসদদের বা সংসদে বিরোধী দলীয় নেতার মর্যাদা অক্ষুণ্ন থেকে যায় এবং তার সুবাদে রাষ্ট্রের সকল সুযোগ-সুবিধাদি ভোগ করার অধিকার অব্যাহত থেকে যায় এবং তাতেও যদি তাঁদের প্রকৃত জনপ্রতিনিধিত্ব, জননেতৃত্ব বা দেশনেতৃত্ব বলবৎ থেকে যায় তবে এ রাজনীতি বা রাজনৈতিক সংস্কৃতি অবশ্যই বিস্ময়কর।

দেশের দু'টি বড় দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র মধ্যে বিদ্যমান দক্ষ ও পারদর্শী ব্যক্তিত্বের অভাব না থাকলেও ঐতিহাসিক কারণে শীর্ষ নেতৃত্বে তার বিরাজমান সংকটের ফলে বাংলাদেশের সর্বস্তরের রাজনীতিতে অপেক্ষাকৃত অদক্ষতা, অদূরদর্শিতা ও অজ্ঞতার ব্যাপক প্রাদুর্ভাব ঘটেছে এবং অবাঞ্ছিতদের ব্যাপক সমাবেশ ঘটেছে। রাজনীতির মূল আদর্শ জনকল্যাণ সাধনে প্রয়োজনীয় ধৈর্য, ত্যাগ ও পরমত সহিষ্ণুতার আদর্শ অনুসারীদের স্থলে শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের জন্য 'গায়ের জোরে' প্রতিপক্ষকে প্রতিহত করতে সক্ষম পেশী শক্তি ও কালো টাকার মালিকদের অভাবনীয় অনুপ্রবেশের ধারাই রাজনীতিতে অব্যাহত রয়েছে। এক কথায়, বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে রাজনীতিক বেশে জাতীয় স্বার্থের দোহাইতে স্বীয় স্বার্থ উদ্ধারের ঘৃণ্য তৎপরতায় তথাকথিত রাজনীতিকদের গভীর লিপ্ততার অপসংস্কৃতিও বলা চলে। প্রকৃত ও সৎ রাজনীতিকরা এ ঘৃণ্য রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে নিতান্তই অসহায় ও নিষ্ক্রিয়। অতএব, দেশের এ রাজনৈতিক অপসংস্কৃতির অবসান ঘটাবে কে বা কারা? দেশের সব পেশাদার সমাজের মত সুশীল সমাজও দ্বিধাবিভক্ত। এ সমাজের পেশাদার শিক্ষাবিদ-বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশ শুধুই কোন না কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষপাতদুষ্টই নয়, উপদেশ-পরামর্শ দাতাও। কথিত রাজনৈতিক মুরুব্বীদের অনুগ্রহে তাঁদের জীবন হতাশা ও বেদনামুক্ত, সুরক্ষিত, নিরাপদ এবং স্বাচ্ছন্দ্য-সুখময়। জীবনে বর্তমান এ পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগের প্রয়োজনীয় অংশ জাতীয় স্বার্থে ত্যাগ করার কোন মানসিকতা তাঁদের কারও মধ্যে কদাচিৎ প্রত্যক্ষ করা যায়। সংস্কারপন্থীদের দ্বারা প্রশ্নবিদ্ধ হলে ব্যক্তি-স্বাধীনতার দোহাইতে তাঁরা পার পেয়ে গেলেও তাঁদের দেশ ও জাতীয় স্বার্থবিবর্জিত এ ধরণের ব্যক্তি-স্বাধীনতা কখনও জনগণের অশ্রদ্ধা ও গ্লানিমুক্ত নয়।

স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটভূমি এ দেশের শিক্ষিত সচেতন সমাজের সম্পূর্ণ জানা বিষয়। বাঙালীর মাতৃভাষা আন্দোলন, উর্দুভাষী পরিচালনী শাসকদের শোষণের বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, সীমাহীন তাজা-তিতিক্ষা এবং জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র যুদ্ধের এক নজিরবিহীন রক্তক্ষয় ঘটনা প্রবাহ এ পটভূমি রচিত। জাতির আশা ও বিশ্বাস ছিল, দেশের রাজনীতিতে স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনা ও তার ঐতিহ্য স্বাধীনতা উত্তরকালেও অটুট থাকবে। সে সঠিক আশার ও বিশ্বাসে সদ্য-স্বাধীন যুদ্ধবিধ্বস্ত সাড়ে সাত কোটি মানুষ স্বাধীনতা যুদ্ধের শত্রুদল-অধিনায়কদলের বিরল সম্মানে ও উপহারে ভূষিতও করেছিলো। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তা' মনে রেখে তার প্রতি তাঁদের কৃতজ্ঞতার কোন নিদর্শন রাখতে তাঁরা সক্ষম হতে পারেননি। জনগণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতাই যদি জাতীয় স্বাধীনতার মূল চেতনা হয়ে থাকে তবে দেশের স্বাধীনতা পরবর্তী প্রায় চার বছরেও এর বাস্তবতার বিন্দুমাত্র লক্ষ্য করা গেল না কেন? ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ থেকে ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট পর্যন্ত এ পুরো সময়টাই হবার ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি মহান জাতীয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে অন্ততঃ স্বাধীনতা যুদ্ধে আহত হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা, লাখ লাখ স্বজনহারা শোকাহত পরিবার, দারিদ্র্যের কষাঘাতে ক্লান্ত ও দুঃখী কোটি কোটি বাঙালীর প্রায় দু'যুগের লালিত আশা-আকাঙ্খা পূরণার্থে দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার আরেক মহা-পবিত্র সংগ্রামের পর্ব। কিন্তু সে মহাসংগ্রাম চলেছে কি? চলেছে—কোটি কোটি বাঙালীর লালিত সে আশা-আকাঙ্খা ভঙ্গের যত অপকর্মকাণ্ড। দেখা দিলো সর্বত্র নজিরবিহীন বিশৃঙ্খলা। এলো সে ঐতিহাসিক ১৯৭৪ সাল, যখন গোটা জাতিকে মুখোমুখি হতে হলো এক নজিরবিহীন দুর্ভিক্ষেরও। নানা অখাদ্য খেয়ে মরতে হয়েছে অসংখ্য নব্য-স্বাধীন বাঙালীকে। এরই মধ্যে যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত! স্বাধীন বাংলাদেশের শিশুকালেই তার রাজনৈতিক মহান নেতারা এক পর্যায়ে তাঁদের মাতৃভূমিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বাধীনতাপূর্ব শপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে অগণতান্ত্রিক একনায়কত্বের শাসন-ক্ষমতায় প্রলুব্ধ হয়ে পড়েন। এ বিপথগামিতা ছিলো মুক্তি সংগ্রামের চেতনা এবং স্বাধীনতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সংবিধানে বিতর্কিত চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে এক দলীয় শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হলো। এক দলীয় শাসন ব্যবস্থা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সংগ্রামী জনগণের জন্য নিয়ে এল একনায়কত্বের রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন এবং

রাষ্ট্র বা নাগরিক স্বাধীনতার চরম বিপত্তি-বিপর্যয়। প্রিয় মাতৃভূমি-বাংলাদেশের সন্তানেরা তাদের স্বপ্ন-সাধের গণতন্ত্রের যে চর্চা আশা করেছিল তা' ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারী, স্বাধীনতার মাত্র চার বছর বয়সেই একদলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে সে গণতন্ত্রেরই হত্যা করা হলো। দেশের সাড়ে সাত কোটি দুঃখী মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার গণতান্ত্রিক চেতনাকে হত্যা করে সমাজতন্ত্র কায়েমের লক্ষ্যে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রবর্তন করলেন 'বাকশাল' নামের একদলীয় শাসন ব্যবস্থা। ফলে, দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্রের অবসান ঘটে; সদ্য স্বাধীন জাতি তার বাক স্বাধীনতাও হারায়। কিন্তু অপরিমেয় রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জনকারী দেশবাসী বঙ্গবন্ধু প্রবর্তিত সমাজতন্ত্রের সংস্কৃতিতে দেশের চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের অনভিপ্রেত বোঝা বইবার ক্ষমতাও হারায়। দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতির চরমে পৌঁছায়। এ প্রেক্ষাপটে সেনাবাহিনীর বিপথগামী একদল অফিসারের হাতে বঙ্গবন্ধু (বিদেশে অবস্থানরত তাঁর কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা ব্যতীত) সপরিবারে নিহত হন। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রবর্তিত হলো বঙ্গবন্ধু হত্যার জড়িতদের প্রধান নেতা বঙ্গবন্ধুরই সহকর্মী-বন্ধু খন্দকার মোস্তাকের নেতৃত্বে বিলুপ্ত আওয়ামী লীগ ও বাকশালের বড় বড় নেতাদের সমন্বয়েই গঠিত সরকার। এ সরকারও সংগ্রামী দেশবাসীর সমর্থন অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। স্বল্প সময়ের মধ্যেই এক রক্তপাতহীন সিপাহী-জনতার বিপ্লবে ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটলো এবং দেশে সেনা শাসনের প্রবর্তন হলো। তার পর স্বাধীনতার ঘোষক (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে) মহান মুক্তিযোদ্ধা জেনারেল জিয়াউর রহমান (বীরোত্তম)দেশের রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন এবং তাঁরই নেতৃত্বে বাংলাদেশে বহুদলীয় গণতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তন ঘটলো। কিন্তু বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান প্রেসিডেন্ট জিয়া প্রবর্তিত বহুদলীয় গণতন্ত্র আর জিয়ার জনপ্রিয়তায় তৎকালীন সেনা বাহিনী প্রধান জেনারেল এরশাদ ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠলেন। রাষ্ট্র ক্ষমতা নিয়ে এক গভীর ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত ঘটলো। কিন্তু প্রেসিডেন্ট জিয়া তা' যথার্থ আমলে নেননি। ১৯৮১ সালের ৩০ নভেম্বর উচ্চাভিলাষী আর এক সেনা কর্মকর্তা জেনারেল মঞ্জুরের নেতৃত্বে প্রেসিডেন্ট জিয়াকে হত্যা করা হয় চট্টগ্রামের সার্কিট হাউজে। তবে জেনারেল মঞ্জুর নিজেও রক্ষা পাননি। এ গভীর ষড়যন্ত্রে তাঁকেও মৃত্যুবরণ করতে হয়।

১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ পুনরায় সেনা শাসনের প্রবর্তন করলেন তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এরশাদ। এ নিয়ে বাংলাদেশে দু'বার সামরিক আইন জারি হয়। ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৮ এবং ১৯৮১-১৯৮৫ পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশে পার্লামেন্ট ছিল না। বিএনপি সরকারের উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি এ. সাত্তারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালনকালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে বিচারপতি সাত্তার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবার পর থেকে সেনা প্রধান জেনারেল এরশাদ রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পায়তারা শুরু করেন এবং তাঁর নেতৃত্বে স্বার্থান্বেষী মহলের সে গভীর চক্রান্তে দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলে সৎসাহসী প্রেসিডেন্ট এ. সাত্তার দুর্নীতির দায়ে তাঁর দলীয় মন্ত্রী পরিষদ ভেঙ্গে দিলেন। জাতির ইতিহাসে এ ছিল এক অভূতপূর্ব প্রশংসনীয় ঘটনা। নতুন মন্ত্রী পরিষদ গঠনের আগেই প্রেসিডেন্ট সাত্তার জেনারেল এরশাদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হলেন। ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ দেশে সামরিক শাসন ঘোষণার সময় রাজনীতি না করার প্রতিজ্ঞায় জেনারেল এরশাদ রাষ্ট্রের ক্ষমতা গ্রহণ করলেও তাঁর পূর্বসূরী জেনারেল জিয়ার মত তিনিও পরবর্তীতে রাজনৈতিক দল গঠন করেন এবং একজন রাজনীতিক ও জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হিসেবে দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তবে জেনারেল এরশাদের নয় বছরের শাসন স্বৈর-শাসন বলে অভিহিত। ওসময় গণতন্ত্র ছিলো নির্বাসিত। রাষ্ট্রীয়, আর্থ-সামাজিক ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার প্রাক্কালে দেশের সর্বস্তরের সচেতন জনতা স্বৈরাচার এরশাদ সরকারের অপশাসনের বিরুদ্ধে চরম আক্রোশে ফেটে পড়ে। জনতার এ ক্রমবর্ধমান সাহসী-প্রতিরোধ-আন্দোলনের মুখে নতজানু হতে হয়েছে পরাক্রমশালী সে স্বৈর শাসককে। এরশাদ সরকারের পতন ঘটাতে বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া এবং আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জামায়াতে ইসলামী সহ বামপন্থী দলগুলোর ঐক্যবদ্ধ এক দফা আন্দোলন গণ-আন্দোলনের রূপ নেয় এবং তারই ফলশ্রুতিতে ১৯৯০-এর গণঅভ্যুত্থানে অর্জিত বিজয়ে আবার দেশবাসী গণতন্ত্র চর্চার নূতন সুযোগ পায়। কিন্তু সংকট কাটেনি। ১৯৯১ এর সাধারণ নির্বাচনে বিএনপি পুনরায় রাষ্ট্র-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। কিন্তু জেনারেল এরশাদের প্রধান দোসর ও তাঁদের মত অনেক স্বার্থান্বেষী রাজনীতিকও এ গণতান্ত্রিক চর্চার নূতন ধারায় নিজেদের ঠাঁই করে নিতে সক্ষম হতে পারায় দেশপ্রেমিক সচেতন সমাজ তখনই নতুন রাজনৈতিক

সংকটের যে আশংকা করেছিল তা' পরবর্তীতে সত্যি বলেই প্রমাণিত হয়। নূতন সরকারের শপথ গ্রহণের লগ্ন থেকেই নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ তুলে বিএনপি সরকারকে এক মুহূর্তের জন্য শান্তিতে না রাখার প্রকাশ্য ঘোষণা দেয় তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ও নির্বাচনে পরাজিত তাঁর দল আওয়ামী লীগ। তাঁদের এ চরম অসহযোগিতায় উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকারের পারদর্শিতা ও দক্ষতার প্রমাণ মেলেনি। ফলে, জাতির কাংখিত সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বিএনপি সরকার সক্ষম হতে পারেনি এবং ১৯৯৬-এর সাধারণ নির্বাচনে তারা পরাজয় বরণ করে আর তাতে বিজয়ী আওয়ামী লীগ দীর্ঘ একুশ বছর পর নূতন সরকার গঠন করে।

দুই

প্রকৃত গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক চর্চা সংকটাপন্ন

পঞ্চাশের দশক থেকেই বাংলাদেশের জনগণ গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম শুরু করে। দীর্ঘদিনের সংগ্রাম, অভিজ্ঞতা ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয়। মূল সংবিধান অনুসারে 'বিনা বিচারে কাউকে আটক রাখার কোন বিধান করা যাবে না' বিধানটি সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীতে লোপ পাওয়ায় বিশেষ ক্ষমতা আইন বা জননিরাপত্তা আইনের অথবা সংশ্লিষ্ট কোন আইনের বলে এখনও বিনা বিচারে কাউকে যতদিন ইচ্ছা ততদিন জেলে আটকে রাখা যায়। জেল হত্যা মামলায় অভিযুক্তদের বছরের পর বছর ধরে জেলে আটকে রাখাটা তার এক জ্বলন্ত উদাহরণ। বাংলাদেশের সংবিধানে সংসদীয় পদ্ধতির সরকারের প্রধানমন্ত্রীর হাতে যে পরিমাণ নির্বাহী ক্ষমতা ন্যস্ত, পৃথিবীর অন্য কোন দেশের সংসদীয় পদ্ধতির সংবিধানে তা' কি আছে? সাংসদদের ফ্লোর ক্রসিং সংক্রান্ত সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের কার্যকারিতাও প্রকৃত গণতান্ত্রিক নীতি বহির্ভূত। কোন নীতিবান-বিবেকবান মানুষ সাংসদ নির্বাচিত হয়ে তাঁর দলের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলে তিনি নিজেই পদত্যাগ করবেন এবং এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ফ্লোর ক্রসিংয়ের কারণে বাধ্যতামূলক আসন-শূন্যতা গণতন্ত্রের পরিপন্থী। আসলে, রাজনীতিকদের মধ্যে আদর্শিক চিন্তাধারা লোপ পাওয়ায় গণতান্ত্রিক রীতি-নীতির প্রতি

শ্রদ্ধাশীলতাও হারিয়ে যায়। রাষ্ট্র পরিচালনায় সে আদর্শিক গণতান্ত্রিক কালচার অনুপস্থিত বিধায় শিক্ষকের মুখে 'সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা'র কথা শুনলে স্কুলের ছাত্ররাও আজকাল অবাক হয়। যে গণতান্ত্রিক চর্চায় নির্বাচনের নামে প্রহসন হয়, কালোটাকা ও সন্ত্রাস, পেশীশক্তি, ভোট কারচুপি, ভোটকেন্দ্র দখল করে নির্বাচনে জয়ী হওয়া সম্ভব সেখানে প্রকৃত গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক চর্চা সংকটাপন্ন নয়? ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে এবং ১৯৯৬ থেকে ২০০১ পর্যন্ত মেয়াদে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এ দু'টি গণতান্ত্রিক সরকার দেশে গণতন্ত্রের যে চর্চা করে তা' জাতির কাংখিত সে প্রকৃত গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা উপহার দিতে সক্ষম হয়নি। তার মূল কারণ, দু'দলের কারও মধ্যে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় পারস্পরিক সহযোগিতার মানসিকতা বাস্তবে কখনও দেখা যায়নি। তারা তা' প্রমাণ করার চেষ্টাও করেনি। তবুও জাতি ধৈর্য হারায়নি এ বিশ্বাসে ও প্রত্যাশায় যে, আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতিজ্ঞা অনুসারে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পেলে তাদের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা পাবে, নাগরিক জীবনের মৌলিক চাহিদা নিশ্চিত হবে; সর্বস্তরে শৃংখলা ও নিয়মানুবর্তিতার অনুশীলন হবে, অন্যায়-অবিচার, হিংসা-প্রতিহিংসা, লোভ-লালসা, সন্ত্রাস, খুন, অপহরণ, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানির অবসান ঘটবে এবং জাতীয় জীবনে সার্বিক সৌন্দর্যময় এক পরিবর্তন সূচিত হবে। কিন্তু; বড় পরিতাপের বিষয়, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে, দীর্ঘ একুশ বছর পর, আওয়ামী লীগ সরকার তার পাঁচ বছরের শাসনামলে তাঁদের প্রতি জাতির সে বিশ্বাস ও প্রত্যাশা পূরণ করতে সক্ষম হয়নি। বরং সে সময়ে সন্ত্রাস ও অপরাধের মাত্রা অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে যায় এবং দলীয় ক্যাডারদের কোন একটি সন্ত্রাস-অপরাধেরও বিচার হয়নি। দেশের প্রতিটি নাগরিকের জীবন, সম্পদ, ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পূর্ণ নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে। এ অনাকাঙ্খিত নিয়ন্ত্রণহীন বিশৃংখল পরিস্থিতি উন্নয়নে কারও কোন পরামর্শে আওয়ামী লীগ সরকার ঘুণাক্ষরেও কর্ণপাত করেনি এবং ফলে, পরিস্থিতির অবনতিই অব্যাহত থাকে। বিএনপি'র নেতৃত্বে সরকার বিরোধী কোন আন্দোলন-প্রতিবাদ কর্মসূচী দেশে বিরাজমান সে বিশৃংখলা দূর করতে সক্ষম হয়নি। তবে বিএনপি'র নেতৃত্বে জাতি নীরব বিপ্লবের প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হতে থাকে এবং ২০০১ সালের পহেলা অক্টোবরের সাধারণ নির্বাচনে ব্যালটের মাধ্যমে সে নীরব বিপ্লব ঘটাতে জাতি সক্ষম হয়। দেশবাসী আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে

পরাজিত করে এবং বিএনপি নেতৃত্বাধীন চার দলীয় জোটকে জয়ী করে রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে। বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি জোট সরকার ২০০১ এর ১০ অক্টোবর দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। তারপর সে থেকে তিন বছর বিগত হয়ে গেল কিন্তু জাতি যে আশায় সরকারে পরিবর্তন ঘটালো সে আশা আজও পর্যন্ত দূরাশা-ই রয়ে গেলো। প্রকৃত চর্চার অভাবে গণতন্ত্র স্বচ্ছতা পায়নি বিধায় দেশে সুশাসনও প্রতিষ্ঠা পায়নি। তা' ছাড়া, সুশাসন-নীতি বিবর্জিত প্রশাসনিক কাঠামোতে তা' প্রতিষ্ঠা পাবেওবা কি করে? পরিস্থিতি যখন নাজুক রূপ নেয় তখন দেশের সরকারের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। সরকার বিরোধী রাজনীতিকরা তারই সুযোগে নিরুপায় ও অসহায় দেশবাসীর মধ্যে পরিস্থিতি মোকাবেলা বা তা' স্বাভাবিক করার পর্বত-উঁচু প্রতিশ্রুতিতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ সরকারের পতন ঘটাবার এক দফা আন্দোলনের ঝড় তোলে। সে ঝড়ে কখনও তারা সফল হলেও তাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার হাত-বদল ছাড়া জাতি কখনও সুশাসনের মুখ দেখতে পায় না। অথচ, প্রত্যেকটি সরকার ও সরকারী প্রশাসনের কাছে দেশবাসী মূলতঃ প্রকৃত গণতান্ত্রিক চর্চা ও সুশাসনই প্রত্যাশা করে। আজও গোটা জাতি সুশাসন প্রত্যাশী, যা' তাদের সার্বিক নিরাপত্তাও নিশ্চিত করবে। দেশের রাজনীতিতে বিরাজমান নীতিভ্রষ্টতা ও প্রশাসনের সর্বস্তরে দুর্নীতিগ্রস্ততা এবং গণদরিদ্রতার দুষ্টচক্র থেকে দেশকে মুক্ত করার দায়িত্ব মূলতঃ সরকার ও রাজনীতিকদের ওপর-ই বর্তায়। কিন্তু স্বাধীনতার তেত্রিশ বছরেও তাঁরা তা' করতে সক্ষম হননি। এ লজ্জাকর অবস্থার জন্য বিদেশী বন্ধুরাও আমাদের উপদেশ দিয়ে বলছেন, দুর্নীতিপরায়ণ এ ভঙ্গুর দেশে সর্বাগ্রেই রাজনৈতিক সংস্কার আবশ্যক; সন্ত্রাস আর হানাহানির রাজনীতিতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা পায় না। বর্তমান জোট সরকারের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াও বারংবার রাজনৈতিক সংস্কারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু তিনি রাজনৈতিক সংস্কারের কোন রূপরেখা দেশবাসীকে আজও দেননি। বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকট সম্পর্কে বহির্বিশ্বের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের মত ইউএসএআইডি এডমিনিস্ট্রেটর এন্ড্রু নাটসিওস বাংলাদেশ সফরকালে বলেছেন, দুর্বল শাসন ব্যবস্থা, দুর্নীতি এবং আইনের শাসনের অবনতি কেবল বাংলাদেশের অর্থনীতিকেই ক্ষতিগ্রস্ত করবে না, গণতন্ত্রের জন্যও হুমকি বয়ে আনবে। ২০০৪ সালের ৯ অক্টোবর বাংলাদেশের অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক শেষে তিনি সাংবাদিকদের আরো বলেন,

বাংলাদেশের অবস্থার উন্নয়নে রাজনৈতিক সদিচ্ছা বাড়াতে হবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সবার সদিচ্ছা থাকতে হবে। তাঁর মতে দেশের সমস্যা সমাধানে সংসদই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। দুর্নীতি, সুশাসন এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এসব বিষয়ে আমরা উদ্বিগ্ন। কারণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে এগুলো বাধার সৃষ্টি করছে। এসব খাতে উন্নতি না ঘটলে তিনি ইউএসএআইডি'র সহায়তা প্রত্যাহারের কথাও বলেন। ইউ.এস.এ.আই.ডি এডমিনিস্ট্রেটরের সতর্কবাণী সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর সরকার ও বিরোধী দলগুলো নিশ্চয়ই অবগত আছেন এবং যথাযথ গুরুত্বের সাথে এ সতর্কবাণীর প্রতি তাঁদের মনযোগীও হওয়ার কথা।

২০০৪ সালের ৯ মে একটি দৈনিকে প্রকাশিত 'বাংলাদেশে গণতন্ত্র একটি প্রহসন' শিরোনামের নিবন্ধে অশ্রুসিক্ত মাতৃভূমির আহাজারি শুনতে পাওয়া যায়। নিবন্ধকার সাবেক রাষ্ট্রদূত ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অবঃ) মইনুল হোসেন চৌধুরী। তিনি লিখেছেন, বিশ্ববিখ্যাত ইংরেজ কবি ও নাট্যকার শেকসপিয়ার তার একটি কবিতায় বলেছেন, 'দ্য অয়েট অব দিস স্যাড টাইম ইউ অট টু ওবে। স্পিক হোয়াট ইউ ফিল নট হোয়াট ইউ অট টু সে।' অর্থাৎ 'এই দুঃসময়ের ভার আমাদেরকেই বইতে হবে। আমাদের যা অবশ্যই বলা উচিত তা নয় বরং আমাদেরকে সে কথাই বলতে হবে যা আমরা অনুভব করব।' বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতায় এই মুহূর্তে গৃহযুদ্ধ, বিপ্লব, অভ্যুত্থান বা বাইরের সামরিক আগ্রাসনের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তবে দেশে সব কিছু ঠিকঠাক চলছে এবং উদ্বেগের কোন কারণ নেই এটা বলাও হবে সত্যের অপলাপ। বলা হয়ে থাকে, 'না জানলে আরামে থাকা যায়'। আরেকটা প্রবাদ আছে, 'যারা বোঝেন এবং জানেন তারা হতভাগা'। বর্তমান অবস্থায় এই হতভাগাদের কেউ হয়তো এই বলে স্বস্তি পেতে পারেন, 'শুকরিয়া আদায় করুন, সামনে আরও খারাপ সময় আসছে।'

আমাদের জনগোষ্ঠীর স্তরবিন্যাস থেকেই সম্ভবত দেশের বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটের পূর্বাভাস ও কারণ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু এই সংকট নিরসনের ব্যবস্থাপত্র দেয়া যে কোন বিশেষজ্ঞের জন্যই দুরূহ। বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের প্রাজ্ঞতা দেখাতে এমন সব

কথা বলেন যা' বেশিরভাগ লোকের বোধের বাইরে থেকে যায়। এদের বেশিরভাগই কোন না কোনভাবে ফায়দা লুটতে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত। কেউ কেউ আবার বেসরকারি সংস্থা বা এনজিও'র (যারা আবার সরকারের ভেতরে সরকার হয়ে উঠেছে) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, যা' থেকে তারা পান নানা সুযোগ-সুবিধা। আবার একদল সরকারি কর্মকর্তা আছেন যারা বৃহস্পতিবার অবসর গ্রহণ করে শনিবারই যোগ দেন ব্যবসায়, রাজনীতি, এনজিও বা কনসালটেন্সি ফার্মে যা আগে থেকেই ঠিক করা থাকে। নৈতিকতার চেয়ে স্বার্থ হাসিলই তাদের কাছে বড়।

গণতন্ত্র মানে সংঘবদ্ধ কিছু লোক, বক্তৃতা, নির্বাচন বা দুঃস্থদের কিছু চাল-গম বিলানো নয়। গণতন্ত্র এগুলোর চেয়ে অনেক বড় কিছু। গণতন্ত্রের সংশ্লিষ্টতা অন্ততপক্ষে জনগণের জীবনযাত্রা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, খাদ্য, শিক্ষা, বিচার ও কর্মসংস্থানের সঙ্গে। এগুলো পূরণ হলে সেটাকেই নিদেন পক্ষে গণতন্ত্র বলা যাবে। কিন্তু আমাদের দেশে কিছু লোক রাজনীতিকে জীবিকা হিসেবে নিয়েছেন। রাজনীতি তাদের কাছে জীবনধারণ ও মুনাফার হাতিয়ার। নির্বাচনের সময় চাতুর্য, ধূর্তোমি, ব্যাপক অর্থ ও পেশীশক্তি ব্যবহার করে তারা পরস্পরের কাছ থেকে গণতন্ত্রের মুখোশ পরে ক্ষমতা দখল করে, যে প্রক্রিয়ায় থাকে না সাধারণ মানুষের সত্যিকার অংশগ্রহণ। ফলে, ক্ষমতায় যাওয়ার পর জনগণকে তারা আর তোয়াক্কা করে না। মনে হচ্ছে, বাংলাদেশের রাজনীতির সাফল্যের গোপন রহস্য—নিজের স্বার্থ হাসিলে দেশ, সরকারি কর্মকর্তা এবং অপরাধী সহ সব উপায়কে কাজে লাগানো। কপটতা, প্রতারণা, নগদ অর্থ ও ভোট কেন্দ্র দখলের মতো নির্বাচন হচ্ছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির উপজাতি। অনৈতিক কোন কাজ কোন সভ্য সমাজে রাজনৈতিক বা আইনগত বিচারে সঠিক হতে পারে না। রাজনীতিতে অর্থ ও পেশীশক্তি ব্যবহারের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব অবশ্যই বিরাট উদ্বেগের কারণ। একটা সাধারণ ধারণা প্রচলিত আছে যে, ধড়িবাজ ব্যবসায়ী (ফ্লাই বাই নাইট), অপরাধী ও স্বার্থান্বেষীদের দ্বারাই রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত হয়। রাজনীতি হচ্ছে দুর্নীতি, নোংরামি আর ভাঁওতাবাজির খেলা, যা ভাল মানুষকেও খারাপ করে ফেলে। অর্থ ও পেশীশক্তির জোরে বিবেকবর্জিত রাজনীতিবিদ এমনকি অপরাধীরা নির্বাচিত হয়ে সংসদে আইন প্রণেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়ে ভাল মানুষের নৈতিক সমতা অর্জনের চেষ্টা করে। নতুন পদমর্যাদাকে কাজে

লাগিয়ে সেই ব্যক্তি নিজের জন্য, নিজের পরিবারের জন্য এবং বন্ধু-বান্ধবদের জন্য আরও সম্পদের পাহাড় গড়তে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। নিজের নির্বাচনী এলাকায় গড়ে তোলেন একটা সুবিধাভোগী চক্র। তার সব কর্মকাণ্ড যেন দেশের সব আইনের উর্ধ্বে। কারণ, তিনি যে একজন আইন প্রণেতা!

এক দুর্নীতিপরায়ণ একনায়ক আমাদের ওপর চেপে বসেছিল দীর্ঘ ৯ বছর। তারপর বিগত দশকে ছিল দু'টি কথিত গণতান্ত্রিক সরকার। কিন্তু আগের সব ক্ষত এ সময়ও ছিল অব্যাহত। এমনকি বহু ক্ষেত্রে ক্ষত আরও বেড়ে গেছে। জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলো পৌঁছে গেছে ধ্বংসের কিনারায়। গণতন্ত্রের অভাবে জনজীবনের সব ক্ষেত্রে সৃষ্টি করেছে বিশৃংখলা ও অনিয়ম, যা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে উন্নয়নের। আইনের শাসন হয়ে পড়েছে সুদূর পরাহত। ক্ষমতার জোরে অযৌক্তিক ও অসঙ্গত শক্তি প্রয়োগ করা নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিরোধী পক্ষ দমনের জন্য আইন-প্রয়োগকারী সংস্থাকে শাসক দলের 'মিলিশিয়ায়' পরিণত করার প্রবণতা আইন-শৃংখলার ক্ষেত্রে গুরুতর সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে এসব রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হয়ে পড়েছে অকার্যকর। আমাদের দেশের শাসক শ্রেণী মনে করে, রাষ্ট্রীয় সম্পদ আর ক্ষমতাসীনদের সম্পদ এক এবং অভিন্ন। দেশের প্রকৃত সমস্যা সম্পর্কে রাজনৈতিক নেতৃত্ব সম্পূর্ণ উদাসীন। দেশের সমস্যা নিয়ে ভাবার পরিবর্তে তাঁরা ব্যস্ত থাকেন নিজের স্বার্থ হাসিল, পরস্পরের প্রতি কাদা ছোড়াছুড়ি এবং যে কোন উপায়ে ক্ষমতা দখলের চিন্তায়। ক্ষমতায় গেলে তাদের একমাত্র নীতি হয়ে দাঁড়ায় নিজেদের ভাগ্য গড়া। আর কোন সমস্যা দেখা দিলে তাঁরা অবলম্বন করেন নাৎসি নীতি। গণতন্ত্রের এ ধরনের অনুশীলন দেশে সৃষ্টি করেছে দুর্নীতি ও আইন-শৃঙ্খলাবিহীন অরাজক পরিবেশ।

হাইতির জনসংখ্যা ৭০ লাখ। দেশটির রাজনীতি ও অর্থনীতি ১৫০টি পরিবারের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে কথিত আছে। রাজনীতি ও অর্থনীতির বিচারে হাইতির সঙ্গে বাংলাদেশের রয়েছে সামঞ্জস্যতা। আমাদের গোলার্ধে আমরা সবচেয়ে দরিদ্র দেশের বাসিন্দা। আমাদের দেশের লোকসংখ্যা প্রায় ১৪ কোটি। কিন্তু আমাদের রাজনীতি এবং অর্থনীতিও নিয়ন্ত্রণ করে মাত্র কয়েক শ' পরিবার। এখানে রয়েছে বিবেকহীন রাজনীতিবিদ, সরকারি কর্মকর্তা ও মাফিয়া ব্যবসায়ীদের মধ্যে কলুষিত এক চক্র। তারা সবাই

মিলে সরকারি অর্থসম্পদ লুটপাটসহ দুর্নীতির স্বর্গরাজ্য গড়ে তুলেছে। আমাদের উন্নয়ন প্রচেষ্টা কাঙ্ক্ষিত সুফল বয়ে আনে না এই সর্বগ্রাসী দুর্নীতির কারণে। বাংলাদেশের প্রশাসন ও অর্থনীতি আজ দুর্নীতির কাছে সম্পূর্ণ জিম্মি। ফাণ্ড বিতরণ এবং খরচে হয় দুর্নীতি, প্রকল্প বরাদ্দের ক্ষেত্রে দুর্নীতি, কর আদায়ে দুর্নীতি, লাইসেন্স ইস্যু করার ক্ষেত্রে দুর্নীতি। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ ও বদলির ক্ষেত্রে চলে দুর্নীতি। দুর্নীতির এ তালিকা আসলে অনেক অনেক বড়। অনেক উন্নত দেশ বাংলাদেশকে মনে করে উচ্চ ঝুঁকি ও উচ্চ জালিয়াতির দেশ হিসেবে। যেখানে 'জেনুইন' দলিলপত্রও পাওয়া যায় প্রতারণার মাধ্যমে।

বাংলাদেশে বস্তুগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্নীতি এতই ব্যাপক যে, সরকার এবং জনগণ উভয় শ্রেণীই এটাকে রাজনীতি, প্রশাসন ও ব্যবসায় ক্ষেত্রে জীবনধারণের উপায় হিসেবে মেনে নিয়েছে। এ দেশে কোন জায়গা থেকে যে দুর্নীতি বিষয়ে শুরু করা উচিৎ সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়াই জটিল। অধ্যাপক আলবার্ট আইনস্টাইন অবশ্যই এটা জেনে দুঃখ পাবেন যে, বাংলাদেশীরা তার 'আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব'কে পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রয়োগ না করে অন্যভাবে প্রয়োগ করেছে। কারণ এখানে সব কিছুই 'ফর দ্য রিলেটিভস বাই দ্য রিলেটিভস'। ব্যবসা-বাণিজ্য, সরকারি চাকরি বা রাজনীতি সব ক্ষেত্রেই একই অবস্থা। বাংলাদেশে কোন কিছু অর্জনের জন্য আপনি কতটুকু যোগ্য, সেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আপনি কার পরিচিত, সর্বোপরি আপনি কার আত্মীয়। তবে এখানে আলোচ্য হচ্ছে শুধু বস্তুগত দুর্নীতি নিয়ে। কারণ এটা বোধগম্য এবং এই দুর্নীতির ফলে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে দেখা দেয় অবর্ণনীয় দুর্ভোগ। প্রথমে দুর্নীতি শব্দের ব্যাখ্যা দেয়া প্রয়োজন। ব্যাপক অর্থে দুর্নীতি বলতে শুধু ঘুষ দেয়া-নেয়া না, নিজের স্বার্থে ক্ষমতা ও প্রভাবের প্রয়োগকেও বোঝায়।

প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন বলেছিলেন, 'প্রায় সব মানুষই বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারে। কিন্তু আপনি যদি একজন মানুষের চরিত্র পরীক্ষা করে দেখতে চান, তবে তাকে ক্ষমতা দিন।' বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কথাটা নির্জলা সত্য। কোন কোন সমাজবিজ্ঞানীর মতে, যে ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা আছে, সে যে কোন ধরনের স্বার্থ হাসিলের জন্য সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করে। এটাই হচ্ছে দুর্নীতি। এই সংজ্ঞার

আওতায় দুর্নীতি প্রধানত তিন ধরনের। প্রথমত, ঘুষ। বিশেষ বিবেচনা বা ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের বিনিময়ে কোন ব্যক্তি যখন অন্য কোন ব্যক্তি বা তার পরিবারকে অর্থ বা তার সমপর্যায়ের কোন সুবিধা প্রদান করে সেটাকেই ঘুষ বলে। দ্বিতীয়ত, চাপ প্রয়োগ করে অর্থ আদায়। এটা হচ্ছে সদয় দৃষ্টির বিনিময়ে কারও কাছ থেকে অর্থ বা সমপর্যায়ের সুবিধা আদায় করা। তৃতীয়ত, চুরি। এটা হচ্ছে ক্ষমতার অপব্যবহার করে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সরকারি অর্থ সম্পদ আত্মসাৎ করা। ঘুষ নেয়া বা অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জন হচ্ছে 'গ্রিজের' মতো। এটা ছাড়া ব্যবসায়-বাণিজ্য এমনকি সরকারি অফিস-আদালতে বৈধ কাজটিও জটিল হয়ে পড়ে। ঘুষ বা কমিশন না দিলে সব কর্মকান্ডই হয়ে পড়ে স্থবির। কোন কোন অর্থনীতিবিদের মতে, বাংলাদেশের জিএনপির (মোট জাতীয় উৎপাদন) এক-তৃতীয়াংশই 'কালো টাকা'। যা আসে ঘুষ, কমিশন, চোরাচালান ও অন্যান্য অবৈধ কর্মকাণ্ড থেকে। অধিকাংশ ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ ও সরকারি কর্মকর্তা অর্থ ও ক্ষমতার দ্বারা প্রভাবিত। কারণ অর্থ মানে আরও ক্ষমতা, আর আরও ক্ষমতা মানে আরও অর্থ। সমাজে মর্যাদার আসনে বসার জন্যও কাজে লাগানো হয় অর্থ ও ক্ষমতা। যেমন, কাস্টমস, ট্যাক্সেশন ও পুলিশ কর্মকর্তারা অত্যন্ত ক্ষমতাধর। ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে তারা জনগণের কাছে অর্থ দাবি করতে পারেন। চাপ প্রয়োগ করে তা আদায়ও করতে পারেন। বাংলাদেশে সিভিল সার্ভিসে যোগদানে ইচ্ছুক বেশীর ভাগ সম্ভাবনাময় প্রার্থীরই পছন্দের ক্ষেত্র জানা মতে এগুলো। এসব ক্ষেত্র তাদের কাছে পরিচিত 'ওয়েট ডিপার্টমেন্ট' হিসেবে। তারা মনে করে, এসব ডিপার্টমেন্টে চাকরি পেলে সহজেই অতিরিক্ত আয় করা সম্ভব। দেশে আমলাতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক নৈরাজ্য দিন দিনই বেড়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে এমন সব বিধি-বিধান করা হচ্ছে যা প্রকারান্তরে ক্ষমতাকে আরও কেন্দ্রীভূত করে। দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে জনগণকে উন্নত সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা দেয় না। করদাতাদের অর্থে নানা সুযোগ-সুবিধা দিয়ে শুধু শাসক দলের সদস্য ও আমলাদেরই নিয়োগ ও পদোন্নতি দেয়া হয়।

গণতন্ত্রের নামে রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন এবং অপরাধ ও দুর্নীতিকে রাজনীতিকীকরণ সমাজে ভয়াবহ নারকীয় প্রভাব তৈরি করে, যার ফলে উন্নয়ন, দারিদ্র্য দূরীকরণ, আইন-শৃংখলা সমস্যার সমাধানকে অসম্ভব করে

তোলে। ফলে, সমস্যা আরও জটিল হয়। গণতন্ত্রের অর্থ শুধু অবাধ নির্বাচন, সংসদ, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, মানবাধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা ইত্যাদিই নয়। জনগণের মূল চিন্তার বিষয় এখন শান্তি, নিরাপত্তা, দারিদ্র্য, অপরাধ, ঘুষ, অবৈধ কমিশন, খাদ্য, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, বিচার এবং আইনের শাসনের মতো মৌলিক বিষয়গুলো। এসব মৌলিক সমস্যা মিটলেই কেবল অন্যান্য অধিকার ও সত্যিকার গণতন্ত্রের কথা চিন্তা করা যায়। গাই ফক্স বলেছিলেন, 'ভয়াবহ রোগের জন্য প্রয়োজন ভয়াবহ প্রতিকার ব্যবস্থা।' বাংলাদেশে একদিন হয়তো পরিবর্তন আসবে। তবে তা শান্তিপূর্ণ হবে না সহিংস হবে, সেটা নির্ভর করবে দেশের রাজনৈতিক নেতাদের ওপর।

তিন

ব্যর্থমান শাসনে আইনের শাসন ও আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি বিপন্ন

সংবিধান প্রণেতাদের মতে বাহাত্তরের সংবিধান বাস্তব অভিজ্ঞতার ফসল। **'বিনা বিচারে কাউকে আটক রাখার কোন বিধান করা যাবে না'** এই বিধানটি মূল সংবিধানে থাকলেও চতুর্থ সংশোধনীতে তা লোপ পায়। দাতাদের অন্যতম শর্ত পূরণ-প্রক্রিয়ায় সরকার আলাদা জুডিশিয়াল সার্ভিস গঠনের কথা বললেও বাংলাদেশের বিচার বিভাগ প্রশাসন থেকে কবে যে আলাদা বা স্বাধীন হবে তা' আজও নিশ্চিত নয়। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত সময়ে এ আইনটি কার্যকর করা হয়নি। মূল সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদে বিচার বিভাগকে প্রশাসন থেকে আলাদা করার বিধান কার্যকর করার জন্য ২২ অনুচ্ছেদ লেখা হয়। কিন্তু চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে ১১৬ অনুচ্ছেদটি হারিয়ে যায়। অতএব, বিচার বিভাগের ওপর প্রশাসনের প্রভাব বা হস্তক্ষেপ অব্যাহত থাকলে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার কথা কথাই থেকে যায়। দেশে ব্যর্থমান শাসন আর জন-নিরাপত্তাহীনতা দেশের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও স্থিতিশীলতার প্রতি এক মহা-হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের আইন প্রণয়নে সুস্পষ্ট কোন

জাতীয় নীতি না থাকায় তাতে যে কোন ক্ষমতাসীন সরকারের দলীয় স্বার্থে স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ বিদ্যমান। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দেশের সংবিধান, আন্তর্জাতিক আইন বা জাতিসংঘ সনদের প্রতিও দেশের সরকার ও সংশ্লিষ্টদের ঔদাস্য লক্ষ্যণীয়। আইনের যথাযথ প্রয়োগ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্যই আবশ্যক। সর্বস্তরের প্রশাসনে শৃংখলা বিদ্যমান থাকলে আইনের শাসন বা সুশাসন প্রতিষ্ঠা পায়। অর্থাৎ বিরাজমান আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিই শাসন বা প্রশাসনের প্রতিবিম্ব। জাতীয় জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে বিশৃংখলা দেখা দিলে দেশের প্রচলিত আইনের তাৎক্ষণিক যথার্থ প্রয়োগ দ্বারা তাতে শৃংখলার পুনঃ প্রতিষ্ঠা সুশাসনের লক্ষণ আর ব্যর্থতা বিফল শাসনেরই পরিচায়ক। আর সর্বত্র বা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বা জীবনের মৌলিক ক্ষেত্রগুলোতে যখন আইন-শৃঙ্খলার অভাব বিরাজ করতে থাকে বা আইন-শৃংখলা অবনতিশীল হয়ে পড়ে তখন দেশের শাসনও এক ব্যর্থমান শাসনেরই রূপ লাভ করে। বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির এত অবনতি ঘটেছে যে, বিষয়টি ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাপী আলোচনার ঝড় তুলেছে। দেশে অবস্থানরত বিদেশী কূটনীতিক, দেশের ব্যবসায় নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন বন্ধু-দেশের ব্যবসায় প্রতিনিধি, জাতিসংঘ ও তার অংগ সংগঠন, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবি সহ আন্তর্জাতিক দাতা ও উন্নয়ন সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগিতা সংস্থা ইত্যাদির প্রতিনিধিদের আদেশ-উপদেশে ও দেশের ব্যর্থমান শাসন, ব্যাপক দুর্নীতি ও অবনত আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি গভীর উদ্বেগের সাথে গুরুত্ব পেয়ে আসছে। নানা সরকারী পদক্ষেপ সত্ত্বেও পরিস্থিতির কোন উন্নতি লক্ষ্য করা যায় না; বরং অবনতির তীব্রতাই লক্ষ্যণীয়। কারণ সরকারের দায়িত্ব পালনে সংসদে ও সংসদের বাইরের সব সরকারবিরোধী রাজনৈতিক দল সহ সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতার অভাব প্রকট। জাতীয় স্বার্থে সংসদে ও সংসদের বাইরে বিরোধী-দলগুলো সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা যেমন করবে তেমনি সুপরামর্শও দেবে এবং সম্মিলিত ও ঐক্যবদ্ধ ভাবে দুর্নীতি নির্মূল সহ দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি সাধনের প্রয়াসও চালাবে। কিন্তু তাঁরা কি তা' করেন? পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকাও বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় জনগোষ্ঠী সাংবিধানিক স্বীকৃতি চেয়েছিল। পাকিস্তানের সংবিধানেও তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। তবে বাংলাদেশের সংবিধানে তাদের জন্য কোন ব্যবস্থা উল্লেখ নেই। মূল সংবিধানের ৬ অনুচ্ছেদে বলা

হয়েছে, 'বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালী বলিয়া পরিচিত হইবেন' এবং ৯ অনুচ্ছেদে 'জাতীয়তাবাদ' সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে 'ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তা বিশিষ্ট বাঙালী জাতি'র কথা লেখা হয়েছিল। কিন্তু সেখানে মূল সংবিধান রচয়িতারা উপজাতীয় নাগরিকের কোন কথা রাখেননি। এমতাবস্থায় প্রশ্ন ওঠে, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তিতে 'আঞ্চলিক পরিষদের' মত সংস্থা বাংলাদেশের সংবিধানের সঙ্গে কতটুকু সঙ্গতিপূর্ণ? দেশের সংবিধান ও আইন দেশের সকল নাগরিকের জন্য এক ও অভিন্ন এবং প্রয়োগেও তা' সবার জন্য সমান। **আইনের বিধান থেকে বিচ্যুতি বিশৃংখলারই জন্ম দেয়।** পার্বত্য চট্টগ্রামে আইন-শৃংখলার চরম অবনতির প্রেক্ষিতে এবং তাতে বিরাজমান অশান্তি দূর করে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিগত আওয়ামী লীগ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ হয়। তখন সরকার বিরোধী হিসেবে বিএনপি, জামায়াত, জাতীয় পার্টি সহ অন্যান্য দল শান্তি চুক্তির পক্ষে ছিল না। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান সন্তুলারমাসহ উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের ভাষ্য, তাঁরা বাংলাদেশ সংবিধানের কাঠামোর মধ্য থেকে শান্তি চুক্তির বাস্তবায়ন দেখতে চায়। বিএনপি নেতৃত্বাধীন বর্তমান জোট সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের চাইতে দেশের সংবিধান মতে এক দেশ এক জাতির প্রশ্নে বেশী সচেতন। জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে আওয়ামী লীগ শান্তিচুক্তি সম্পাদন না করায় তার বাস্তবায়ন আওয়ামী লীগ সরকারই করতে সক্ষম হয়নি। তবে দেশের আইন-শৃংখলা অমান্যকারী, ভঙ্গকারী এবং সন্ত্রাসীরা সরকারী বা সরকার বিরোধী নেতাদের মদদপুষ্ট হয়ে থাকলে কোন ক্ষেত্রেই সুশাসন প্রতিষ্ঠার সুযোগ থাকে না। দুর্নীতি রোধ করা যেমন সম্ভব হয় না তেমনি অবনত আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নতিও ঘটে না। ২০০৪ সালের ২৭ আগস্ট একটি দৈনিকে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে **রাজনৈতিক হস্তক্ষেপকেই আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতির প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (আইএমএফ)।** তাছাড়া বেকারত্ব, দরিদ্রতা, যুব সমাজের মধ্যে নৈতিক অবক্ষয়, কালো টাকার প্রভাব, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ব্যর্থতা এবং প্রকৃত অপরাধীদের শাস্তি না হওয়ার কারণকেও দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী করেছে আইএমএফ। একই সঙ্গে তারা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির জন্য দায়ী করেছে চোরাচালান, মাদক ব্যবসায়, বেআইনি অস্ত্র, সামাজিক অস্থিরতা, সামাজিক নিরাপত্তাবোধের অভাব,

সন্ত্রাসী ও মৌলবাদীদের অপতৎপরতাকে। বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র বাস্তবায়নের অবস্থা সম্পর্কিত আইএমএফের এক প্রতিবেদন থেকেও এসব তথ্য পাওয়া যায়। দেশের ছয়টি বিভাগের বিভিন্ন স্তরের জনগণ, মানবাধিকার সংগঠন, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজ, পরিবেশবাদী গ্রুপ, এনজিও, মহিলা প্রতিনিধি, বেসরকারী উদ্যোক্তা, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি ও পেশাজীবীদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে আইএমএফ উক্ত প্রতিবেদন তৈরি করে। প্রতিবেদনে বলা হয়, দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত। একটি অন্যটির ওপর নির্ভরশীল। দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক উন্নয়নে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ভূমিকা অপরিসীম। কিন্তু দেশে বিদ্যমান আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অনেক ক্ষেত্রেই দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র বাস্তবায়নে যথেষ্ট সহায়ক নয়। একই সঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সহায়ক নয় দরিদ্রদের জন্যও। এর জন্য তারা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর দুর্নীতি, দরিদ্রদের ব্যাপারে পুলিশের নেতিবাচক মনোভাব, আধুনিক সরঞ্জামের অভাব, নিম্ন বেতন, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও অধিকার সম্পর্কে সচেতনতার অভাব প্রধানতঃ দায়ী।

এখানে এক নজিরবিহীন নারকীয় ঘটনার উল্লেখ করে দেশে বিপন্ন শাসন ও জননিরাপত্তাহীনতার জ্বলন্ত উদাহরণ না টানলেই নয়। দেশে ধারাবাহিক বোমা হামলা, মৌলবাদের উত্থান, রাজনৈতিক হত্যা ও বিরাজমান সন্ত্রাস-নৈরাজ্যের প্রতিবাদে ২১ আগস্ট, ২০০৪ ঢাকার বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের জনসভায় গ্রেনেড হামলা এক নারকীয় ঘটনা। এ হামলায় মহিলা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী আইভি রহমান সহ মোট ২২ জন দলীয় নেতা-কর্মীর মৃত্যু এবং তিন শতাধিক নেতা-কর্মী আহত হয়। এ এক লোমহর্ষক ঘটনা। এ নজিরবিহীন মানবতা বিরোধী বর্বোরচিত মর্মান্তিক ঘটনা যার পর নাই নিন্দনীয় এবং উদ্বেগজনক। এ গ্রেনেড হামলা দেশের গণতন্ত্র, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও জাতীয় স্বাধীনতার প্রতিও এক নগ্ন হামলা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ ঘটনার ফলশ্রুতিতে জাতীয় জীবনে যে মহাদুর্যোগ নেমে আসে তা' মোকাবেলার জন্য যে জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজন তা'ও সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। সরকার বিরোধীরা তাৎক্ষণিক ভাবে এ গ্রেনেড হামলার নেপথ্যে সরকারী মদদ ছিল বলে মন্তব্য করেন; এতে সেনাবাহিনী জড়িত থাকার কথাও বলেছেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। ঘটনার তদন্ত প্রক্রিয়ায় সরকারের গৃহীত সব পদক্ষেপও প্রধান বিরোধী দল

আওয়ামী লীগ প্রত্যাখ্যান করে এবং সমমনা দলগুলোর সঙ্গে জোট বেঁধে জোট সরকারের পতনের এক দফা আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়। প্রশ্ন হচ্ছে, এ আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কি? অর্থাৎ এ আন্দোলন সফল হলে কি হবে, আর ব্যর্থ হলে কি হবে? বাংলাদেশে প্রচলিত এযাবৎকালের রাজনৈতিক সংস্কৃতির নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ করলে এর জবাব পাওয়া যায়।

প্রথমেই বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের যে রাজনৈতিক দল বা জোট যখন বা যতদিন রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন ততদিন তাঁরা যা করেন, ক্ষমতাচ্যুত হয়ে বিরোধী দলে গেলে তার প্রায় সবই ভুলে যান। আর যখন বা যতদিন যে দল বা গোষ্ঠী বিরোধী দলে থাকেন তখন যা যা করেন, রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর তাঁরাও তার প্রায় সবই ভুলে যান। অর্থাৎ সরকার থেকে বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার পর সরকারে থাকাকালীন কোন ব্যর্থতাই সংশ্লিষ্ট রাজনীতিক বা তাঁর দল মনে রাখেন না, আর সরকারে গেলে বিরোধী দলীয় ভূমিকার কথা ভুলে যান। এ ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী রাজনীতিক ও রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি (বর্তমানে জামায়াতে ইসলামী সহ আরও দু'টি দলের সঙ্গে জোটবদ্ধ)'র বিকল্পরূপে জাতির কাঙ্ক্ষিত গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক চরিত্রের বৈশিষ্ট্যধারী অন্য কোন রাজনৈতিক দল এখনও তৃতীয় শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়নি। এমতাবস্থায়, সরকারের পতন ঘটলে শূন্যস্থান পূরণের জন্য যথারীতি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নতুন সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং উক্ত দল দু'টির কোন না কোন একটিই জাতীয় সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়ী হলে এককভাবে নতুন সরকার গঠন করবে; নতুবা জোট বেঁধে তা' করবে। **সচেতন সমাজের প্রশ্ন, এ নতুন নির্বাচন পুরানো রাজনীতিকদের সমন্বয়ে গঠিত নতুন সরকারের বর্তমান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কি বদলে দিতে পারবে? স্বাধীনতার তেত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে এ প্রশ্নের জবাব হবে — 'না'।**

জাতি হিসেবে বাংলাদেশের প্রায় চৌদ্দ কোটি মানুষ কেমন দ্বিধা বিভক্ত তা' আগেই বলা হয়েছে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময়কার মত ২১শে আগস্টের মর্মান্তিক গ্রেনেড হামলায় শোকাহত প্রতিবাদী জাতির মধ্যে ঐক্যের যে সম্ভাবনা উঁকি মেরেছিল তার আলিঙ্গন প্রক্রিয়ার সূচনার্থে সার্বজনীন প্রশংসনীয় জাতীয় উদ্যোগের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিসেবে সংসদ নেত্রী প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি'র চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া এবং সংসদে

বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার মধ্যে একটি বৈঠক অনুষ্ঠানই যেখানে সম্ভব হয়নি সেখানে কি করে দু'দলের ঐক্য তথা জাতীয় ঐক্যের আশা করা যায়? আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বিএনপি চেয়ারপারসন প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আনুষ্ঠানিক উদ্যোগ সহ দেশের সর্বস্তরের দেশপ্রেমিক সচেতন সুশীল সমাজ, বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ, ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন বন্ধু দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানও দু'নেত্রীর বৈঠক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখার প্রচেষ্টা সফল হয়নি। বরং এসব মহান উদ্যোগগুলো আওয়ামী লীগ সভানেত্রী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার সুযোগে দিন দিন জাতীয় অনৈক্যের মাত্রাই বেড়ে চলেছে; সরকার বিরোধী আওয়ামী লীগের কাছে গ্রেনেড হামলার সুষ্ঠু তদন্ত এবং প্রকৃত দোষীদের শাস্তির বিষয়টি মূখ্য না হয়ে সরকার পতনের বিষয়টিই মূখ্য হয়ে উঠেছে। এতে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সরকার বিরোধী রাজনীতিকদের সরকার পতনের আন্দোলনের আড়ালে ক্ষমতায় অধিষ্ঠানের সংগ্রামটিই সুস্পষ্ট রূপ লাভ করেছে। এ কারণে বোমা হামলার প্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের প্রতি জনগণের মাঝে সৃষ্ট সহানুভূতি, সহমর্মিতা, সমর্থনও ইতোমধ্যে অনেকটা ভাটা পড়ে গেছে আর এ মহা জাতীয় দুর্যোগের প্রেক্ষিতে হারানো জাতীয় ঐক্য পুনঃ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাটাও তিরোহিত হয়ে গেছে।

অতীতের এমন অনেক সন্ত্রাসী ঘটনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ সিলেটে (২১ মে, ২০০৪) ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরীর ওপর গ্রেনেড হামলার ঘটনা, যা' দেশবাসীকে স্তম্ভিত করেছে। ব্রিটিশ হাইকমিশনার অল্পের জন্য বেঁচে গেছেন। এই গ্রেনেড হামলার ঘটনায় তিনজন নিহত এবং জেলা প্রশাসকসহ ৭০ জন আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় যুক্তরাজ্য সহ বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে এবং দেশটিকে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র মনে করা হয়েছে। সিলেটের সর্বশেষ গ্রেনেড হামলার ঘটনাসহ মোট ছয়টি নৃশংস বোমা ও গ্রেনেড হামলায় মোট ৩৬ জন নানা পেশার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। অনেকে গুরুতর আহত হয়ে পঙ্গু জীবন যাপন করছে।

ব্রিটিশ হাইকমিশনারের ওপর হামলার আগে এসব বোমা হামলার ঘটনার মধ্যে (১) সাতক্ষীরার বোমা বিস্ফোরণ (২৮ সেপ্টেম্বর, ২০০২), (২) ময়মনসিংহের চার প্রেক্ষাগৃহে বোমা বিস্ফোরণ (৭ ডিসেম্বর ২০০২), (৩) টাঙ্গাইলে সখীপুরে বোমা বিস্ফোরণ (১৭ জানুয়ারী ২০০৩), (৪) দিনাজপুর

ছাত্রাবাসে বোমা বিস্ফোরণ (১৩ ফেব্রুয়ারী ২০০৩) এবং (৫) সিলেট শাহজালাল (রঃ) এর মাজারের ওরসে প্রথম বোমা বিস্ফোরণ (১২ জানুয়ারী ২০০৪) প্রভৃতি সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেছে। এগুলোর মধ্যে শুধু সখীপুরের ঘটনার জন্য সাতজনকে আসামী করে চার্জশীট দেওয়া হয়েছে। আর অন্য বোমা বিস্ফোরণের ঘটনাগুলো সম্পর্কে পুলিশ বা তদন্তকারীরা চার্জশীটও দিতে সক্ষম হয়নি! তবে তদন্তকারীরা শুধু মনে করছেন যে, প্রায় প্রতিটি ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র রয়েছে এবং ঘটনাগুলো প্রায় একই ধরনের।

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেও (১৯৯৬-২০০১) দেশের বিভিন্ন স্থানে একই ধরনের বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছিল। এগুলোর মধ্যে (১) যশোর টাউন হল মাঠে উদীচীর অনুষ্ঠানে (৬ মার্চ ১৯৯৯), (২) পল্টন ময়দানে সিপিবির জনসভায় (২০ জানুয়ারী ২০০১), (৩) রাজধানীর রমনা বটমূলে পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানে (১৪ এপ্রিল ২০০১), (৪) নারায়ণগঞ্জের চাষাঢ়ায় আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে (১৬ জুন ২০০১) এবং (৫) গোপালগঞ্জের বানিয়ারচর গির্জায় (৩ জুন ২০০১) বড় বড় বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছিল। এসব ঘটনায় মোট মৃতের সংখ্যা হলো ৭১ জন। আর আহত হয়েছিলেন অসংখ্য। **এসব ভয়াবহ বোমা হামলা ঘটনার কোনো নির্ভরযোগ্য তদন্ত হয়নি বিধায় ঘটনার সত্যও উদঘাটিত হয়নি।** সে সময়ে আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রী এবং উচ্চপদস্থ গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের কাছ থেকে কোনো রকম সদুত্তরও পাওয়া যায়নি। আওয়ামী লীগ সরকার কেন দ্রুত তদন্তপূর্বক এসব ঘটনার তথ্য উদ্‌ঘাটন করে দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি দেয়নি? শুধু যশোর উদীচীর অনুষ্ঠানের বোমা হামলার ঘটনায় বিএনপির একজন মন্ত্রীসহ অনেককে আসামি করে চার্জশিট দেয়া হলেও পরবর্তীতে আসামীর তালিকা থেকে মন্ত্রীর নাম বাদ দেয়া ছাড়া তার আর কোনো অগ্রগতি হয়নি।

বিগত পাঁচ-ছয় বছর ধরে বাংলাদেশের দুই সরকারের আমলে দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে একের পর এক বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় মোট ১০৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। আর ৫৫০ জন গুরুতরভাবে আহত হয়েছে তাদের অনেকে পঙ্গু জীবন যাপন করছে। অথচ প্রকৃত অপরাধীদের খুঁজে বের করতে উভয় সরকারের ব্যর্থতা অথবা জাতীর শত্রুদের এ চক্রকে শনাক্ত করতে সরকারের অপারগতা স্বাধীন দেশের

জন্য এক অশুভ লক্ষণ নয় কি? তদন্তকারী কর্মকর্তা-বিশেষজ্ঞরা শুধু এসব বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার মধ্যে সাদৃশ্যই খুঁজে পায় কিন্তু অপরাধীদের, সন্ত্রাসীদের ধরতে তারা সক্ষম নয়? লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, বোমা বিস্ফোরণের ঘটনাগুলো ঘটছে বিভিন্ন গণজমায়েত স্থলে। যেমন, উৎসব, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মেলা, মাজার, গির্জা, সিনেমা হল এবং রাজনৈতিক সমাবেশের মত প্রভৃতি জায়গায়।

সংঘটিত বোমা বিস্ফোরণের ঘটনাগুলোর তদন্ত করে সত্য উদ্‌ঘাটনের প্রচেষ্টা জোরদার না করে বরং দুই সরকারের আমলেই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হিসেবে একে অন্যকে নানাভাবে ঘায়েল করার প্রবণতাই লক্ষ্য করা গেছে। বর্তমান বিএনপি জোট সরকার আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা তদন্তে বিচারপতি আবদুল বারী সরকারের নেতৃত্বে তিন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির রিপোর্টে অপর দু'জন তাঁদের ভিন্নমত ব্যক্ত করায় ওই রিপোর্ট নিয়ে আর এগোতেই পারেনি। ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলা তদন্তে বিচারপতি জয়নুল আবেদীনের নেতৃত্বে নিয়োগকৃত এক সদস্য বিশিষ্ট বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট পেশ করা হলেও রিপোর্ট সম্পর্কে কমিশন প্রধানের বিভ্রান্তিমূলক কিছু বক্তব্য ছাড়া সরকারী ভাবে কোন তথ্য এখনও প্রকাশ করা হয়নি। এছাড়া, আন্তর্জাতিক সংস্থা ইন্টারপোল এবং ইউএস সরকারের এফবিআইকেও এ গ্রেনেড হামলার সুষ্ঠু তদন্তে সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থাগুলোকে সহযোগিতা করতে নিয়োজিত করা হয়েছিল। তাঁরা তাঁদের তদন্ত প্রতিবেদন পেশ করলেও সরকারী ভাবে গ্রেনেড হামলা সম্পর্কে আর কিছুই জানানো হয়নি, যেমনটি ঘটেছে বৃটিশ হাই কমিশনার আনোয়ার চৌধুরীর ওপর বোমা হামলার ঘটনায়ও। হামলার রহস্য উদ্‌ঘাটনে নিয়োজিত স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড এর তদন্ত রিপোর্টও পেশ করার পর সরকার তা' এখনও প্রকাশ করেনি।

দেশে শান্তি-শৃংখলা ও নিরাপত্তা বিধানে সরকারী কর্তব্য বিবেচনায় বাংলাদেশের বিস্ময়কর ব্যর্থতার নজির সভ্য দুনিয়ার কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে কি? কোনো দেশে এত বড় বড় বোমা-গ্রেনেড বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে, শত শত মানুষ আহত-নিহত আর পঙ্গু হয়েছে অথচ সে দেশের সরকার ওই সব ঘটনার জন্য দায়ীদের সনাক্ত করতে পারেনি এবং ঘটনার তদন্তে ও রহস্য উদ্‌ঘাটনে নির্লিপ্ত থাকার এমন দৃষ্টান্ত আছে কি?

বিগত পাঁচ-ছয় বছর ধরে দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত বোমা-গ্রেনেড বিস্ফোরণের ঘটনাগুলোর রহস্য উদ্‌ঘাটনে চরম ব্যর্থতা নির্বাচিত সরকার দু'টোর রাজনৈতিক ব্যর্থতাই প্রমাণ করে। এ ব্যর্থতা রাষ্ট্রের কার্যকারিতাকেও প্রশ্নবিদ্ধ করে।

বাংলাদেশের উন্নয়নে দায়িত্বশীল রাজনৈতিক নেতৃত্ব অনুপস্থিত! ২০০৪ সালের ১৯ আগস্ট ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে ইউএনডিপি প্রশাসক মার্ক ম্যালক ব্রাউন বলেন, বাংলাদেশে প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের পারস্পরিক বৈরিতা দূর করা এবং কোন রাজনৈতিক দলের সাংসদদের সংসদ অধিবেশন বর্জনের সংস্কৃতি বন্ধ করা জরুরী। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের সহনশীল রাজনীতি গড়ে তোলার জন্য দরকার দায়িত্বশীল রাজনৈতিক নেতৃত্ব। বাংলাদেশ জাতিসংঘ ঘোষিত শতাব্দীর উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কিছু সাফল্য অর্জন করলেও এখানে অর্থনৈতিক, সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য সন্ত্রাস ও দুর্নীতি দমন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সহনশীলতা এবং উন্নয়ন নীতিমালার ধারাবাহিকতা আবশ্যক এবং অত্যন্ত জরুরী বলে মিঃ মার্ক ম্যালক ব্রাউন মন্তব্য করেন। পার্বত্য চট্টগ্রামে ইউএনডিপির গ্রহণ করা উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কে তিনি বলেন, উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ এই প্রকল্পে সন্তুষ্ট। তারা এই প্রকল্প অব্যাহত রাখা ও সম্প্রসারণের অনুরোধ জানিয়েছেন। এক প্রশ্নের জবাবে মার্ক ম্যালক ব্রাউন বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের নেতা সন্তু লারমা শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সন্তু লারমা উপজাতীয়দের চুক্তিতে প্রতিশ্রুত রাজনৈতিক ও অন্যান্য অধিকার দেয়া হচ্ছে না বলেও অভিযোগ করেছেন। তবে এ বিষয়ে ইউএনডিপির কোন বক্তব্য নেই। কারণ ইউএনডিপি সরকার ও উপজাতীয় জনগোষ্ঠীকে নিয়ে শুধু উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ করে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে ক্রমবর্ধমান সহিংসতা ইউএনডিপির কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করছে কিনা জানতে চাইলে মার্ক ম্যালক ব্রাউন বলেন, ইউএনডিপি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে স্থানীয় রাজনৈতিক সংঘাতের মাঝেও কাজ করে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে ইউএনডিপি কোন পক্ষের হয়ে কাজ করছে না। কোন পক্ষ ইউএনডিপির উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বিরোধিতাও করছে না। তবু অতীতে বিদেশীদের অপহরণের মতো ঘটনার কারণে ইউএনডিপি পুলিশ ও সেনাবাহিনীর

সহায়তায় পূর্ব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করছে। ইউএনডিপি মনে করে, পার্বত্য চট্টগ্রামের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলে রাজনৈতিক সহিংসতা দূর হবে।

দেশে অস্ত্রের অবাধ চোরাচালান!! সিলেটে শাহজালাল (রঃ) এর মাজার মসজিদে ব্রিটিশ হাইকমিশনারের ওপর গ্রেনেড হামলা ও অন্যান্য বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার মাত্র দু' মাস আগে (২ এপ্রিল ২০০৪) চট্টগ্রামের ১০ ট্রাক অস্ত্র আর গোলাবারুদ আটকের ঘটনা সারাদেশে ব্যাপক উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করেছিল। সে ভয়ঙ্কর ঘটনার প্রকৃত তথ্য এখনও দেশবাসী জানতে পায়নি। পুলিশ বা সিআইডি তাদের তদন্তে এত বড় অস্ত্র চোরাচালানের উৎস বা মূল হোতা সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য দিতে সক্ষম হয়নি। পরবর্তীতে তাদের দেয়া চোরাচালান মামলার মেমো অব এ্যাভিডেন্স (এম,ই) বা সাক্ষ্য স্মারকলিপি দাখিল করা হলেও তাতে কোন মন্তব্য করা হয়নি। এম,ইতে অস্ত্র আইনে দায়েরকৃত মামলার চার্জশীটভূক্ত তেতাল্লিশ জনকে আসামী করার সুপারিশই করা হয়েছে। ১০ ট্রাক অস্ত্র-গোলা, যার মধ্যে ছিল একে-৪৭, উজি ও টমিগান, রকেট লঞ্চার, পিস্তল, হ্যাণ্ড গ্রেনেডসহ বিপুল পরিমাণ গুলি ও বিস্ফোরক ইত্যাদি। বিশেষজ্ঞ মহল চট্টগ্রামে আটককৃত অস্ত্র চোরাচালানের মতো ঘটনা এটাই যে প্রথম এমন মনে করেন না। এর আগেও অস্ত্র আনা-নেয়া না করে অস্ত্র ব্যবসায়ীরা প্রথম বারেই এ বিপুল অস্ত্রের চোরাচালান করতে সাহস করতে পারে না। ১৯৯৫ সালের আগস্ট মাসেও অস্ত্রের একটি বড় চালান ট্রাকে তোলার সময় কক্সবাজারে আটক হয়েছিল।

চট্টগ্রামের এই অস্ত্র চোরাচালানের ঘটনার আগে ২০০৩ সালের ২৭ জুন বগুড়ার কাহালুতে ৬২ হাজার ১০০ রাউন্ড চায়নিজ রাইফেলের গুলি ও ১২০ কেজি বিস্ফোরক আটক করা হয় এবং পরে পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে মোট ৯৯ হাজার ৯৬৯ রাউন্ড গুলি ও প্রায় ১৭৪ কেজি বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত প্রকৃত অস্ত্র ব্যবসায়ী বা জঙ্গি গোষ্ঠীকে এখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি! ইতোমধ্যে এ সংক্রান্ত চারটি মামলার একই ধরনের চার্জশীট দিয়ে পুলিশ তার দায়িত্ব শেষ করেছে! চট্টগ্রামের ১০ ট্রাক অস্ত্রের চোরাচালান ও অন্যান্য অস্ত্র-গোলাবারুদের আনা-নেয়ার ঘটনাগুলোর ব্যাপারে সরকার ও প্রশাসন এখনও

উদাসীন কেন? এ ঔদাস্য দেশে ও বিদেশে সরকারের কার্যকারিতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

উল্লেখিত সন্ত্রাসী ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতায় ২১শে আগস্টের নারকীয় গ্রেনেড হামলার উৎস খুঁজে বের করার জন্য দলমত নির্বিশেষে যে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা আবশ্যক তা' সরকার পতন বা নতুন নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন দ্বারা কখনও সম্ভব নয়। সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, জিম্মি-মুক্তিপন, খুন, বোমাবাজি ও গ্রেনেড হামলা ইত্যাদির মত অপরাধের সুযোগটা রেখে যে নির্বাচন হবে তার দ্বারা সরকার বদলে প্রচলিত জাতীয় রাজনীতিতে গুণগত কোন পরিবর্তন অতীতে যেমন ঘটেনি তেমনি ভবিষ্যতেও ঘটবে বলে আশা করা যায় না। কারণ, এ ধরণের নির্বাচন দ্বারা পুরাতন রাজনৈতিক চর্চার হাত তো বদলায় না! একই চরিত্রের নেতা-নেত্রীদের হাতেই দেশের রাজনৈতিক চর্চা সীমাবদ্ধ থেকে যায়। সুতরাং ক্রস ফায়ারে শীর্ষ বা 'প্রবীণ' সন্ত্রাসীরা মারা গেলেও শীর্ষ বা 'প্রবীণ' গডফাদাররা তো মারা যাচ্ছে না। অতএব, এসব গডফাদারদের হাতে 'নবীন' সন্ত্রাসী তৈরীর সম্ভাবনা পুরোপুরি অক্ষুণ্নই থেকে যায়। সাবেক সাংসদ ও প্রবীণ সাংবাদিক এবং দৈনিক যুগান্তরের সম্পাদক এবিএম মূসা ২০০৪ সালের ১৬ অক্টোবর তাঁর পত্রিকায় প্রকাশিত এক নিবন্ধে বলেছেন, 'আওয়ামী লীগ সরকারের ব্যর্থতা ছিল বড় মাপের সন্ত্রাসীদের দমন না করা বরং প্রশ্রয় দেয়া। এখন জোট সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ হচ্ছে, বড় সন্ত্রাসীরা আড়ালে চলে গেছে কিন্তু আন্ডা-বাচ্চাগুলোকে সামলানো যাচ্ছে না। বরং সরকারী দলের কারও কারও মদদে বেড়ে উঠেছে। এদের দমনের জন্য নানা নামে নানা ধরনের বাহিনী আর আইন-শৃংখলা রক্ষাকারীদেরকে মাঠে নামানো হয়েছে। তারপরও হার্টফেল করে বা ক্রসফায়ারে মরেও তাদের সংখ্যা কমছে না। সাধারণ ধারণা হচ্ছে, সন্ত্রাস দমন সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে।'

স্বীয় ব্যর্থতার দায়ে সভ্য সমাজের রাজনীতিকদের মত বাংলাদেশের ব্যর্থ রাজনীতিকদের কেউ রাজনীতি থেকে অবসর যেমন নেন না তেমনি সরকার বা দল থেকে পদত্যাগও করেন না। এ জন্য সচেতন সমাজ দেশের রাজনৈতিক দলগুলোকে 'লিমিটেড কোম্পানী' বলে তিরস্কার করে থাকে। দেশে ব্যর্থমান শাসনের এটা এক চরম

ফলশ্রুতি। রাজনীতিক বা রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীর প্রতি দেশবাসীর অটল বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধ দেশে শৃঙ্খলা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত। যে রাজনীতিতে দলীয় অনুসারীরা অন্যায়ে প্রশ্রয় এবং সন্ত্রাসে-মদদ পায়, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জাতীয় অঙ্গীকার উপেক্ষা করে দেশের প্রচলিত আইন-কানুন ভঙ্গ বা অমান্য করে জাতীয় সম্পদ লুট-পাটের সুযোগ পায়; যে রাজনীতিতে জনসাধারণের জীবনের নিরাপত্তা নেই; সামাজিক নিরাপত্তা নেই সে রাজনীতির হোতা রাজনীতিকদের প্রতি যেমন কোন সচেতন নাগরিকের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধ থাকে না তেমনি তাঁদের নেতৃত্বে পরিচালিত প্রশাসন বা শাসন ব্যবস্থার প্রতিও দেশবাসীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধ লোপ পায় এবং দেশবাসী তাঁদের হাতে কিছুই নিরাপদ বোধ করে না।

চার

চাঁদাবাজিতে স্বাভাবিক জীবন অতিষ্ঠ

ব্যাপক চাঁদাবাজির কারণে বাংলাদেশে ব্যবসায়-বাণিজ্য, জীবন-জীবিকার স্বাভাবিক পরিবেশ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হওয়ার খবর স্বাধীনতার পর থেকেই সংবাদপত্রের উল্লেখযোগ্য সংবাদ শিরোনাম হিসেবে স্থান পেয়ে আসছে। ক্ষমতাধর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক গডফাদারদের ছত্রছায়ায় বেকার-বখাটে-সন্ত্রাসী চাঁদাবাজদের দৌরাত্মে দেশের সর্বত্র নির্মাণাধীন দালান-কোঠা, মসজিদ, ঢাকার ফুটপাত ও কারওয়ান বাজার (পাইকারী) সহ দেশের প্রায় সব হাট-বাজার, আধুনিক বিপনীকেন্দ্র, হোটেল-রেস্তোঁরা, বাণিজ্যিক এলাকার ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, মানি এক্সচেঞ্জ, বিদেশ ফেরৎ ব্যক্তি, বিয়ের অনুষ্ঠান ইত্যাদি নিরাপত্তাহীন এবং এ লাগামহীন চাঁদাবাজিতে দেশের জনসাধারণ আতংকগ্রস্থ। প্রকাশ্যে বাধাগ্রস্ত হলে এরা গোপনে বা নীরবে চাঁদাবাজি করে। এমন কি, জেল-হাজতে বসেও শীর্ষ চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসীরা তা' অব্যাহত রাখে। এলাকা ভিত্তিক তাদের নিজ নিজ 'বাহিনীর' সদস্যরা 'নেতাজিদের' নির্দেশ মত তালিকাভুক্ত ব্যক্তিদের নিকট থেকে নির্দিষ্ট হারে চাঁদা আদায় করে। সড়ক-জনপথেও তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড আরও

ভয়ংকর ও বেদনাদায়ক। তা'ছাড়া ট্রাফিক ও টহল পুলিশের চাঁদাবাজি ও হয়রানী তো অবর্ণনীয়। ট্রাফিক পুলিশ কোন গাড়ী চালক বা মালিক-নাগরিককে এমনভাবে বিব্রত করে যে, সময়ের মূল্য দিতে গিয়ে ভুক্তভোগীকে সংশ্লিষ্ট ট্রাফিকের চাঁদার দাবি চুকিয়েই যেতে হয়। কোন কোন সময় ট্রাফিকের উপদ্রবে অনেক নিরীহ গাড়ী মালিক-চালক দুঃখ করে দেশ ছেড়ে চলে যাবার ইচ্ছেও ব্যক্ত করে। সর্বোপরি, এ ব্যাপক চাঁদাবাজির আতংক মানুষের স্বাভাবিক জীবন ধারণের পরিবেশকেও যারপর নাই বিপন্ন করে তুলেছে। ঢাকা শহরের ফুটপাতে টহল পুলিশের তত্ত্বাবধানে তাদের লাইনম্যানদের চাঁদাবাজির একটি উদাহরণ দিয়ে সারা দেশের ফুটপাতে চাঁদাবাজির ভয়াবহতা মূল্যায়ন করা যায়।

ঢাকার গডফাদাররা প্রতিদিন এক কোটি টাকা ফুটপাত থেকে তোলা চাঁদা ভাগ-বাটোয়ারায় নিয়োজিত। ২০০৪ সালের ৯ নভেম্বর একটি দৈনিকে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নগরীর লক্ষাধিক হকারের কাছ থেকে দৈনিক প্রায় ১ কোটি টাকা চাঁদা আদায় করছে টহল পুলিশের তত্ত্বাবধানে লাইনম্যানরা। ২০০৪ সালের ঈদ-উল্-ফিত্‌র মৌসুমকে কেন্দ্র করে শুধু গুলিস্তান এলাকায় পুলিশ কর্তৃক শেষ ১০ রোজায় চাঁদার টার্গেট বেঁধে দেয়া হয়েছে ১ কোটি টাকা। সম্প্রতি পুলিশ প্রশাসনের ক'জন কর্মকর্তার সঙ্গে চাঁদা আদায়কারী লাইনম্যানদের এক গোপন বৈঠকে এ ১ কোটি টাকা চাঁদার টার্গেট এবং সে চাঁদা পুলিশকে প্রদানের কৌশল নির্ধারিত হয়। এজন্য বৈঠকে একজন লাইনম্যানকে লাইনম্যানদের প্রতিনিধি বানিয়ে চাঁদ রাতের দিন সন্ধ্যার পর পুলিশের এক কর্মকর্তার হাতে চাঁদার সমুদয় টাকা তুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ প্রতিবেদনের সংশ্লিষ্ট সূত্র আরও জানায়, সম্প্রতি আর একটি প্রতিবেদনে চাঁদা আদায়কারী এ লাইনম্যানদের নাম প্রকাশের পর র‍্যাব এসব লাইনম্যানের খোঁজে বেশ কয়েকটি জায়গায় অভিযান চালায়। তাই বর্তমানে র‍্যাব এবং চিতা আতঙ্কে চিহ্নিত লাইনম্যানরা আত্মগোপন করে ফুটপাতে বিকল্প লাইনম্যান নিযুক্ত করে। এ **আত্মগোপনকারীদের মধ্যে ছিলো এ চাঁদার ভাগ পাওয়া একজন সিটি কর্পোরেশনের কমিশনারও।** আবার বিকল্প লাইনম্যান বিহীন কয়েকটি স্পটে টহল পুলিশ নিজেই চাঁদা নেয়। ঈদ মৌসুমে গুলিস্তান-মতিঝিল এলাকায় প্রায় ২০ হাজার হকার বসে। তাদের কাছ থেকে দৈনিক ১০০ টাকা থেকে

১৫০ টাকা নেয়া হলেও পুলিশের চাঁদার হিসাব ধরা হয় দৈনিক দোকান প্রতি ৫০ টাকা করে। এ হিসাবে এক দিনে টাকা ওঠে ১০ লাখ টাকা। তাই ঈদের চাঁদ রাত পর্যন্ত চাঁদার টার্গেট ধরা হয় ১ কোটি টাকা। এ টাকা পুলিশকে প্রদানের জন্য লাইনম্যানদের সর্দার বানানো হয় হকি স্টেডিয়াম এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত লাইনম্যানকে। চাঁদ রাতের দিন সন্ধ্যার পর পুলিশের হাতে এ টাকা তুলে দেয়ার পর স্থানীয় এক এসি এ টাকা সবার মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে দেয়ার কথা। এ টাকা কে কে পাবে ? -এ প্রশ্নে বায়তুল মোকাররম এলাকার এক লাইনম্যান পাল্টা প্রশ্ন করে বলেন, পুলিশ, এসবি, ডিবি, এনএসআই, ট্রাফিক থেকে শুরু করে ডিসি'র ড্রাইভার পর্যন্ত কার পকেটে হকারের পয়সা যায় না বলেন ?

এছাড়া নগরীর প্রায় ২ লাখ হকারের কাছ থেকে দৈনিক চাঁদা উঠছে কমপক্ষে ১ কোটি টাকা। নগরীর শতাধিক লাইনম্যানের মাধ্যমে এ টাকা রাত ৯টা-১০টার দিকে এসে পৌছায় 'বরিশাইল্যা' নামের গুলিস্তান এলাকার দুই সহোদরের কাছে। তারাই নিয়মিত পুলিশের হাতে এ টাকা তুলে দেয়।

হকারদের কাছ থেকে জানা যায়, লাইনম্যানদের নামে সম্প্রতি একটি দৈনিকে রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পরপর র‍্যাব সন্ধ্যার পর চাঁদা তোলাকালে নগরীর বেশ কিছু ফুটপাতে ঢু-মারে। এরপর থেকেই চিহ্নিত লাইনম্যানরা আতঙ্কে আত্মগোপন করে বেশকিছু নতুন (বিকল্প) লাইনম্যানকে দিয়ে চাঁদা আদায়ের কাজ করাচ্ছে। এসব আত্মগোপনকারীদের মধ্যে রয়েছে চিহ্নিত লাইনম্যানরা। সংশ্লিষ্টরা জানান, গুলিস্তান এলাকার হকার-চাঁদার উল্লেখযোগ্য একটা অংশ যায় স্থানীয় **'চৌ'** আদ্যাক্ষরের সিটি কর্পোরেশনের এক কমিশনারের কাছে। তিনিও র‍্যাব আতঙ্কে এসময় আত্মগোপন করে থাকছেন। তাঁর বিরুদ্ধে এমনিতেই শতাধিক মামলা রয়েছে।

পুরানা পল্টনের হকারদের সাথে কথা বলে জানা যায়, দোকান প্রতি তাদের ছোট দোকান ৬০ টাকা থেকে বড় দোকান ১০০ টাকা পর্যন্ত চাঁদা দিতে হয়। এই চাঁদা নেয় নব্য এক লাইনম্যান। বেশ কিছুক্ষণ এ ফুটপাতে অবস্থানের পর মাথায় পাগড়ি পরা সে লাইনম্যানের সঙ্গে দেখা হয়। মুখের লম্বা দাড়ি এবং মাথার টুপি-পাগড়ি দেখে প্রথমত হুজুরই মনে হয়। গত ৮ নভেম্বর বিকাল ৩ টা ৩০ মিনিটে তার সঙ্গে কথা বলার সময় তার পাশে

উপস্থিত ছিলেন ওয়্যারলেস হাতে এসবির লোক পরিচয় দেয়া কালো লম্বা ঢ্যাঙা শরীরের এক ব্যক্তিও। এই ফুটপাত থেকে দৈনিক কত চাঁদা তোলা হয়? সরাসরি এই প্রশ্নে একটু বিব্রত হয়ে সে ব্যক্তি বলেন, আগে যে লাইনম্যান চাঁদা তুলতো সে মারা গেছে। এরপর কেউ চাঁদা তোলে না। তুললেও পুলিশ টুকটাক চাঁদা নেয়।

ফুটপাতে এ চাঁদাবাজি প্রসঙ্গে দেশের অন্যতম একটি হকার সংগঠনের শীর্ষ নেতা তার নাম গোপন রাখার শর্তে বলেন, র‍্যাবের ভয়ে নগরীর অন্যতম লাইনম্যানরা আত্মগোপন করে থাকলেও চাঁদাবাজি ঠিকই চলছে। পত্রিকায় চাঁদাবাজদের নাম প্রকাশিত হওয়ার পর তথ্য দেয়ার সন্দেহ করে কয়েকজন পুলিশ কর্মকর্তা তাঁকে হুমকি-ধমকি দিয়েছে। কিছু পুলিশ সবসময় কাঁচা টাকার লোভে চাঁদাবাজদের পক্ষ অবলম্বন করায় এসব লাইনম্যানের বিপক্ষে কেউ কিছু বলার সাহস করে না। আর এ নিয়ে লেখালেখি হলেও অদৃশ্য ইশারায় এরা থাকে বহাল তবিয়তেই।

পাঁচ

বাংলাদেশ দুর্নীতিতে বিশ্ব-সেরা দেশ!

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ২০০১ সালের ২৭ জুন প্রকাশিত বার্লিন ভিত্তিক দুর্নীতি বিরোধী আন্তর্জাতিক সংস্থা 'ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল'-এর জরীপে বাংলাদেশ প্রথম বারের মত বিশ্বের সেরা দুর্নীতিবাজ রাষ্ট্রের অবস্থান লাভ করে। পরবর্তীতে বিএনপি জোট সরকারের আমলেও তা' অব্যাহত রয়েছে। 'ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল'-এর পর পর তিনটি বার্ষিক (২০০২-২০০৩ ও ২০০৪) জরীপ রিপোর্টেও বাংলাদেশ বিশ্বের সেরা দুর্নীতিবাজ রাষ্ট্রের অবস্থানে অটুট রয়েছে। অন্যান্য সালের মত সংস্থার ২০০৪ সালের বার্ষিক জরীপ রিপোর্টটি ২০ অক্টোবর (লণ্ডন সহ) একযোগে সারা বিশ্বে প্রকাশ পায়। এ নিয়ে বাংলাদেশ পরপর চতুর্থ বার 'দুর্নীতিতে বিশ্ব-সেরা' অবস্থানেই রয়ে গেল! স্বাধীনতার পতাকাধারী হবার পর থেকে অদ্যাবধি হাজারো সমস্যায় জর্জরিত বাংলাদেশ নিয়ে দেশের সচেতন-সৎ-রাজনীতিক, অর্থনীতিক, সমাজসেবী, পেশাজীবী, কর্মজীবী,

১৫০ টাকা নেয়া হলেও পুলিশের চাঁদার হিসাব ধরা হয় দৈনিক দোকান প্রতি ৫০ টাকা করে। এ হিসাবে এক দিনে টাকা ওঠে ১০ লাখ টাকা। তাই ঈদের চাঁদ রাত পর্যন্ত চাঁদার টার্গেট ধরা হয় ১ কোটি টাকা। এ টাকা পুলিশকে প্রদানের জন্য লাইনম্যানদের সর্দার বানানো হয় হকি স্টেডিয়াম এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত লাইনম্যানকে। চাঁদ রাতের দিন সন্ধ্যার পর পুলিশের হাতে এ টাকা তুলে দেয়ার পর স্থানীয় এক এসি এ টাকা সবার মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে দেয়ার কথা। এ টাকা কে কে পাবে ? -এ প্রশ্নে বায়তুল মোকাররম এলাকার এক লাইনম্যান পাল্টা প্রশ্ন করে বলেন, পুলিশ, এসবি, ডিবি, এনএসআই, ট্রাফিক থেকে শুরু করে ডিসি'র ড্রাইভার পর্যন্ত কার পকেটে হকারের পয়সা যায় না বলেন ?

এছাড়া নগরীর প্রায় ২ লাখ হকারের কাছ থেকে দৈনিক চাঁদা উঠছে কমপক্ষে ১ কোটি টাকা। নগরীর শতাধিক লাইনম্যানের মাধ্যমে এ টাকা রাত ৯টা-১০টার দিকে এসে পৌছায় 'বরিশাইল্যা' নামের গুলিস্তান এলাকার দুই সহোদরের কাছে। তারাই নিয়মিত পুলিশের হাতে এ টাকা তুলে দেয়।

হকারদের কাছ থেকে জানা যায়, লাইনম্যানদের নামে সম্প্রতি একটি দৈনিকে রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পরপর র‍্যাব সন্ধ্যার পর চাঁদা তোলাকালে নগরীর বেশ কিছু ফুটপাতে টু-মারে। এরপর থেকেই চিহ্নিত লাইনম্যানরা আতঙ্কে আত্মগোপন করে বেশকিছু নতুন (বিকল্প) লাইনম্যানকে দিয়ে চাঁদা আদায়ের কাজ করাচ্ছে। এসব আত্মগোপনকারীদের মধ্যে রয়েছে চিহ্নিত লাইনম্যানরা। সংশ্লিষ্টরা জানান, গুলিস্তান এলাকার হকার-চাঁদার উল্লেখযোগ্য একটা অংশ যায় স্থানীয় 'চৌ' আদ্যাক্ষরের সিটি কর্পোরেশনের এক কমিশনারের কাছে। তিনিও র‍্যাব আতঙ্কে এসময় আত্মগোপন করে থাকছেন। তাঁর বিরুদ্ধে এমনিতেই শতাধিক মামলা রয়েছে।

পুরানা পল্টনের হকারদের সাথে কথা বলে জানা যায়, দোকান প্রতি তাদের ছোট দোকান ৬০ টাকা থেকে বড় দোকান ১০০ টাকা পর্যন্ত চাঁদা দিতে হয়। এই চাঁদা নেয় নব্য এক লাইনম্যান। বেশ কিছুক্ষণ এ ফুটপাতে অবস্থানের পর মাথায় পাগড়ি পরা সে লাইনম্যানের সঙ্গে দেখা হয়। মুখের লম্বা দাড়ি এবং মাথার টুপি-পাগড়ি দেখে প্রথমত হুজুরই মনে হয়। গত ৮ নভেম্বর বিকাল ৩ টা ৩০ মিনিটে তার সঙ্গে কথা বলার সময় তার পাশে

উপস্থিত ছিলেন ওয়্যারলেস হাতে এসবির লোক পরিচয় দেয়া কালো লম্বা ঢ্যাঙা শরীরের এক ব্যক্তিও। এই ফুটপাত থেকে দৈনিক কত চাঁদা তোলা হয়? সরাসরি এই প্রশ্নে একটু বিব্রত হয়ে সে ব্যক্তি বলেন, আগে যে লাইনম্যান চাঁদা তুলতো সে মারা গেছে। এরপর কেউ চাঁদা তোলে না। তুললেও পুলিশ টুকটাক চাঁদা নেয়।

ফুটপাতে এ চাঁদাবাজি প্রসঙ্গে দেশের অন্যতম একটি হকার সংগঠনের শীর্ষ নেতা তার নাম গোপন রাখার শর্তে বলেন, র‍্যাবের ভয়ে নগরীর অন্যতম লাইনম্যানরা আত্মগোপন করে থাকলেও চাঁদাবাজি ঠিকই চলছে। পত্রিকায় চাঁদাবাজদের নাম প্রকাশিত হওয়ার পর তথ্য দেয়ার সন্দেহ করে কয়েকজন পুলিশ কর্মকর্তা তাঁকে হুমকি-ধমকি দিয়েছে। কিছু পুলিশ সবসময় কাঁচা টাকার লোভে চাঁদাবাজদের পক্ষ অবলম্বন করায় এসব লাইনম্যানের বিপক্ষে কেউ কিছু বলার সাহস করে না। আর এ নিয়ে লেখালেখি হলেও অদৃশ্য ইশারায় এরা থাকে বহাল তবিয়তেই।

পাঁচ

বাংলাদেশ দুর্নীতিতে বিশ্ব-সেরা দেশ!

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ২০০১ সালের ২৭ জুন প্রকাশিত বার্লিন ভিত্তিক দুর্নীতি বিরোধী আন্তর্জাতিক সংস্থা 'ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল'-এর জরীপে বাংলাদেশ প্রথম বারের মত বিশ্বের সেরা দুর্নীতিবাজ রাষ্ট্রের অবস্থান লাভ করে। পরবর্তীতে বিএনপি জোট সরকারের আমলেও তা' অব্যাহত রয়েছে। 'ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল'-এর পর পর তিনটি বার্ষিক (২০০২-২০০৩ ও ২০০৪) জরীপ রিপোর্টেও বাংলাদেশ বিশ্বের সেরা দুর্নীতিবাজ রাষ্ট্রের অবস্থানে অটুট রয়েছে। অন্যান্য সালের মত সংস্থার ২০০৪ সালের বার্ষিক জরীপ রিপোর্টটি ২০ অক্টোবর (লণ্ডন সহ) একযোগে সারা বিশ্বে প্রকাশ পায়। এ নিয়ে বাংলাদেশ পরপর চতুর্থ বার 'দুর্নীতিতে বিশ্ব-সেরা' অবস্থানেই রয়ে গেল! স্বাধীনতার পতাকাধারী হবার পর থেকে অদ্যাবধি হাজারো সমস্যায় জর্জরিত বাংলাদেশ নিয়ে দেশের সচেতন-সৎ-রাজনীতিক, অর্থনীতিক, সমাজসেবী, পেশাজীবী, কর্মজীবী,

সাংবাদিক, লেখক, গবেষক, শিক্ষক-ছাত্র সহ দেশের সচেতন গণমানুষ বিচলিত-শংকিত-কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কারণ, বিংশ শতকের ৭০-৯০ এর দশক যেমন গেল নতুন শতকের ৪র্থ বছরেও এ দেশের সামাজিক অবস্থার অবনতিই অব্যাহত। এ সামাজিক অবস্থা শুধু নৈরাজ্য আর অস্থিরতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, জাতীয় লক্ষ্য ও আদর্শ বিবর্জিত রাজনৈতিক অপচর্চার শিকারও বটে। ৭০-এর দশকে বাংলাদেশের স্থপতি বাঙ্গালী জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান একদিন স্বয়ং যে দুর্নীতিকে জাতির এক নম্বর শত্রু বলে আখ্যা দিয়েছিলেন সে দুর্নীতির ধারাবাহিকতায় স্বাধীনতার একত্রিশ বছরে (২০০১ সালে) জাতি প্রথম বারের মত বিশ্বের সেরা দুর্নীতিবাজে পরিণত হয়েছে। দুর্নীতিই এখন সমাজের প্রায় সব কিছুর নিয়ন্ত্রক; দুর্নীতিই যেন পরিণত হয়েছে এক 'অলংঘনীয় নীতিতে'। দেশের বুকে বিস্তৃত এ সীমাহীন দুর্নীতিই সব সন্ত্রাসের ধারক, বাহক এবং রক্ষকও। এখানে শান্তি-শৃঙ্খলা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারী কিছু বিচ্ছিন্ন প্রয়াস দেশবাসীর কাছে সান্ত্বনাদায়ক ছলনার মত নয় কি? দুর্নীতির মূল হোতা বা 'গডফাদারদের' ধরা-ছোঁয়ার বাইরে রেখে তাদের আশীর্বাদপুষ্ট শীর্ষ বা অধঃস্তন দুর্নীতিবাজ নিধনের অভিযান দুর্নীতি দমনে বা নির্মূলে ফলপ্রসূ হতে পারে কি? এ ধরনের প্রয়াস গাছের গোড়ায় পানি না দিয়ে আগায় দেয়ার মত নয় কি? স্বাধীনতার তেত্রিশ বছরে দুর্নীতির নিশ্ছিদ্র ব্যাপকতায় বাংলাদেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির এত অবনতি ঘটেছে যে, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তার নিয়ন্ত্রক-মন্ত্রক কেউ কখনও ছিল বা আছে বলে মনে হয় না। বিচার ব্যবস্থারও এক-ই হাল। দেশের বিচার বিভাগ প্রশাসন থেকে আজও আলাদা বা স্বাধীন হয়নি বিধায় তা' প্রশাসনের প্রভাব-মুক্ত নয়। ইতোমধ্যে দেশের সর্বোচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগেও স্বচ্ছতার অভাব দেখা দেয়। রাজনৈতিক দলীয় প্রভাবে আইনজীবীরাও চরম ভাবে দ্বিধাবিভক্ত। ফলে, দেশের বিচার ব্যবস্থাও জনগণের আস্থাভাজন হতে এখনও সক্ষম নয়। দুর্নীতিতে পর পর চতুর্থ বারও প্রথম স্থান অধিকার করার অর্থ এ-ই কি দাঁড়ায় যে, দেশটির গোটা প্রশাসনই চরম ভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত? পত্র-পত্রিকা এবং অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমের তথ্য আর সংশ্লিষ্টদের আচার-আচরণও প্রমাণ করে যে, প্রশাসনের কোথাও নীতির বালাই নেই, নৈতিকতাও নেই; দেশে আইন-শৃংখলার স্থলে বে-আইন আর বিশৃংখলাই বিদ্যমান। এতে দেশের সাধারণ মানুষের মনে বিরাজমান গভীর হতাশা, আতংক ও নিরাপত্তাহীনতা বেড়েই চলেছে।

এমতাবস্থায়, নিয়ন্ত্রণহীন কোন যানবাহন কোন গভীর খাদে বা নদীতে পড়ে গেলে হতভাগ্য যাত্রীদের অবস্থার সঙ্গে বাংলাদেশ এবং তার জনগণের বর্তমান অবস্থার তুলনা করা যায়। দেশের আইন-শৃংখলা রক্ষকরা-ই যদি তার ভক্ষক হয়ে থাকে; দুর্নীতি দমনকারীরাই যদি দুর্নীতিবাজ হয়ে থাকে তবে কে কার নিরাপত্তা দেবে? সন্ত্রাস ও দুর্নীতি দমনকারীরা-ই যদি সন্ত্রাস বা দুর্নীতির হোতা বা 'গডফাদার' হয়ে থাকে, তবে সে মহাসন্ত্রাস ও মহাদুর্নীতি কে দমন করবে? দুর্নীতির কয়েকটি বিস্ময়কর বাস্তব চিত্রই দুর্নীতিতে জাতীয় মহারুগ্নতার পরিচায়ক। দেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রে আইএমএফ ও ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দুর্নীতি সম্পর্কিত প্রতিবেদন ছাড়াও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নৌপরিবহন এবং সংসদ সচিবালয়ের দুর্নীতির রাহুগ্রস্ততার বিস্তৃতি সম্পর্কে নিম্নোক্ত বেশ কিছু উদাহরণমূলক তথ্যও প্রকাশ পায়।

১. আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (আইএমএফ) রাজস্ব আদায়ে ঘাটতির জন্য প্রধানতঃ চারটি কারণ চিহ্নিত করেছে। এগুলো হচ্ছেঃ রাজস্ব কর্মকর্তাদের দুর্নীতি ও অসততা, দায়িত্ব পালনে অবহেলা, দেশপ্রেম ও দক্ষতার অভাব এবং কর প্রদানে জনসাধারণকে উৎসাহিত করতে ব্যর্থতা। ২০০৪ সালের ২৮ আগস্ট প্রকাশিত আইএমএফ-এর 'বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র বাস্তবায়নের অবস্থা' সম্পর্কিত প্রতিবেদনে রাজস্ব আদায়ে ব্যর্থতার জন্য উক্ত কারণগুলোকে শনাক্ত করা হয়েছে। এতে বলা হয়, রাজস্ব বিভাগ দুর্নীতিগ্রস্ত। এসব প্রতিষ্ঠানে জনসাধারণকে নানাভাবে হয়রানি করা হয়। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও প্রভাব বিস্তারের কারণে ওসব প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও শৃংখলা নেই বললেই চলে। তারা সরকারের পাশাপাশি পরীক্ষামূলক ভাবে বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা চালু করারও সুপারিশ করেছে। প্রতিবেদনে জনগণের সঙ্গে অসহযোগিতা করে এমন শীর্ষ ৫টি সরকারি প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে প্রশাসনের কর ও শুল্ক বিভাগ। সবার শীর্ষে রয়েছে থানা, দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে প্রশাসন (ভূমি রাজস্ব এবং নিবন্ধন অফিসসহ)। তৃতীয় অবস্থানে আইন ও বিচার এবং পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে হাসপাতাল।

২. দেশে আর্থিক দুর্নীতি বেড়ে গেছে! ২০০৩ সালের শেষ ৬ মাসে দেশে ২৫৩টি দুর্নীতির ঘটনায় ২১২ কোটি ৪৪ লাখ টাকা ক্ষতি হয়েছে। এ সময়ে দুর্নীতির ঘটনায় পুলিশ শীর্ষে থাকলেও আর্থিক দুর্নীতিতে শীর্ষে ছিল যোগাযোগ খাত। ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ২০০৪ সালের ৩১ আগস্ট এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ তথ্য প্রকাশ করে। ১ সেপ্টেম্বর দেশের একটি দৈনিকে উক্ত সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত প্রতিবেদনের নিম্নোক্ত বিবরণ প্রকাশ পায়। দেশের ২৩টি জাতীয় ও আঞ্চলিক দৈনিক পত্রিকায় ২০০৩ সালের জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রকাশিত রিপোর্টের ভিত্তিতে টিআইবি এ তথ্য প্রকাশ করে। এ তথ্য অনুসারে দেশে আর্থিক দুর্নীতির ঘটনা বাড়ছে। জনগণ দুর্নীতি দমনের আশায় রাজনৈতিক দলগুলোকে ভোট দিলেও দুর্ভাগ্যজনক ভাবে দুর্নীতি কমার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। সাংবাদিক সম্মেলনে জানানো হয়, ১৭টি জাতীয় ও ৬টি আঞ্চলিক পত্রিকায় ২০০৩ সালের শেষ ৬ মাসে ১ হাজার ৪৬টি রিপোর্টে ১ হাজার ১১৫টি দুর্নীতির ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে ৭৯২টিতে আর্থিক ক্ষতির সংশ্লিষ্টতা থাকলেও ২৫৩টি রিপোর্টে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ জানা গেছে। বাকি রিপোর্টগুলো থেকে ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করা যায়নি। তবে গড় হিসেবে ৭৯২টি রিপোর্টে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ৬৬৫ কোটি ৪ লাখ টাকা হতে পারে। টিআইবির রিপোর্টে আরও বলা হয়, ঘটনার দিক থেকে পুলিশ বরাবরের মতই সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টের মধ্যে ১৫ দশমিক ১৮ শতাংশ দুর্নীতির ঘটনা পুলিশ ঘটিয়েছে। শতকরা ১২টি ঘটনা নিয়ে স্থানীয় সরকার খাত দ্বিতীয় স্থানে, ১০ দশমিক ৪ ভাগ নিয়ে শিক্ষা খাত তৃতীয় স্থানে এবং ১০ দশমিক ১ ভাগ নিয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাত চতুর্থ স্থানে রয়েছে। আর্থিক দুর্নীতির দিক থেকে শীর্ষে রয়েছে যোগাযোগ খাত। মোট আর্থিক ক্ষতির ৩২ দশমিক ৮ শতাংশই এ খাতের দুর্নীতির মাধ্যমে হয়েছে। এছাড়া আর্থিক দুর্নীতিতে দ্বিতীয় স্থানে খাদ্য খাত (১৬ দশমিক ৬৩ শতাংশ)। এসব দুর্নীতিতে ক্ষতি হওয়া অর্থের ৪৭ ভাগের মালিক সরকার এবং ৪১ দশমিক ৯ ভাগের মালিক জনগণ। সরকারের ২৪ দশমিক ২ ভাগ উচ্চ পদস্থ ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এসব দুর্নীতিতে জড়িত ছিলেন। এছাড়া, ৫৪ দশমিক ৯ ভাগ দুর্নীতির ঘটনায় মেয়র ও ১ দশমিক ৪ ভাগ ঘটনায় এমপিরা জড়িত ছিলেন। সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে বলা হয়, মন্ত্রীরা বেশিরভাগই ক্ষমতার অপব্যবহারের দুর্নীতির

সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানদের বেশিরভাগ জড়িত ছিলেন আর্থিক দুর্নীতিতে। আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, জাতীয় বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতের জন্য বরাদ্দের বিস্তারিত তথ্য দেয়া হয় না। এ জন্য চেষ্টা করেও প্রতিরক্ষা ক্রয় সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। তাই টিআইবির প্রতিবেদনে প্রতিরক্ষা খাতের দুর্নীতি সম্পর্কে কোন তথ্য নেই। সম্মেলনে জানানো হয়, বার্লিন থেকে প্রতিবছর ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল প্রকাশিত বিশ্ব দুর্নীতি ধারণা রিপোর্টের সঙ্গে টিআইবি'র কোন সংযোগ নেই। ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল বিশ্বের ১৩টি গবেষণা সংস্থার তথ্যের ভিত্তিতে রিপোর্ট প্রকাশ করে। এক্ষেত্রে তারা টিআইবি থেকে কোন তথ্য নেয় না। অতএব, টিআইবি বা বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকার কারণেই যে বাংলাদেশ চতুর্থ বারের মতও বিশ্বের সেরা দুর্নীতিগ্রস্ত রাষ্ট্রের অবস্থানে, অর্থমন্ত্রী বা অন্য কোন মন্ত্রীর এ অভিযোগ সঠিক নয়।

৩. প্রতিবছর পণ্য আমদানী-রফতানির জন্য চট্টগ্রাম বন্দরে ৭৮৩ কোটি টাকা ঘুষ দিতে হয়! এর মধ্যে ৪৫১ কোটি টাকা কাস্টমস বিভাগ এবং ৩৩২ কোটি টাকা বন্দরের কর্মকর্তারা আদায় করেন। পণ্য আমদানি-রফতানির জন্য বন্দরের কমপক্ষে ৩৭ স্থানে ঘুষ দিতে হয়। ২০০৪ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম বন্দরের ওপর ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) আয়োজিত এক আলোচনা সভায় এ গবেষণা তথ্য প্রকাশ করা হয়। গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, মালয়েশিয়ার পেনাং বন্দরে একটি জাহাজ নোঙর করতে যেখানে মাত্র ৭টি ফরম পূরণ করতে হয় সেখানে এ কাজের জন্য চট্টগ্রাম বন্দরে পূরণ করতে হয় ৪২টি ফরম। ঘুষ, অনিয়ম এবং বিভিন্ন জটিলতার কারণে 'ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম ব্যুরো' চট্টগ্রাম বন্দরকে বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল এবং দ্বিতীয় ঝুঁকিপূর্ণ বন্দর হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বাংলাদেশের মোট আমদানি-রফতানির ৭৫ ভাগ হয় চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে। এই বন্দর দিয়ে পরিবাহিত পণ্যের মাধ্যমে অর্জিত হয় দেশের অর্থনীতির ৬০ ভাগ বৈদেশিক মুদ্রা।

ক. জায়গা অনুযায়ী ঘুষের হার বা পরিমাণ নির্ধারিত! প্রতি এক ইঞ্চি অতিরিক্ত ড্রাফটের জাহাজ বন্দর চ্যানেলে প্রবেশের জন্য পাইলটকে ঘুষ দিতে হয় ৫ থেকে ১০ হাজার টাকা। একটি আইজিএম কাস্টমস-এ সাবমিটের জন্য ঘুষের পরিমাণ কমপক্ষে ৫শ' টাকা। শতকরা

একশ' ভাগ আইজিএম কাস্টমস-এ পেশ করতেই ঘুষ লাগে। এক-একটি আইজিএম সংশোধন করতে প্রয়োজনীয় ঘুষের পরিমাণ গড়ে ৩ হাজার টাকা। এছাড়া, কাস্টমস-এ গ্যারান্টি সাবমিটের জন্য গড়ে ৬৪ টাকা, আইসিডিতে প্রতি টিইইউএস কন্টেইনার পাঠানোর অনুমতির জন্য কাস্টমস-এ ২ শ' টাকা, ইপিজেডে প্রতি টিইইউএস কন্টেইনার পাঠানোর অনুমতির জন্য ১ হাজার টাকা, কোন কন্টেইনার মংলা বন্দরে পাঠানোর অনুমতির জন্য কাস্টমস-এ ৪ হাজার টাকা, প্রতি টিইইউএস কন্টেইনারের পণ্য নিলাম করতে কাস্টমসকে ৩৩ হাজার ৪শ' টাকা এবং প্রতিটি জাহাজ বহির্নোঙর থেকে বন্দরে বার্থ করানোর জন্য ৫ হাজার ও বার্থ থেকে বহির্নোঙরে নেয়ার জন্য ৫ হাজার টাকা পাইলটকে ঘুষ দিতে হয়।

খ. **জাহাজে মাল তোলা ও জাহাজ থেকে খালাস করার জন্যও ঘুষের হার বা পরিমাণ নির্ধারিত!** যন্ত্রপাতি বুকিংয়ের জন্য বন্দরের মোবাইল টিমকে প্রতি শিফ্টের জন্য ৪শ' টাকা, সংশ্লিষ্ট শেডের সহকারী ট্রাফিক ইন্সপেক্টরকে প্রতি শিফ্টে ৪শ' টাকা, কন্টেইনার কনভেনশনাল টার্মিনাল ঘাটের জন্য প্রতি শিফ্টে ২শ' টাকা, আমদানি পণ্যের বেলায় প্রতি ইয়ার্ডের প্রতি শিফটে ২শ' টাকা, রফতানি পণ্যের বেলায় প্রতি ইয়ার্ডের প্রতি শিফ্টে ১শ' টাকা, বন্দরের ট্রেইলার অপারেটরকে প্রতি শিফ্টে দিনের বেলা ৮শ' টাকা ও রাতের বেলা ১১শ' টাকা , টালি ক্লার্কের প্রতি শিফটে ১১শ' টাকা, যন্ত্রপাতি ওয়ার্কশপের (২টি) জাহাজ প্রতি ১ হাজার টাকা, বন্দরে ৭ কর্মকর্তাকে প্রতি হাজারের জন্য ৪ হাজার ৫শ' টাকা, বন্দরের কম্পিউটার বিভাগকে প্রতি হাজারের জন্য ২শ' টাকা, যন্ত্রপাতি অপারেটরকে (ফর্ক লিফট বা অন্যান্য) প্রতি টিইইউএস কন্টেইনারের জন্য ১শ' টাকা, ওপেন টপ/ফ্ল্যাট রক কন্টেইনারের ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি অপারেটরকে প্রতি টিইইউএস কন্টেইনারের জন্য ৫শ' টাকা, বিশেষ ইমপোর্ট কন্টেইনারের ক্ষেত্রে প্রতি টিইইউএস কন্টেইনারের জন্য ৩শ' টাকা, প্রতি ডক শ্রমিককে (জাহাজ) শিফ্ট প্রতি ১৯০ টাকা, প্রতি ডক শ্রমিক (জেটি) শিফ্ট প্রতি ২শ' টাকা, বৃষ্টির সময় প্রতি শ্রমিককে অতিরিক্ত ১২০ টাকা এবং উইচম্যানকে প্রতি শিফটের সময় ৩৪০ টাকা।

গ. **এফসিএল কন্টেইনারে পণ্য বহন করার জন্য ঘুষও কম যায় না!** এ ক্ষেত্রে কাস্টমস ও বন্দর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের টন প্রতি ৩৪৫

টাকা, এফসিএল কন্টেইনারে আমদানি করা পণ্য রিলিজ করতে কাস্টমস ও বন্দর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের টন প্রতি ১ হাজার ৬১৩ টাকা, আমদানিকৃত পণ্য রিলিজ করতে কাস্টমস ও বন্দর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ৩৫৪ টাকা, হিমায়িত চিংড়ি রফতানি প্রতি হাজার কনসাইনমেন্টে ৫ হাজার ৪শ' টাকা, শাকসব্জি রফতানিতে টনপ্রতি ১ হাজার ৭২৫ টাকা এবং ২০ ফুট আকারের কন্টেইনার রফতানিতে ১ হাজার ৩৫০ টাকা ঘুষ দিতে হয়।

৪. **এবার একটি হয়রানির চিত্র দেখা যাক।** ২০০৪ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর একটি দৈনিকে প্রকাশিত চট্টগ্রাম বন্দরে 'হয়রানির একটি চিত্র' শীর্ষক এক প্রতিবেদনে বলা হয়, চট্টগ্রাম বন্দর ও কাস্টম হাউসে চলছে সীমাহীন দুর্নীতি, অনিয়ম, হয়রানি, স্বেচ্ছাচারিতা। এখানে আইন-কানুন, নিয়ম-নীতির কোন বালাই নেই। কাস্টমস কমিশনারসহ দুর্নীতিবাজ ও ক্ষমতাধর কর্তা ব্যক্তিদের ইচ্ছাই এখানে সব। ব্যবসায়ী-আমদানীকারকরা যা কিছুই আমদানি করুক না কেন, কাস্টমস কমিশনার ও তার সাঙ্গপাঙ্গকে সন্তুষ্ট করতে না পারলেই বাধে ঝামেলা। আমদানি নীতি, কাস্টমস অ্যাক্ট ও প্রচলিত আইনে যাই থাকুক, কাস্টমস কমিশনার ও বন্দরের কতিপয় কর্মকর্তার ইচ্ছাই সব কিছু। কোটি কোটি টাকা ব্যাংক ঋণে বিদেশ থেকে আমদানিকৃত পণ্য খালাস হল কি হল না, আমদানিকারকের লাখ লাখ টাকা গচ্চা গেল কি পণ্য নষ্ট হল, পণ্য খালাস করতে কয় মাস সময় লাগল—এসব কিছুই তাদের বিবেচ্য নয়। চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউসের কমিশনারের এরকমই একগুঁয়েমি, স্বেচ্ছাচারী, বেআইনী ও অবৈধ সিদ্ধান্তের শিকার হয়ে দাদা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৪০ লাখ টাকা গচ্ছা গেছে। নানা ঝক্কি-ঝামেলা, তদবির, অনুরোধ, দৌড়-ঝাঁপ এবং শেষ পর্যন্ত হাইকোর্টের আশ্রয় নিয়ে ৫ মাস পর মাল খালাস করতে সক্ষম হয় এ কোম্পানী। আমদানিকারককে দীর্ঘ ৫ মাস ধরে নানাভাবে হয়রানি, প্রায় অর্ধ কোটি টাকা গচ্ছা, আমদানিকৃত মেশিনের ক্ষয়ক্ষতি এবং পণ্য খালাস না করায় বিদেশী বিশেষজ্ঞকে বসিয়ে রাখার ক্ষতিপূরণ দিতে হলেও ঘটনার মূল হোতা কাস্টমস কমিশনারের টিকিটিও কেউ স্পর্শ করতে পারেনি। তাকে জবাবদিহিও করতে হয়নি কারও কাছে। এভাবে অসংখ্য আমদানিকারককে হয়রানি করা হলেও বরাবরের মতো ধরা-ছোঁয়ার বাইরেই থেকে যাচ্ছে মূল অপরাধী।

৫. মৌলিক নাগরিক সেবায় দুর্নীতি 'ওপেন সিক্রেট'।

পুলিশ, আয়কর ও ভূমি-রাজস্ব বিভাগ এবং সিটি কর্পোরেশনের দুর্নীতি আর হয়রানি একেবারেই 'ওপেন সিক্রেট'। ঘুষ বাদে ওসব অফিসে কোন কাজের সূচনাই অসম্ভব। বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন এবং ওয়াসার মত দৈনন্দিন সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানগুলোর 'বিলিং' হয়রানি অসহনীয়। গ্রাহকদের মধ্যে বকেয়া বিল সংক্রান্ত 'প্রত্যয়নপত্র' বিতরণের নতুন প্রথা চালুর সুবাদে তা' আরও তীব্রতর হয়ে উঠেছে। দেখা যায়, বিগত পাঁচ/সাত/দশ বছর সময়কার ১০/১২ মাস বা ততোধিক মাসের বিল পরিশোধ করা হয়নি মর্মে কর্তৃপক্ষের 'প্রত্যয়নপত্র' পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট প্রায় সব গ্রাহকই তা' সঠিক নয় বলে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়। এ 'প্রমাণ করার' হয়রানি বহন করার ক্ষমতা যাদের নেই তারা হয়রানি থেকে মুক্তি লাভের জন্য 'অফ দ্যা রেকর্ড' সংশ্লিষ্ট লাইনম্যান ও অফিস স্টাফ বা কর্মকর্তার সঙ্গে অবৈধ আর্থিক লেনদেন করতে বাধ্য হয়। ওয়াসার অনেক লাইনম্যান 'মিটার রিডিং' না করে অফিসে বসেই বিল তৈরী করায়। এতেও গ্রাহক হয়রানী প্রায় একই রকম। ওয়াসার বিদ্যমান মিটার সংকট কারও অজানা নয়। বর্তমানে পানির কোন মিটার সরবরাহে ওয়াসা সক্ষম নয়, অথচ মিটার সরবরাহের নামে নিরীহ গ্রাহকদের তা' দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে লাইনম্যানরা মোটা অংকের অর্থ নিয়ে চম্পট মারে। অফিসে খোঁজ নিতে গেলে মিটার আমদানীতে বিলম্বের কথা বলা হয়। 'ডিফেকটিভ' বা ক্ষতিগ্রস্ত মিটার পরিবর্তন করে দিতে গ্রাহকের দাবির উত্তরে একই অজুহাতের পাশাপাশি চার/পাঁচ হাজার টাকার বিনিময়ে লাইনম্যানরা সেকেন্ড হ্যাণ্ড মিটার দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে চোরাই মিটার সরবরাহ করে। মাসের পর মাস পানি সরবরাহ দিতে না পারলেও ওয়াসার বিলে গ্রাহক কর্তৃক লক্ষ লক্ষ ইউনিট পানি ব্যবহারের রেকর্ড পাওয়া যায়। ফলে, নিরুপায় হয়ে গ্রাহকদের 'মিটার রিডিং' সংশোধনে আবার 'ঝাপিয়ে' পড়তে হয় এবং অনেক হয়রানি উৎরিয়ে তাতে 'সক্ষমরা' সফল হলেও নিরীহরা ব্যর্থ হয়। নাগরিক জীবনের মৌলিক সুবিধাদির ক্ষেত্রে নগরবাসীর এহেন অসহনীয় অবস্থার অবসান কবে হবে—নগরবাসীর এ উৎকণ্ঠার প্রশমন কবে ঘটবে?

৬. ডাক বিভাগ দুর্নীতি ও অনিয়মের আখড়ায় পরিণত!

২০০৪ সালের নভেম্বর একটি দৈনিকে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে

বলা হয়, ডাক বিভাগ এখন চরম অনিয়ম, বিশৃংখলা, স্বেচ্ছাচারিতা ও দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। বছরের পর বছর শক্তিশালী একটি দুর্নীতিবাজ চক্র কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ, স্ট্যাম্প ও ট্যাক্স টোকেন জালিয়াতি এবং মোটরযান করের টাকা লুটপাটসহ নানাবিধ অপকর্ম চালিয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত কারও শাস্তি বা কারও বিরুদ্ধে কোন মামলা হয়নি। তদন্তে দুর্নীতি প্রমাণের পর নামকাওয়াস্তে বদলি এবং আত্মসাৎকৃত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দিয়েই পার পেয়ে গেছে জালিয়াত চক্রের হোমরা-চোমরা কর্মকর্তা ও ইউনিয়ন নেতারা। শুধু তাই নয়, কর্মচারী ইউনিয়নের সহযোগিতায় মহাশক্তিধর জালিয়াত ও দুর্নীতিবাজ চক্রটি কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের রক্ষা এবং সৎ, যোগ্য ও দুর্নীতি তদন্ত কমিটির সক্রিয় সদস্যদের বদলির জন্য হয়ে পড়ে তৎপর। কর্মচারী ইউনিয়নের যেসব নেতা টাকা আত্মসাৎ, দুর্নীতি ও নানাবিধ অপকর্মের সঙ্গে সরাসরি জড়িত তারাই তথাকথিত আন্দোলনের নামে জিপিওসহ গোটা ডাক বিভাগে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির পায়তারায় হয় লিপ্ত। ফলে, ডাক বিভাগের সৎ, যোগ্য, দক্ষ ও সাহসী কর্মকর্তাদের ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় নানা হুমকি-ধমকির মুখে দায়িত্ব পালন করতে হয়।

দীর্ঘদিন ধরেই ডাক বিভাগের বিভিন্ন অফিসে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ, ট্যাক্স টোকেন ও স্ট্যাম্প জালিয়াতি, মোটরযান কারের টাকা লুটপাট এবং নানাবিধ অনিয়ম ও দুর্নীতি চলে আসছে। ঢাকা সিটি উত্তর ডেপুটি পোস্ট মাস্টার জেনারেল (ডিপিএমজি) অফিসে ৭ কোটি টাকা আত্মসাৎসহ ব্যাপক দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়ার পরও দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিপিএমজিকে বদলি করে আত্মসাৎকৃত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। ঢাকা সিটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই উত্তর ডিপিএমজি অফিসে চট্টগ্রাম থেকে মাত্র ৭ মাস আগে বদলি করে আনা হয় সৎ, যোগ্য ও দক্ষ একজন প্রশাসককে। তাঁকে তদন্ত কমিটির প্রধান করে দায়িত্ব দেয়া হয় প্রায় ১০ কোটি টাকা আত্মসাতের ঘটনা উদ্‌ঘাটনের জন্য। তিনি তদন্ত করে একের পর এক দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চিহ্নিত করার পর থেকেই ইউনিয়ন তার ওপর ক্ষিপ্ত হতে থাকে। জিপিওর জনৈক ফ্রাঙ্কিং মেশিন অপারেটরকে ৫০ হাজার টাকা জালিয়াতির দায়ে বান্দরবানে বদলি করা হলেও মাত্র ৪ মাসের মাথায় ইউনিয়নের তদবিরে আবার তাকে ঢাকা সিটি

উত্তরে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। মিরপুর বিআরটিএ পোস্ট অফিসে দুর্নীতির দায়ে সিনিয়র পোস্ট মাস্টারকে বদলি করে গত জুলাই মাসে অন্য একজন সৎ ব্যক্তিকে তার স্থলাভিষিক্ত করার পর থেকে শুধু ২০০৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসেই আয় বেড়েছে ৭০ লাখ টাকা। তদন্তে দেখা যায়, কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক গুলশান সাব-পোস্ট অফিসে সুপারভাইজার থাকার সময় ৯৯ হাজার টাকা আত্মসাৎ করে। তাকে কোন শাস্তি না দিয়ে ঢাকার নিউমার্কেট পোস্ট অফিসে বদলি করে আত্মাসৎকৃত টাকা কোষাগারে জমা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। মিরপুর সাব-পোস্ট অফিসের পোস্ট মাস্টার ইউনিয়ন নেতার বিরুদ্ধে ২৫ হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগ প্রমাণের পর তাকেও কোন প্রকার শাস্তি না দিয়ে বদলি করা হয়। ঢাকা সিটি উত্তরের জনৈক ইউনিয়ন নেতা বিআরটিএ অফিসে প্যাকার থাকার সময় ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা আত্মসাৎ করে। তাকে কোন শাস্তি না দিয়ে নারায়ণগঞ্জে বদলি করা হয় এবং আত্মসাৎকৃত টাকা কোষাগারে জমা দেয়ার জন্য বলা হয়। প্রশ্ন হচ্ছে, সেবাধর্মী এ বিভাগটিও দুর্নীতির আখড়ায় একদিনে পরিণত হয়েছে কি?

৭. প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগেও দুর্নীতি! ২০০৪ সালের ১৬ জুন প্রকাশিত বিভিন্ন দৈনিকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে যে টাকার খেলা চলে আসছে এখন তা 'ওপেন সিক্রেট'। সঙ্গোপনে চলে এ 'টাকার খেলা'। মৌখিক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পাইয়ে দিয়ে চাকুরিপ্রাপ্তি নিশ্চিত করার কথা বলে গ্রামের বেকার তরুণ-তরুণীদের অভিভাবকদের কাছ থেকে টাকা নেয়া হয় বলে অভিযোগ পাওয়া যায় দেশের সব জেলা থেকে। চাকুরি প্রার্থীর বেশীরভাগই মেয়ে। অনেক অভিভাবকই এক-দেড় লাখ টাকা ঘুষ নিয়ে ছোটাছুটি করেন। এ টাকার ভাগ পাচ্ছে কতিপয় অর্থলোভী প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সরকারদলীয় নেতৃবৃন্দ। মৌখিক পরীক্ষার নম্বর ২০ থেকে বাড়িয়ে ৩০ করায় আর্থিক লেনদেনের সুযোগ বেড়েছে। ২০০৪ সালের অক্টোবর শেষে অথবা নভেম্বর মাসের শুরুর দিকে এ নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হওয়ার কথা। ফল প্রকাশের আগ পর্যন্ত তদবির ও টাকার খেলা চলতে থাকে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে প্রাথমিক স্কুলের

সহকারী শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। ২০০৩ সালের ১৭ অক্টোবর অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষায় সারাদেশ থেকে ৩ লাখ ২৬ হাজার পরীক্ষার্থী অংশ নেয়। শূন্য পদ ছিল ৩ হাজার ৭০০টি। রাজশাহী অঞ্চলের প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ায় ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আবার ওই অঞ্চলের পরীক্ষা নেয়া হয়। ইতোমধ্যে পদসংখ্যা বৃদ্ধি করে ৪ হাজার ১৭টিতে উন্নীত করা হয়। লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয় ২০০৪ সালের এপ্রিল মাসে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফ্তর ফল ঘোষণার পর ৩১ মে'র মধ্যে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল পাঠানোর জন্য জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রতি নির্দেশ দেয়। চার সহস্রাধিক পদে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় ৬৩ হাজার ৫৩৯ জন পরীক্ষার্থী। অধিকাংশ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে একটি করে পদের বিপরীতে শতাধিক পরীক্ষার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ব্যাপক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও মৌখিক পরীক্ষায় অধিক নম্বর থাকার সুযোগে সরকারীদলীয় কিছু নেতা এবং জেলা প্রশাসন ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের কতিপয় দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারী চাকুরি পাইয়ে দেয়ার প্রলোভন দেখিয়ে প্রার্থীদের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়। জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে গঠিত মৌখিক পরীক্ষা বোর্ডে সদস্য সচিব হিসেবে থাকেন প্রাথমিক জেলা শিক্ষা অফিসার। এছাড়া, জেলা প্রশাসকের প্রস্তাব অনুযায়ী একজন সচিব প্রতিনিধি ও একজন মহাপরিচালকের প্রতিনিধি থাকেন। কলেজের অধ্যাপক বা বিদ্যোৎসাহীদের মধ্য থেকে এ সদস্যদের মনোনীত করার কথা থাকলেও তাদের বাইরে থেকেও সদস্য মনোনয়নের সুযোগ রয়েছে। এ সুযোগে অনেক সরকারদলীয় রাজনীতিবিদ সদস্যপদ অর্জন করে সরাসরি আর্থিক দুর্নীতি করছেন এবং রাজনৈতিক প্রভাব খাটাচ্ছেন।

২০০৪ সালের ৮ সেপ্টেম্বরের একটি দৈনিকে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দেশের ১ হাজার ৪৬৪টি মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা ভূয়া এমপিওভূক্ত দেখিয়ে ওসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীর নামে অবৈধভাবে আত্মসাৎ করা হয়েছে ৩০ কোটি ৪৭ লাখ ৯২ হাজার টাকা। এভাবে শিক্ষা বিভাগের অসংখ্য প্রকল্পের নামে রয়েছে ভূরি ভূরি দুর্নীতি, অনিয়ম ও আত্মসাতের অভিযোগ।

৮. স্বাস্থ্য বিভাগে দুর্নীতি!! সরকারী হাসপাতালে সাড়ে পাঁচশ' পদে নিয়োগ ঃ কর্মচারী পদের দাম উঠেছে লাখ টাকা, সঙ্গে চাই তদ্‌বির।

২০০৪ সালের ৪ অক্টোবর বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশের তিনটি সরকারি হাসপাতালে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাড়ে ৫শ' পদে নিয়োগ নিয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদফতর, স্থানীয় মন্ত্রী, মেয়র, এমপি, সরকারদলীয় রাজনৈতিক নেতা, হাসপাতালের কর্মচারী নেতৃবৃন্দ রীতিমতো তদ্‌বির যুদ্ধে নেমেছেন। অভিযোগ উঠেছে, ঢাকা, বরিশাল ও রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এ নিয়োগ নিয়ে চলছে কোটি টাকার বাণিজ্য। পরীক্ষার নামে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কর্তৃপক্ষ প্রহসন করে। সংশ্লিষ্টরা সবাই পছন্দের লোকজনকে নিয়োগ দিতে সর্বোচ্চ গ্রুপিং-লবিং করে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইতোমধ্যে সমঝোতা করে লোক নিয়োগের চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত করা হয়। বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সমঝোতা না হওয়ায় নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। দুর্নীতির প্রতিবাদে চলে অবস্থান ধর্মঘট, কর্মবিরতি, কালোব্যাজ ধারণসহ নানা কর্মসূচী। রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এক মিনিটেরও কম সময়ে পরীক্ষা নেয়ার নজির সৃষ্টি হয়। রোগীদের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় শূন্য পদে দ্রুত লোক নিয়োগের উদ্যোগ নেয়। কিন্তু সে উদ্যোগ দুর্নীতির কারণে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। সংশ্লিষ্টরা চাকুরি পাইয়ে দেয়ার নাম করে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী পদে সর্বনিম্ন এক লাখ ও সর্বোচ্চ দেড় লাখ এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগে সর্বনিম্ন ৬০ হাজার থেকে ১ লাখ টাকা ঘুষ নেয়।

দেশের ১২টি সিভিল সার্জন অফিসে প্রায় ৫ কোটি টাকার দুর্নীতি! ২০০৪ সালের ১৮ অক্টোবর একটি দৈনিকে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, দেশের ১২টি সিভিল সার্জন অফিসে ৪ কোটি ৬২ লাখ টাকার বেশি অঙ্কের দুর্নীতি ও অনিয়ম ধরা পড়ে। সরকারি হিসাব সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটি ১৭ অক্টোবর স্থায়ী কমিটির সভায় তদন্ত রিপোর্ট উপস্থাপনকালে এ তথ্য দেয়। কমিটি এ দুর্নীতিকে 'সাগর চুরি' হিসেবে আখ্যায়িত করে বলে, দুর্নীতির বিস্তৃতি বিগত সরকারের আমলে সংশ্লিষ্ট সিভিল সার্জন অফিস থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদফতর, জেলা হিসাব কর্মকর্তার কার্যালয়, জেলা সিভিল সার্জন অফিসের অডিটর, সংশ্লিষ্ট অফিসের দরপত্র কমিটি, ক্রয় কমিটি ও মূল্যায়ন কমিটির

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এসব কমিটিতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধিও দুর্নীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন যুগ্ম-সচিবকে এ দুর্নীতির মূল হোতা হিসেবে চিহ্নিত করেছে কমিটি। তদন্ত কমিটি ১২টি জেলার সিভিল সার্জন অফিসে ১৯৯৫-৯৮ সালে এমএসআর খাতে ব্যয়িত অর্থের ওপর ৯টি অডিট আপত্তি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মোট ১০৯ কোটি টাকা দুর্নীতির মধ্যে প্রাথমিক ভাবে ৪ কোটি ৬২ লাখ টাকার ওপরে দুর্নীতি চিহ্নিত করে। তদন্ত কমিটি স্থায়ী কমিটির সভায় ওই রিপোর্ট উপস্থাপন করে এবং বাকি অভিযোগগুলোও রয়েছে তদন্তাধীন। শেরপুর, জামালপুর, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, যশোর, বাগেরহাট, সুনামগঞ্জ, রাজশাহী, নওগাঁ, নবাগঞ্জ, চট্টগ্রাম এবং ভোলা জেলায় ১৯৯৫-৯৮ সময়ের মধ্যে মোট ৩৩ জন সিভিল সার্জন এই দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। তাদের মধ্যে ১২ জন অবসরপ্রাপ্ত, ৬ জন সাময়িক বরখাস্ত এবং দু'জন মৃত্যু বরণ করেছেন। সিভিল সার্জন ছাড়াও ৯০ জন নিরীক্ষা কর্মকর্তা ও কর্মচারী, ৭২ জন ক্রয় কমিটির সদস্য, ৩৩ জন মূল্যায়ন কমিটির সদস্য, ৫ জন স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক (অর্থ) এবং ১৫ জন জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা এই দুর্নীতির সঙ্গে সরাসরি বা অন্যভাবে জড়িত ছিলেন। দুর্নীতির প্রকৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটির সভাপতি বলেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন দ্রব্য ক্রয় না করে এতবড় অংকের অর্থ লুটপাট করা হয়েছে। আবার যেসব দ্রব্য কেনা হয়েছে তার মূল্য বাজার দরের চেয়ে ৫০ থেকে ১০০ গুণ বেশী।

৯. **সংসদ সচিবালয়ের দুর্নীতি নিয়ে হুইপরা উদ্বিগ্ন এবং স্পীকারের সহযোগিতা কামনা!** ২০০৪ সালের ২১ মে প্রকাশিত একটি দৈনিকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, স্পীকারের সঙ্গে এক 'এক্সক্লুসিভ মিটিং'য়ে হুইপরা সংসদ সচিবালয়ে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা বহুমুখী দুর্নীতি'র ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তারা বলেছেন, পরিস্থিতির ক্রমাগত অবনতি ঘটছে। একটি শক্তিশালী চক্র এর সঙ্গে জড়িত। এখনই চলমান এ দুর্নীতি বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। জবাবে স্পীকার সংসদ সচিবালয়ের দুর্নীতি বন্ধে হুইপদের সহযোগিতা কামনা করেন এবং বলেন, দুর্নীতির সঙ্গে যে-ই জড়িত থাক না কেন কাউকেই ছাড় দেয়া হবে না। হুইপদের তিনি সুনির্দিষ্ট ভাবে দুর্নীতির কোন ঘটনা থাকলে তা জানানোর

অনুরোধ করেন। দুর্নীতি প্রসঙ্গে আলোচনাকালে হুইপরা জানান, মূলতঃ সংসদের বিভিন্ন কেনাকাটায়ই দুর্নীতির ঘটনা ঘটে থাকে। ভিআইপিদের নামে পর্দা, ফার্নিচার, ক্রোকারিজসহ নানাবিধ ক্রয়ের ক্ষেত্রেই বেশিরভাগ দুর্নীতি হয়ে থাকে। একজন হুইপ বৈঠকে বলেন, সংসদে দুর্নীতির জন্য একটি সিন্ডিকেট (চক্র) গড়ে উঠেছে। বছরের পর বছর তারা নির্বিঘ্নে একের পর এক ঘটনা ঘটিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, ক্রয় না করেই কাগজে-কলমে ক্রয় দেখিয়ে, একটি জিনিস ক্রয় করে ১০টি জিনিস ক্রয় দেখিয়ে, ভুয়া বিল-ভাউচারে ক্রয় দেখিয়ে এবং বিদেশী ডেলিগেশনের আসা-যাওয়ার প্রাক্কালে 'গিফট ক্রয়' খাতেও দুর্নীতি করা হয়। বৈঠকে অন্য হুইপরাও দুর্নীতির ওপর আলোচনায় অংশ নেন। তাঁরাও, এর আগে তাঁদের নজরে এসেছে এমন দু'একটি তথ্য স্পীকারের নজরে আনেন। সংসদ সচিবদের দেয়া '৩৭০টি টি-সেট' ক্রয়ের তথ্যটি শুনে তো হুইপরা একেবারে হতবাক। এতগুলো টি-সেট কেনা হল অথচ তারা কেউই একটিও পাননি, এটা কি করে হতে পারে!

প্রশ্ন হচ্ছে, দুর্নীতির কালো হাত কোথায় প্রসারিত হয়নি? সর্বত্রই দুর্নীতি? তা' হলে তো দুর্নীতিই এখন বাংলাদেশের নীতি! তাইতো, বিশ্বের ১৪৬টি দেশের ওপর ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল এর জরীপেও দুর্নীতিতে বাংলাদেশ এবার সহ চতুর্থ বারের মত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এ রিপোর্টে দেশবাসী বিচলিত—উদ্বিগ্ন। এ সীমাহীন দুর্নীতির কারণে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগেও ভাটা পড়ে গেছে। অতএব, এর বিরুদ্ধে সরকারী জিহাদ অত্যাবশ্যক এবং তা' জরুরী। প্রশ্ন হচ্ছে, এ জিহাদে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য যে নৈতিক শক্তির প্রয়োজন, তা' কি সরকারের মধ্যে আছে? ঘুষ, দুর্নীতি ও ঘন ঘন সরকারী নীতিমালা পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে মার্কিন বিনিয়োগ কমে গেছে। দেশের গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্র বন্দর চট্টগ্রাম বন্দরে ঘুষ ও দুর্নীতি বেড়ে গেছে, যা' আমেরিকা সহ বহির্বিশ্বে অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য বৃদ্ধিতে আরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। ২০০৪ সালের ৯ নভেম্বর ঢাকায় বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক মার্কিন উপ-সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী টারকেল এল পেটারসন এসব কথাগুলো অত্যন্ত বিরক্তির সাথে বলেন। এরকম দাতা-বন্ধুদের এ ধরণের উক্তি বা মন্তব্যে দেশের একজন অতি সাধারণ নাগরিকও লজ্জা ও দুঃখ পায়। কিন্তু দেশের অসাধারণ নাগরিক তথা জাতীয় ও রাষ্ট্রীয়

নেতৃবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ওরকম দুঃখ ও লজ্জা হয় কি? যদি হতো তবে পরিস্থিতির উন্নতি অনেক আগে থেকেই লক্ষ্য করা যেতো। যে দেশটি হতোদ্যোহ দুর্নীতিতে হ্যাটট্রিককেও ছাড়িয়ে গেছে, যে দেশটির ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলোকে মোট বিক্রির তিন ভাগ উৎকোচ দিতে হয় এবং যে দেশে মাত্র ছয় মাসে বিভিন্ন খাতে ২২৫ কোটি টাকার দুর্নীতির ঘটনা ধরা পড়ে সে দেশটির কর্ণধারদের এসব সমস্যা ও তা' নিরসনের উপায়-উপদেশ মুখ বুজেই শুনে থাকতে হয়। দেশের রাজনীতিতে যতদিন 'জোর যার রাজ্য তার' এবং 'সরকার যাদের রাজ্য তাদের' নীতি অনুসৃত হবে ততদিন সংশ্লিষ্টদের কাছে জাতীয় স্বার্থ প্রাধান্য পেতে পারে না। সাবাসের অন্যতম শর্ত ও সরকারী দলের অন্যতম নির্বাচনী অঙ্গীকার পূরণকল্পে ২০০৪ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারী জাতীয় সংসদে স্বাধীন দুর্নীতি কমিশন গঠনের আইন পাশের নয় মাস পর ২১ নভেম্বর, ২০০৪ তার গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। অভিজ্ঞ মহলের মতে এ বিলম্বের জন্য স্বার্থান্বেষী আমলারাও দায়ী, যাদের কারণে দুর্নীতি দমন ব্যুরো তার বিগত ৪৭ বছরের জীবনে দুর্নীতির মোকাবেলায় কোন ব্যবস্থা নিতে পারেনি বলে সর্বত্রই দুর্নীতির বিস্তৃতি ঘটে এবং তা' এমন আগ্রাসী হয়ে উঠে যে, দুর্নীতির ভয়ে দেশের একজন স্বাধীন নাগরিককে কোন সরকারী অফিসে কোন কাজে ঢোকার আগে 'সোয়া ইউনুস' পড়েই ঢুকতে হয়। আর যাদের তাতে ঢোকার ক্ষমতা নেই তারা যাদের মাধ্যমে ঢোকে তারাও (অধিকাংশ) বড় দুর্নীতিবাজ। ২০০৪ সালের ২১ নভেম্বর স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন সংক্রান্ত সরকারী প্রজ্ঞাপন জারীর সঙ্গে সঙ্গে দুর্নীতি দমন ব্যুরোর কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে বিলুপ্ত হয় এবং ২৩ নভেম্বর থেকে কমিশন কাজ শুরু করে। স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি সুলতান হোসেন খান একই দিন এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, দুর্নীতি সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে গেছে। একদিনে এ দুর্নীতি দমন করা সম্ভব নয়। এজন্য সময়ের প্রয়োজন; প্রয়োজন সবার সহযোগিতা। সমাজ থেকে দুর্নীতি দূর করতে না পারলে সব অর্জন বৃথা যাবে। দেশবাসী এ মহান লক্ষ্য অর্জনে কার্যক্ষেত্রে এ কমিশনের নির্বিঘ্ন ও সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রত্যাশী।

ছয়

গণবিমুখ শিক্ষানীতি এবং বৈষম্যময় শিক্ষা পদ্ধতি দক্ষ জাতি গঠনে প্রতিবন্ধক

মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র প্রথম বাণীই ছিলো 'ইক্‌রা'। অর্থ হল— 'পড়'। মহানবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এর মাধ্যমে বিশ্ব মানবতার উদ্দেশে আল্লাহ্ এ বাণী পাঠিয়েছিলেন। মহানবীও তাঁর বাণীতে বলেছিলেন, জ্ঞানার্জনের জন্য বিদ্যার্জন প্রত্যেক নর-নারীর জন্য ফরজ। অতএব, শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব অপরিসীম। সুশিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের মাধ্যমেই মানুষের জীবনে পরিপূর্ণতা অর্জিত হতে পারে এবং যোগ্যতা, দক্ষতা ও মানবিক গুণাবলীতে যথাযথ আলোকিত ও বিকশিত হতে পারে। একটি জাতির জন্যও এ সত্যি পুরোপুরি প্রযোজ্য। ব্যক্তি, ব্যষ্টি, সমষ্টিতে সুশিক্ষা ও জ্ঞানের সার্বিক বিস্তৃতি ঘটলেই কেবল একটি জাতি আলোকিত, উন্নত ও সমৃদ্ধ হতে পারে। বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম দরিদ্রতম দেশ। এ দেশটি শাসনে প্রথম যারা দায়িত্ব পেয়েছিলেন তাঁদের প্রণীত জাতীয় শিক্ষা-নীতি ও পরিকল্পনার বাস্তবায়ন যেমন সম্ভব হয়নি তেমনি তার পদ্ধতিগত জটিলতাও দূর করা যায়নি। নূতন জাতি গড়ার শুরুতে শিক্ষার মত জীবনের-ভিত্তি রচনার পরিকল্পনা-পদ্ধতিতে যদি কোন বৈষম্য না থাকতো তা' হলে তাতে হয়ত কোন জটিলতারই জন্ম হতো না। কালক্রমে নূতন নূতন সরকারের হাতে নূতন নূতন শিক্ষানীতি তৈরীর জন্য গঠিত নূতন নূতন জাতীয় শিক্ষা কমিশনগুলোর রিপোর্টে জনস্বার্থ প্রাধান্য পায়নি, সাংবিধানিক বিধি-ব্যবস্থা যথাযথ প্রতিফলিত হয়নি এবং তার বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট জাতীয় নেতৃত্বের প্রয়োজনীয় মনোযোগও পাওয়া যায়নি। দলীয় আদর্শিক মেজাজে এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রণীত শিক্ষানীতি-পরিকল্পনা এবং তার রূপায়নে বিশাল বিশাল শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যমান দুর্বলতার কারণে দেশের বিদ্যালয় বয়সী সব শিশুর একই পদ্ধতিতে অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগও সৃষ্টি হয়নি। শিক্ষা দানে যেমন গ্রহণেও তেমন বৈষম্য থেকে গেছে। মৌলিক শিক্ষা হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষা মানুষের জীবন বিকাশের ভিত্তি। কিন্তু এ শিক্ষাটা দানে এবং গ্রহণেও ভিন্ন ভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা বিদ্যমান। যেমন, সরকারী ও বেসরকারী রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়, স্যাটেলাইট প্রাথমিক

বিদ্যালয়, ইব্‌তেদায়ী মাদ্রাসা, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ইত্যাদি। এসব ভিন্ন ভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থায় যেমন প্রাথমিক শিক্ষা দাতাদের বেতন-ভাতা ও যোগ্যতা-দক্ষতায় বিদ্যালয় ভেদে আকাশ-পাতাল বৈষম্য বিদ্যমান, তেমনি শিশুদের শিক্ষা গ্রহণেও অনুরূপ বৈষম্য বিরাজমান। অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষা পদ্ধতি ও ব্যবস্থা এক ও অভিন্ন না হওয়ায় শিক্ষা-মানও এক ও অভিন্ন হতে পারেনি। ফলে, শিশুরা একই পদ্ধতিবঞ্চিত প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে নানা মানের শিক্ষা পায়। তবে নিম্ন মানের শিক্ষার পাল্লাটাই ভারী, যা' দিয়ে জাতির জন্য উন্নত ভবিষ্যত রচনায় দক্ষ নাগরিক গড়া সম্ভব নয়। এ কারণেই এ যাবৎ তা' হয়েও ওঠেনি। অথচ, এ ব্যাপক অশিক্ষা, অজ্ঞানতা ও অদক্ষতার বোঝা নিয়েই জাতীয় নেতা-শাসনকর্তারা 'সোনার বাংলা'-'নতুন বাংলা' আর উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখে চলেছেন! ধর্ম শিক্ষার জন্য আলাদা ব্যবস্থা ও শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের বিদ্যালয় বয়সী সব শিশুর জন্য একই পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থার সাংবিধানিক অঙ্গীকারকে যেমন অস্বীকার করা হয়েছে তেমনি একই মায়ের বা একই সমাজের দু' সন্তানকে দু' জাতের মানুষ তৈরী করে জাতিকে দু' ভাগে বিভক্ত করার প্রক্রিয়ার আনুষ্ঠানিক রূপ দেয়া হয়েছে। শিক্ষার সর্বস্তরে অর্থ-বরাদ্দেও বৈষম্য বিদ্যমান। গ্রামের শিক্ষার জন্য বরাদ্দ আর শহরের শিক্ষার জন্য বরাদ্দের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য বেদনাদায়ক ও হতাশাব্যঞ্জক। একটি স্বাধীন দেশের গ্রাম ও শহরের নাগরিক অধিকারে এহেন ব্যবধান থাকতে পারে না। শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারি অর্থ বরাদ্দে বা দৃষ্টিভঙ্গিতে কোন বৈষম্য মানব উন্নয়নে সুষমতা অর্জনের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক। এসব বৈষম্যের কারণেই দেশে নিরক্ষরতার হার ও নিরক্ষরের সংখ্যা বৃদ্ধির গতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না। স্বাধীনতার তেত্রিশ বছরে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বাড়লেও প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে নিরক্ষরতার হার এখনও লজ্জাজনক-হতাশাব্যঞ্জক। প্রকারান্তরে দেশের কোটি কোটি মানুষকে তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। গরীব সাধারণ বলে জীবনকে দেখার বা উপলব্ধি করার এবং ভোটার হিসেবে স্বাধীন ভাবে সিদ্ধান্ত নেয়ার জ্ঞান ও ক্ষমতাটুকু অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক ও ব্যবহারিক শিক্ষা থেকে তাদের বঞ্চিত রাখা হয়েছে। ২০০৪ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসে একটি দৈনিকে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশে প্রাপ্ত বয়স্ক নিরক্ষর লোকের সংখ্যা চার কোটি ৬০ লাখ। এই বিপুল

সংখ্যক মানুষ লিখতে, পড়তে ও হিসাব কষতে জানে না। নিরক্ষরতা দূরীকরণের বিভিন্ন কর্মসূচীও বন্ধ হয়ে গেছে। দুর্নীতির কারণে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং 'সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী'সহ বেশ কয়েকটি প্রকল্প। অতএব, আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা ছাড়া সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির জন্য সরকারী ভাবে তেমন কোন বিশেষ উদ্যোগ এখন আর নেই। তাছাড়া, সাক্ষরতার হার নিয়েও রয়েছে নানা বিভ্রান্তি। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, পরিসংখ্যান ব্যুরো, আদমশুমারি, বিশ্বব্যাংক, ইউনিসেফ, ইউনেস্কো, শিক্ষা বিষয়ক এনজিওদের সম্মিলিত প্রতিষ্ঠান—গণসাক্ষরতা অভিযান সহ বিভিন্ন সংস্থার তথ্য বিভিন্ন রকম। তাদের তথ্য অনুযায়ী ৪১ দশমিক ৪ শতাংশ থেকে ৬৫ দশমিক ৫ শতাংশ পর্যন্ত রয়েছে দেশে বয়স্ক সাক্ষরতার হার। এই তথ্যের সঠিকতা বা বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে নানা প্রশ্ন এবং অভিমত থাকলেও এ নিয়ে কারও কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। উদ্যোগ নেই সরকারি, বেসরকারি ও দাতা সংস্থার সম্মিলিত জরিপ চালানোর ব্যাপারে এবং তার মাধ্যমে প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটনেরও। এ অবস্থার মধ্যেই ২০০৪ সালের ৮ সেপ্টেম্বর (শুধু সরকারী পর্যায়ে) উদ্‌যাপিত হলো আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস।

সাক্ষরতার হার নিয়ে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং সংস্থার মধ্যেই রয়েছে বড় রকমের বিভ্রান্তি ও টানাপোড়েন। সরকারের মন্ত্রণালয় ও সংস্থার মধ্যে তথ্যেরও কোন মিল নেই। ২০০২ সালের জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে সরকারী ভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল, দেশের বয়স্ক সাক্ষরতার হার ৬৫ দশমিক ৫ শতাংশ। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হিসাব মতে, দেশের সাক্ষরতার হার ৬২ শতাংশ। ২০০১ সালে সরকারিভাবে পরিচালিত আদমশুমারির তথ্য অনুযায়ী সক্ষরতার হার ৬০ দশমিক ৫ শতাংশ। পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাবে সাক্ষরতার হার ৪৭ দশমিক ৫ শতাংশ। বিশ্ব ব্যাংক সহ কয়েকটি দাতা সংস্থার হিসাব অনুযায়ী দেশের সাক্ষরতার হার ৫০ শতাংশের বেশি নয়। ইউনিসেফ এবং ইউনেস্কোও বিশ্ব ব্যাংকের এই হিসাবের সঙ্গে একমত। আবার শিক্ষা বিষয়ক এনজিওদের সম্মিলিত প্রতিষ্ঠান 'গণসাক্ষরতা অভিযানের' জরিপ মতে দেশের সাক্ষরতার হার ৪১ দশমিক ৪ শতাংশ। এই ৬৫.৫, ৬২, ৬০.৫, ৪৭.৫ ও ৪১.৪ শতাংশ সাক্ষরতার হারের বিভ্রান্তিকর তথ্য নিয়ে নানা অবিশ্বাস ও আস্থাহীনতা সৃষ্টি হলেও তা দূর করার কোন উদ্যোগ নেই। কেউ নিজেদের

তথ্যকে অবাস্তব বা অসত্য বলতে রাজি নন। সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোকে নিয়ে সম্মিলিতভাবে জরিপ চালিয়ে বিভ্রান্তি দূর করার জন্যও কেউ এগিয়ে আসছে না। এমনই একটি অবস্থার মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছে দেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচী। জাতিসংঘ (ইউনেস্কো) পুনরায় ২০০৩-২০১২ সালকে বিশ্ব সাক্ষরতা দশক ঘোষণা দিয়ে এ সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সব দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করার জন্য তাগিদ দিয়েছে। ইতোপূর্বে একবার ১৯৯১-২০০০ সালকে 'সবার জন্য শিক্ষা দশক' ঘোষণা করা হয়েছিল। ইউনেস্কোর মতে, আন্তর্জাতিক স্বীকৃত সাক্ষরতার মাপকাঠি হচ্ছে, প্রাপ্ত বয়স্ক যে কোন পুরুষ বা নারী কোন ভাষায় লিখতে, পড়তে ও তা বুঝতে এবং গণনা ও সাধারণ হিসাব কষতে সক্ষম তাকে সাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন বা সাক্ষর বলা হয়। এ বিচারে বাংলাদেশের সাক্ষরতার হার প্রকৃত অর্থে কি হবে তা নিরপেক্ষ ও যথাযথ মূল্যায়ন ব্যাতীত সঠিক ভাবে বলা সম্ভব নয়। অনুমান করেও কেউ তা বলতে পারে না; বলা উচিৎও না। তবে এটা নিশ্চিত যে, ৪১ দশমিক ৫ শতাংশের চেয়ে অনেক কম। ২০১২ সাল আসতে আর আট বছর বাকি। এই আট বছরে সাক্ষরতার হার নিয়ে সব বিভ্রান্তি দূর করে শতকরা ১০০ ভাগ নিরক্ষরমুক্ত হতে পারবে কি বাংলাদেশ? 'গণসাক্ষরতা অভিযান' সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে দেশব্যাপী জরিপ চালিয়ে দেখেছে, ১১ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সী মানুষের সংখ্যা ৯ কোটি ৩১ লাখ। এদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ৪১ দশমিক ৪ শতাংশ। দেশের প্রতিটি এলাকার শহর, গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে আন্তর্জাতিক পদ্ধতি অনুসরণ করে তারা যে জরিপ করেছে তাতে দেখা যায়, দেশে নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা ৪ কোটি ৬০ লাখ। তবে ৪১ দশমিক ৪ শতাংশ সাক্ষরের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অংশই কোনমতে নিজেদের নামটি কেবল লিখতে পারে। কেউ শুধু নাম ছাড়া আর কিছুই লিখতে পারে না; কেউ কেউ কিছু কিছু পড়তেও পারে। তবে এই পড়ুয়াদের বেশিরভাগই কাগজে-কলমে হিসাব কষতে বা গণনা করতে পারেন না। 'কোন মতে নাম দস্তখত' আর 'কোন মতে কিছু পড়তে পারার শিক্ষা' নিয়েই সরকারি পর্যায়ে বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার নির্ণয় করা হয়! পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব মতে, এদেশে ১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব মানুষের সংখ্যা ৭ কোটি ৫১ লাখ ৩৫ হাজার। তন্মধ্যে সাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন মানুষের সংখ্যা ৩ কোটি ৫৬ লাখ ৭৮ হাজার অর্থাৎ ৪৭.৫ শতাংশ। সরকারি ও বেসরকারি হিসাবের ক্ষেত্রে বড়

ধরনের এ গোলমাল রয়েছে। এনজিওগুলো আন্তর্জাতিক নিয়ম নীতি অনুসরণ করে বলছে, সাক্ষরতা শিক্ষার বয়স ১১ বছর থেকে ধরতে হবে, আবার সরকারি সংস্থাগুলো বলছে, না ১৫ বছর থেকে ধরতে হবে। তাছাড়া, পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাবের ভিত্তি কি তা জানা যায়নি। বেসরকারি ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সাক্ষরতার হার নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দক্ষতা ও বয়স নির্ধারণসহ বেশ কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। ফলে, তথ্যের যথেষ্ট হেরফের দেখা যায়। অপর এক সরকারি পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, ১৯৯১ সালে দেশে সাক্ষরতার হার ছিল ৩৫ দশমিক ৩৭ শতাংশ, ১৯৯৫ সালে ৪৬ শতাংশ ও ১৯৯৮ সালে ৫১ শতাংশ। এদিকে গণশিক্ষা কার্যক্রমসহ বিভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রম নিয়ে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। বিগত ৮ বছরে সরকারি ভাবে পরিচালিত সার্বিক সাক্ষরতা কার্যক্রম বা টিএলএম (টোটাল লিটার‍্যাসী মুভমেন্ট) কার্যক্রমে ব্যয় দেখানো হয়েছে ৪০০ কোটি টাকা। ইতোমধ্যেই ব্যাপক দুর্নীতি, অনিয়ম ও অপচয়ের কারণে কর্মসূচীটিই বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। বন্ধ করে দেয়া হয়েছে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর সহ 'সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী' প্রকল্পও। ১৯৯৫ সালে চালু হওয়া এ প্রকল্পটি বন্ধের ফলে দেশের ১০ হাজার শিক্ষক-কর্মচারী বেকার হয়ে পড়েছে। বন্ধ হয়ে গেছে কয়েক সহস্রাধিক স্যাটেলাইট স্কুল। তাতে গরীব মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের উপবৃত্তিও বন্ধ হয়ে গেছে।

এ পরিস্থিতি শাসনকর্তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিদ্যমান সংকীর্ণতা ও বৈষম্যের ফলশ্রুতি নয় কি? সরকারি পর্যায়ে বাংলাদেশে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নিছক গরীবের শিক্ষা বলেই বিবেচিত। তা' না হলে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নিয়ে এত তামাশা হতো না। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাই অশিক্ষিত বা শিক্ষাবঞ্চিত গরীব সমাজে শিক্ষা বিস্তারের প্রধান উপায়; চোখ থাকতে অন্ধত্ব দূর করার উপায়। কিন্তু স্বাধীনতার প্রায় আঠার বছর পর ১৯৮৮ সাল থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত সময়টা ছিল সরকারি পর্যায়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার পরীক্ষামূলক পর্ব। ১৯৭৫ সাল থেকে গণসাক্ষরতা আন্দোলনে নিয়োজিতদের নিবেদিত অন্যতম ব্যক্তি ও সংগঠনের অবিরাম সংগ্রাম সাধনার ফলশ্রুতিতে সরকারি পর্যায়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁদের কারও সঙ্গে কোন পরামর্শ না করেই শুধু দুর্নীতির অভিযোগে ২০০৩ সালের অক্টোবর থেকে অধিদপ্তরটি বন্ধ করে দেয়া হয়। প্রশ্ন হচ্ছেঃ এ দুর্নীতি করেছে কারা? দুর্নীতির জন্য অধিদপ্তর অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানটিই দায়ী;

না-কি প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তারা দায়ী? প্রতিষ্ঠান বা বিভাগটি যাদের দ্বারা পরিচালিত তারাই দায়ী। তবে এটাতো সত্যি যে, প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করে দেয়ায় মানব উন্নয়নের মূল ভিত্তি ব্যবহারিক শিক্ষা যেমন দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তেমনি তাতে এতদিনকার অর্জিত সাফল্যও ব্যাহত ও অর্থহীন হয়ে পড়েছে। পৃথিবীর সব উন্নয়নই যে 'মানবকেন্দ্রীক' এ সত্যটি যাদের উপলব্ধিতে সক্রিয় তাঁরা কখনও এমন অনাকাংখিত ও অত্যন্ত বেদনাদায়ক একটি সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। কারণ, দেশের সিংহভাগ শ্রমজীবীর মধ্যে ব্যবহারিক সাক্ষরতা তথা মৌলিক শিক্ষার অভাব দেশের অর্থনীতি সহ সব খাতেরই উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রধান প্রতিবন্ধক। প্রশ্ন হচ্ছে, যে সব দেশ স্বাধীনতা অর্জনে বাংলাদেশের সমসাময়িক বা স্বাধীনতা অর্জনে অপেক্ষাকৃত নূতন তাদের মধ্যে যারা ইতোমধ্যেই তাঁদের দেশে শিক্ষার হার ৯০% বা তদুর্ধ্ব অর্জিত হয়ে গেছে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সফল প্রয়োগে এবং কাঙ্ক্ষিত জাতীয় উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনেও সক্ষম হয়েছে বা হচ্ছে; এমনকি উন্নয়নশীল থেকে উন্নত দেশে রূপান্তরিত হওয়ার পর্যায়েও পৌছে গেছে, বাংলাদেশে তাঁদের অনুসৃত নীতি-ব্যবস্থাদি অদ্যাবধিও অনুসরণ ও অনুকরণ করা হয়নি কেন? আর করে থাকলে তাতে সফলতা আসে না কেন?

সাত

শিক্ষাঙ্গন দক্ষ শিক্ষক সংকটে, অনিয়মে এবং দলীয় রাজনৈতিক অপসংস্কৃতিতে দূর্দশাগ্রস্থ

শিক্ষাঙ্গন মানুষ গড়ার কারখানা; শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার পবিত্র স্থল আর ছাত্ররাই জাতির ভবিষ্যৎ। নিজেদের জ্ঞানে-গুণে সুদক্ষজন হিসেবে গড়ে তোলার জন্য অধ্যয়নই ছাত্রদের প্রধান কাজ ও তপস্যা। শিক্ষকরা ছাত্রদের প্রকৃত ও যোগ্য মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার কারিগর। এ কারিগরীই হবে প্রত্যেক শিক্ষকের ব্রত এবং তাতে অর্জিত সফলতাই তাঁর জীবনের প্রকৃত সার্থকতা। দলীয় রাজনীতি বা কোন রাজনৈতিক মতাদর্শে একজন শিক্ষকের

বিশ্বাস থাকতেই পারে। কিন্তু তার চর্চা তিনি যথাস্থানেই করবেন; শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রদের মধ্যে নয়। কারণ তা' করতে গেলে তাঁর প্রতি ভিন্নমতাবলম্বী ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাভাবিক শ্রদ্ধাবোধ যে হ্রাস পায়! পাঠ্যগত জ্ঞান সহ কোন জ্ঞানই ছাত্ররা তাঁর কাছ থেকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারে না। দেশের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দলীয় রাজনীতি চর্চার ব্যাপকতা অনেক। মাদ্রাসাগুলোও তার ব্যতিক্রম নয়। মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতেও দলীয় রাজনীতি চর্চার সংক্রমন অপ্রতিরোধ্য। অন্যদিকে, শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত সংখ্যায়, যোগ্যতায় ও দক্ষতায় প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাব প্রকট। শিক্ষক হওয়ার মত যোগ্য লোকের অভাব দেশে আরও প্রকট। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক পদে চাকুরী প্রার্থীদের অজ্ঞতা-অদক্ষতার প্রকৃত চিত্র শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় পাওয়া যায়। এ নিয়ে নির্বাচন কমিটির নিঃস্বার্থ ব্যক্তিবর্গের হতাশা দেশের যে কোন সচেতন নাগরিককে ব্যথিত করে; বেদনাহত করে এবং তাঁদের মনে প্রশ্ন জাগায়; সত্যি সত্যিই কি আমরা এতটা ব্যর্থ জাতি? অজ্ঞ ও অদক্ষ কারিগর দিয়ে কখনও কি দক্ষ ও যোগ্য মানুষ তথা জাতি গড়া যায়? শিক্ষাঙ্গনে বিদ্যমান দলীয় অসুস্থ রাজনৈতিক প্রভাবে সর্বস্তরের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই অদক্ষ শিক্ষক-শিক্ষিকার পাল্লাই ভারী। কিন্তু তাদের দ্বারাই শিক্ষা দান কার্যক্রম পরিচালিত। শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশধারী উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই কেবল উপযুক্ত ও দক্ষ শিক্ষক তৈরী হতে পারে। প্রশ্ন হচ্ছে, সারাদেশে সেরকম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছেই বা ক'টা; আর যে ক'টা আছে তাদের উৎপাদন ক্ষমতা জাতি গঠনে দক্ষ মানুষের বর্তমান চাহিদা পূরণে সক্ষম কি?

শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার চর্চা ব্যতীত অন্য কিছুর চর্চা হলেই শিক্ষাঙ্গনের শৃঙ্খলায় বা পরিবেশে বিঘ্ন ঘটে। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্কুল-মাদ্রাসা পর্যন্ত সর্বত্রই দলীয় রাজনীতি চর্চা বিস্তৃত। প্রায় প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের ছাত্র-শাখা প্রায় প্রতিটি শিক্ষাঙ্গনেই সক্রিয়। শিক্ষাঙ্গনে দলীয় রাজনীতি ও তার চর্চা শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ বিনষ্ট করে। ১৯৮২ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত প্রায় নয় বছরে দলীয় রাজনীতি চর্চার কারণে শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই মোট পাঁচ বছর ছাত্রদের শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ ছিল। জাতীয় নেতা-নেত্রীদের মদদে কোন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক ভিন্নমতাবলম্বী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে দলীয় কোন্দল ও সংঘাতের কারণে সারা

দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দলীয় স্বার্থে তথাকথিত সাধারণ ছাত্র-ধর্মঘট পালন করা বা শিক্ষা কার্যক্রম অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করে দেয়ার রাজনৈতিক চর্চায় সাধারণ ছাত্র সমাজ যে অপরিমেয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়— প্রচলিত রাজনৈতিক প্রভাবে শিক্ষাঙ্গন কর্তৃপক্ষ অসহায় বিধায় এ আত্মঘাতি অপরাধেরও তাৎক্ষণিক প্রতিকার করতে তাঁরা সক্ষম নয়। স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছে তাঁদের স্বীয় দলীয় স্বার্থই শিক্ষাঙ্গনের মত মানুষ গড়ার কারখানায়ও মূখ্য বিধায় সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা জীবনে এত বড় ক্ষতির প্রতিও তাঁরা উদাসীন। এ ঔদাস্য আত্ম-প্রবঞ্চনার মত নয় কি? অতীতের অন্য যে কোন সময়ের মত ২০০৪ সালের আগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবরের সাধারণ ছাত্র-ধর্মঘটেও কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। সরকার, সরকারী ও বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ শিক্ষাঙ্গনে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনে বিরাজমান দুর্যোগ মোকাবেলায় বা তাতে শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার কোন উদ্যোগই নেননি। এটা অতীব হতাশার বিষয় নয় কি? শিক্ষাঙ্গনে এহেন রাজনৈতিক অপসংস্কৃতি চর্চায় জাতির ভবিষ্যতের জন্য দক্ষ ও যোগ্য নেতা-নেত্রী যে কখনও তৈরী হতে পারে না এবং এ সত্যটিও দেশের 'বিজ্ঞ' রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কি বুঝতে চাইছেন না! দলীয় রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার শুধু ছাত্রদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশাসনও তার শিকার। শিক্ষাঙ্গনও 'জোর যার রাজ্য তার' নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। সুযোগবাদীরা সদা শক্তিধর বা ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে বা পক্ষেই থাকে। ব্যতিক্রম বাদে শিক্ষকবর্গ কোন না কোন দলের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখে শিক্ষাঙ্গনে দল বিশেষের রাজনীতি চর্চা করে থাকেন। এ চর্চা এখন এমন এক পর্যায়ে পৌছে গেছে যে, ছাত্রদের শিক্ষাদানের চেয়ে রাজনৈতিক মতাদর্শ দানে তাঁরা ব্যস্ত থাকেন বেশী আর সময়মত স্বীয় স্বার্থ উদ্ধারে সচেষ্ট হয়ে পড়েন। তথাকথিত ছাত্র নেতা তথা রাজনৈতিক দলীয় শাখা নেতা-নেত্রীদের দলীয় প্রভাবে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেও অনেকে দলীয় রাজনীতি চর্চায় এত জড়িয়ে পড়েছে যে, শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষা চর্চার গোটা পরিবেশটাই বিপর্যস্ত। দলীয় লোক না হলে শিক্ষামন্ত্রীর সুপারিশ কখনও যোগ্যতা ভিত্তিক হলেও ক্ষমতাসীন সরকারের চ্যান্সেলরও সরকার দলীয় বা দলের প্রতি অনুগত হলে নিরপেক্ষতার অভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যোগ্যতম কেউ উপাচার্য পদে কদাচিৎ নিয়োগ পেয়ে থাকেন। লেকচারার থেকে প্রফেসর পর্যন্ত যোগ্যতম প্রার্থীর নিয়োগেও কর্তৃপক্ষের নিরপেক্ষতার কথা ভাবা দুষ্কর।

ফার্স্ট ক্লাস প্রাপ্ত প্রার্থী থাকতে নিম্ন-সেকেন্ড ক্লাস সার্টিফিকেটধারী সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের অনুগত প্রার্থীকে লেকচারার পদে নিয়োগের ঘটনা প্রচার মাধ্যমেও প্রকাশ পায়। এসব অনভিপ্রেত ঘটনাবলীতে অভিভাবক সহ দেশের সচেতন সমাজকে যারপর নাই বিচলিত হতেই হয়। এর অর্থ এই নয় যে, শিক্ষকদের জন্য রাজনীতি নিষিদ্ধ। শিক্ষক বা তাঁদের সংগঠন নিশ্চয়ই শিক্ষানীতি-পদ্ধতির উন্নতি, শিক্ষকদের নিজেদের এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নতি সাধনের সংগ্রাম-আন্দোলনে সম্পৃক্ত হবেনই। ব্যক্তিগত ভাবে দেশের রাজনীতি বা রাজনৈতিক দলের সঙ্গেও সম্পৃক্ত থাকবেন, যা' তাঁর জন্মগত অধিকার। ছাত্ররাও জীবনমুখী শিক্ষানীতি, ছাত্রদের নিজ নিজ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে মানসম্পন্ন শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখা এবং তা উন্নয়নের দাবি-আন্দোলন করবে, দেশের সংবিধানে নির্ধারিত বয়স (১৮) অর্জনের পর থেকেই তারা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের রাজনীতি করবে। তবে দেশের কোন রাজনৈতিক দলের এজেন্ট হয়ে ছাত্ররা জাতীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়লে অথবা শিক্ষকবর্গের নিজেদের দলীয় রাজনৈতিক চর্চা যখন ছাত্রদের হাতেও তুলে দেয়া হয় তখন সে শিক্ষাঙ্গন-পরিবেশ রুগ্নই হতে বাধ্য। যেমন, একই কারণে বাংলাদেশের অধিকাংশ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় তথা গোটা শিক্ষাঙ্গন-পরিবেশ অনেক আগেই রুগ্ন হয়ে পড়েছে এবং এ পরিবেশ-রুগ্নতার প্রসার মাদ্রাসা ও স্কুলগুলোতেও ঘটে গেছে। দেশে বিরাজমান নাজুক শিক্ষা পরিস্থিতিতে শিক্ষা মান-এ যে ধস নেমেছে তাতেই সে পরিবেশ রুগ্নতার জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। এর দায়-দায়িত্ব রাজনৈতিক দলের নেতা-নেতৃবৃন্দ এড়াতে পারেন কি? সংশ্লিষ্ট শক্ষকদেরও এর দায়িত্ব এড়াবার উপায় নেই। উপরন্তু, অধিকাংশ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকার দলীয় ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত গভার্নিং বডি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা মানের প্রতি উদাসীন। শিক্ষক নিয়োগে দলীয় পরিচিতি অগ্রাধিকার পায় বিধায় শিক্ষকের যোগ্যতা ও দক্ষতা প্রাধান্য পায় না। এমনকি, দেশের প্রায় সব সরকারী বেসরকারী মহাবিদ্যালয়-ই দলীয় রাজনীতির আখড়ায় পরিণত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থানীয় এম,পি'র আধিপত্যে আর দলীয় ছাত্র সংগঠনের নেতাদের দাপটে শিক্ষকমণ্ডলী তাঁদের প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখতে পারেন না। আর দলীয় স্বজনপ্রীতিতে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষককে ছাত্রদের শিক্ষাদানের চাইতে দলীয় দায়িত্ব পালনেই ব্যস্ত থাকতে হয় অধিকাংশ সময়।

২০০৪ সালের ২০ অক্টোবর একটি দৈনিকে 'বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের হাল' শিরোনামে প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন চেয়ারম্যানের নেতৃত্বাধীন ৯ সদস্যের উচ্চ পর্যায়ের মূল্যায়ন কমিটি ৮টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের সুপারিশ করেছে। কমিটির এক রিপোর্টে ৫২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ১০টির মান মোটামুটি সন্তোষজনক বলে মন্তব্য করা হয়েছে। বাকি ৪২টিরই বেহাল অবস্থা। যে সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সরকার তথা মঞ্জুরি কমিশনের বেঁধে দেয়া শর্ত পুরণ করেনি তাদের 'আল্টিমেটাম' দিয়ে বলা হয়েছে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মানোন্নয়ন ও পূর্বশর্ত পূরণ না করলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ রিপোর্টে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান অবনমনই কেবল পরিলক্ষিত হয়নি, শিক্ষার নামে তারা যে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে চলেছে তাও প্রমাণিত হয়েছে। রিপোর্টটির পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু এতেই যে সব তথ্য জানা যায় তা' অত্যন্ত ভয়াবহ। বেশির ভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক 'ফুলটাইম' শিক্ষক নেই, পাবলিক বিশ্ববিদালয়ের শিক্ষকদের দিয়ে 'পার্টটাইম' করানো হয়। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন শিক্ষক ২০টি পর্যন্ত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পার্টটাইম শিক্ষকতা করেন। এটাকে বিদ্যা বিতরণ না বলে বিদ্যাবাণিজ্য বলাই শ্রেয়। রিপোর্টে যে সুপারিশ করা হয়েছে তার সাথে দ্বিমত প্রকাশের অবকাশ নেই। শিক্ষার নামে এ প্রতিষ্ঠানগুলো একদিকে ব্যবসায় ফাঁদ পেতে বসেছে অন্যদিকে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সর্বনাশ ঘটাচ্ছে। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠিকমত ক্লাস-পরীক্ষার ব্যবস্থা না করেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়। এ সব বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতির কথাও কারও অজনা নয়। প্রশ্ন হল, এসব বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তো হঠাৎ করে শিক্ষার মানকে অতলে নামিয়ে দেয়নি। বহুদিন ধরেই শিক্ষার নামে অশিক্ষার মহড়া চলে আসছিল। কিন্তু তাদেরকে তদারক করার দায়িত্ব যাদের তারা অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এতদিন সে দায়িত্ব পালন করেনি। কেন করেনি সে প্রশ্নের জবাব নিশ্চয়ই মূল্যায়ন কমিটির রিপোর্টে নেই। থাকলে নিম্ন মানের বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের সুপারিশের পাশাপাশি মঞ্জুরি কমিশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশও করা হতো। মঞ্জুরি কমিশনই বেসরকারি

বিশ্ববিদ্যালয়ের মান তদারক না করে এতদিন বড় ভুল করেছে। কমিশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে কেবল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করলে কোন লাভ হবে না। তারা আবারও বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে নতুন বিদ্যা-ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান খুলে বসতে সাহায্য করবে। যে সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ন্যূনতম শর্ত পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে তাদের টিকিয়ে রাখার কোন যুক্তি নেই। পাশাপাশি এও দেখতে হবে যে, ব্যাঙের ছাতার মত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অনুমোদন কারা দিয়েছে। অনেক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ না-কি সরকারের তহবিলে জমাকৃত অর্থও উঠিয়ে নিয়ে গেছে। রিপোর্ট থেকে আরেকটি ইঙ্গিতও পাওয়া যায় যে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনুমোদন হতে শুরু করে একাডেমিক কার্যক্রম পর্যন্ত অনেক অনিয়ম ও অসাধুতার আশ্রয় গ্রহণ করেছে এবং তা এখনও অব্যাহত রয়েছে। মঞ্জুরী কমিশন ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের যোগসাজশ ছাড়া তা' কোনভাবেই সম্ভব কি? তা'ছাড়া, কোন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পক্ষপাতমূলক বা বিদ্বেষমূলক মনোভাব কাজ করছে এমন কোন অভিযোগ থাকলেও তার সুরাহাও করতে হবে।

২০০৪ সালের ২০ সেপ্টেম্বর একটি দৈনিকে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশের হাতেগোনা দু'একটি বেসরকারি কলেজ ছাড়া বেশিরভাগ কলেজে শিক্ষার পরিবেশ ধ্বংস হয়ে গেছে। বেসরকারি কলেজগুলোর পরিচালনা পরিষদের বা গভার্নিং বডির চেয়ারম্যান নিয়োগে দলীয় রাজনীতি, কলেজকে সেবামূলক প্রতিষ্ঠান মনে না করে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করাই শিক্ষার পরিবেশ ধ্বংসের অন্যতম কারণ। সাম্প্রতিক এক আলোচনায় বলা হয়েছে, বেসরকারি কলেজগুলোর গভার্নিং বডির কার্যক্রম সন্তোষজনক নয়। গভার্নিং বডির চেয়ারম্যান সরকারি ভাবে মনোনীত হওয়ার বিধান অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের জন্য ভাল বয়ে আনে না। শিক্ষক নিয়োগে টাকার বিনিময়ে অথবা রাজনৈতিক নেতা বা প্রভাবশালীদের চাপে কম যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীকে নিয়োগ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। অধিকাংশ গভার্নিং বডির সভাপতি ও সদস্যরা কলেজকে অর্থ আয়ের উৎস হিসেবে দেখে থাকেন,

ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করেন; সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখেন না। কলেজের শিক্ষা কার্যক্রমের প্রতি তাদের আগ্রহ খুবই কম। কলেজ রাজনীতিকরণের প্রতি তাদের আগ্রহ বেশি। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একডেমীর (নায়েম) উদ্যোগে পরিচালিত এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, বেশিরভাগ সভাপতি নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করেই প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন। অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ডের বিধিবিধান জানেন না। আর্থিক হিসেবের ব্যাপারে সভাপতি ও অধ্যক্ষ প্রধান ধারক-বাহক হিসেবে কাজ করেন। কলেজে নিরীক্ষা কমিটি থাকার কথা থাকলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা দেখা যায় না। শিক্ষক নিয়োগ সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তরে যথাযথ নিয়ম অনুসরণের কথা বলা হলেও বাস্তবে ভিন্ন চিত্র পাওয়া যায়। দু'একটি প্রতিষ্ঠান ছাড়া বাকিগুলোতে এ নিয়ম যথাযথ ভাবে অনুসরণ করা হয় না। তাদের অনেকেই কলেজের জন্য হুমকিস্বরূপ। খুব কম সংখ্যক সভাপতি ও সদস্যই তাঁদের কলেজের নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করে থাকেন। বিভিন্ন জেলার ৪০টি কলেজের ওপর গবেষণা চালানো হয়। অধ্যক্ষ, গভার্নিং বডির সভাপতি, শিক্ষক, অভিভাবক ও প্রতিবেশীদের কাছ থেকে প্রশ্নোত্তর সংগ্রহ ও সরেজমিন পরিদর্শনের মাধ্যমে এ প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। দেশে সরকারি-বেসরকারী মোট কলেজের সংখ্যা ২ হাজার ৫১১টি। এর মধ্যে ২৫১টি সরকারি কলেজ আর বাকি ২ হাজার ২৬০টি বেসরকারি কলেজ। বেসরকারি কলেজগুলো পরিচালিত হয় গভার্নিং বডি দ্বারা। সংশ্লিষ্ট এলাকার জনপ্রতিনিধি অথবা কোন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি গভার্নিং বডির সভাপতি মনোনীত হন। সদস্যরা নির্বাচিত হন সরকারি নিয়ম-নীতির মাধ্যমে। ইন্টারমিডিয়েট কলেজের গভার্নিং বডির মোট সদস্য ১১ জন আর ডিগ্রী কলেজের গভার্নিং বডির মোট সদস্য ১৪ জন। গঠন কাঠামোতে ভিন্নতা থাকলেও দু'ধরনের গভার্নিং বডিরই সদস্যদের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য একই ধরনের। প্রতিবেদনে বলা হয়, গভার্নিং বডির ওপর সরকারি পর্যায়ের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। যে উদ্দেশ্যে গভার্নিং বডি গঠিত হয় সে উদ্দেশ্য তেমন কার্যকর হয় না। অনেক ক্ষেত্রে সভাপতির সঙ্গে অধ্যক্ষদের থাকে না সুসম্পর্ক। তাদের মধ্যে মতের মিল না থাকায় গভার্নিং বডির মিটিংয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয় না। অধ্যক্ষ প্রায় সময় সভাপতির সঙ্গে দেখা করতে বাধ্য হন। সভাপতি যে সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেন তা বাস্তবায়ন করতেও তিনি বাধ্য হন বা তাকে বাধ্য করা হয়। অভিভাবকদের সঙ্গে সভাপতি

সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলেন। কেননা এতে নিজের দোষ অধ্যক্ষের ঘাড়ে চাপানো সহজ হয়। অনেক সভাপতি অভিভাবকদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেন আর শিক্ষকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। তাঁর অনুগত মনে না হলে যে কোন শিক্ষককে যখন-তখন চাকরিচ্যুত করার ভয় দেখান। এতে শিক্ষকরা তাঁদের দায়িত্ব স্বাভাবিক ভাবে পালন করতে পারেন না।

২০০৪ সালের ১০ অক্টোবর একটি দৈনিকে প্রকাশিত শিক্ষক ও ছাত্র রাজনীতির ওপর এক প্রতিবেদনে বলা হয়, গত ১০-১২ বছর ধরে ছাত্ররাজনীতির পক্ষে-বিপক্ষে বিতর্ক চলে আসছে। এর সঙ্গে শিক্ষক রাজনীতি নিয়ে এক অর্থহীন বিতর্কও যোগ হয়েছে। ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতি নিয়ে এ বিতর্ক স্রেফ সময়ের অপচয় মাত্র। কারণ, কেউ যদি ভুল জায়গায় কূপ খোঁড়েন তবে কখনোই তিনি 'তেল-গ্যাস' পাবেন না। আসলে, ছাত্ররাজনীতি থাকবে না বন্ধ হবে, শিক্ষকরা রাজনীতি করতে পারবেন কি পারবেন না, বিতর্কটা এখানে নয়। বরং বিতর্ক হওয়া উচিত 'শিক্ষাঙ্গনে' রাজনীতি করা যাবে কি যাবে না তা নিয়ে। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট সামাজিক গোষ্ঠীর 'রাজনীতি' করার অধিকার থাকবে কি থাকবে না প্রশ্নটি তা নিয়ে নয়; প্রশ্নটি হলো, একটি নির্দিষ্ট জায়গায় বা ভৌগোলিক স্পেস বা ভৌগোলিক পরিসরে নির্দিষ্ট ধরনের 'রাজনীতি' করার অধিকার ও সুযোগ আমরা রাখব কি না সে নিয়ে। একটি সামাজিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট গ্রুপ বা গোষ্ঠী হিসেবে ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েরই রাজনীতি করার অধিকার থাকবে। যেমন— শ্রমিকদের, নারীদের, আদিবাসীদের, ডাক্তারদের, প্রকৌশলীদের, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের, সংখ্যাগুরুদের, ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের, সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবীদের কিংবা যৌনকর্মীদের রাজনীতি করার অধিকার রয়েছে। এমনকি, এনজিওতে কর্মরতদের রাজনীতি করার অধিকার নিয়েও কোন আপত্তি নেই। স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে সংগঠন করার, আন্দোলন করার, রাজনীতি করার অধিকার বাংলাদেশের সংবিধান স্বীকৃত একটি মৌলিক অধিকার। তাই, ছাত্র বা শিক্ষকরা এই সাংবিধানিক অধিকার ভোগ করতে পারবেন না—এ ভাবনাটি বৈষম্যমূলক, প্রতিক্রিয়াশীল ও মৌলিক অধিকার পরিপন্থী। অতএব, ছাত্র ও শিক্ষকদের রাজনীতি করার অধিকার অবশ্যই থাকবে। একে বন্ধের চিন্তা করাই অন্যায়। যা করতে হবে তা হলো, শিক্ষাঙ্গনে 'দলীয় রাজনীতি'র চর্চা বন্ধ করতে হবে। অর্থাৎ, ছাত্র বা শিক্ষক কেউই যতক্ষণ

'শিক্ষাঙ্গনে' থাকবেন ততক্ষণ কোনো ধরনের 'দলীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে' অংশ নিতে পারবেন না। কারণ, শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রদের যথাযথ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন তাদের নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশের ওপরই নির্ভরশীল।

এটা শিক্ষাসেবীদের জানার কথা, জাপানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে জুতা নিয়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ। কারণ, তাদের কাছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঠিক মন্দির-মসজিদের মত পবিত্র। অথচ বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে অবৈধ অস্ত্র ধারণ বা তার অপব্যবহারও অপবিত্র কাজ বলে মনে করা হয় না। অসুস্থ দলীয় রাজনীতি ও তার প্রভাবে দেশের শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষা দান ও শিক্ষা গ্রহণের স্বাভাবিক পরিবেশ কিভাবে বিঘ্নিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত তার বর্ণনা আগেই দেয়া হয়েছে। সরকারের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থাকলে পরীক্ষায় নকলের মত অপসংস্কৃতি রোধে সরকার সফল হতে পারলে সবার জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষাও নিশ্চিত করা সম্ভব। শিক্ষা-মানে যে ধস নেমেছে সরকার শিক্ষাঙ্গন থেকে তার জন্য দায়ী দলীয় রাজনীতির মত বিদ্যমান অন্যসব অপসংস্কৃতিও নির্মূল করে শিক্ষার সর্বস্তরে শিক্ষা-মান নিশ্চিত করতেও সক্ষম। শিক্ষাঙ্গনে দলীয় রাজনীতি এক জীবনবিধ্বংসী অপসংস্কৃতি; কারণ তা' শিক্ষা-মানের প্রধান ঘাতক। দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে দেশ ও জাতির স্বার্থের চাইতে দলীয় স্বার্থের প্রাধান্য বেশী বিধায় শিক্ষাঙ্গনকে দলীয় রাজনীতিমুক্ত করা সম্ভব হয় না। দেশের 'বিজ্ঞ রাজনীতিকবর্গ' অবশ্যই বুঝতে পারেন যে, দক্ষতা ও সফলতার সঙ্গে দেশ পরিচালনার জন্য যে যোগ্য ও দক্ষ নেতৃত্ব আবশ্যক তার ভিত্তি শিক্ষাঙ্গনেই তৈরী হয়। আর সেখানে দলীয় রাজনীতি চর্চা অব্যাহত থাকলে; যার যে কাজ তাকে সে কাজেই পুরোপুরি মনোযোগী হতে না দিলে জাতীয় নেতৃত্বে দেউলিয়াত্বই অব্যাহত থাকবে। শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তৃতি এবং তার অব্যাহত প্রয়োগের ফলে অর্থনীতি, মানব উন্নয়ন, নৈতিকতা, সভ্যতা-সংস্কৃতি পৃথিবীর দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে তাঁদের কাংখিত উন্নতি এনে দিয়েছে এবং তার ধারাও অব্যাহত রয়েছে। তার জন্য স্বচ্ছ-পরিচ্ছন্ন ও সুশৃংখল রাজনীতি এবং তাতে বিশ্বাসী তার ধারক-বাহক রাজনৈতিক দল ও সরকারগুলো দেশ ও জাতীয় স্বার্থকেই নিজেদের দলীয় ও ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্দ্ধে রেখে প্রয়োজনীয় ত্যাগ স্বীকার করেছেন; মাতৃভূমি তথা দেশের প্রতি প্রকৃত ভালবাসার স্বাক্ষর রেখেছেন এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা

করতে সক্ষম হয়েছেন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিকরা পৃথিবীর ওসব দেশের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজের দেশে তার রূপায়ণে ব্রতী হন না কেন?

আট

মানব উন্নয়ন ও মানবাধিকার পরিস্থিতি হতাশাব্যঞ্জক

প্রকৃত অর্থে বা ইউনেস্কোর দেয়া সাক্ষরতার সংজ্ঞা অনুসারে দেশের দুই-তৃতীয়াংশের অধিক মানুষ এখনও নিরক্ষর। সরকারী বা বেসরকারী ভাবে যাদের সাক্ষর বলে হিসেব করা হয় তাদের অধিকাংশের সাক্ষরতা ইউনেস্কোর সংজ্ঞা সম্মত নয়। ফলে, ব্যবহারিক জ্ঞানের অভাব তাদের মধ্যে প্রকট। এতদ্‌সত্ত্বেও জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় বাংলাদেশে মানব উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার বা উপাদান হিসেবে বিষয়টি প্রাধান্য পায় না। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশে মানব উন্নয়নের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। ১৯৭৫ সাল থেকে গণসাক্ষরতা আন্দোলনে নিয়োজিতদের কিছু নিবেদিত প্রাণ স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের অবিরাম সংগ্রাম-সাধনার ফলশ্রুতিতে সরকারী পর্যায়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয়, দুর্নীতির অভিযোগে অধিদপ্তরটি বন্ধ করে দেয়া হয়। প্রশ্ন হচ্ছেঃ দুর্নীতির জন্য অধিদপ্তর অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানটিই দায়ী; না-কি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তারা দায়ী? প্রতিষ্ঠান বা বিভাগটি যাদের দ্বারা পরিচালিত তারাই দায়ী। তবে এটাতো সত্যি যে, প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করে দেয়ায় মানব উন্নয়নের মূল ভিত্তি ব্যবহারিক শিক্ষার অগ্রগতি যারপর নাই ব্যাহত হয়। আর প্রতিষ্ঠানটির এতদিনকার অর্জিত সাফল্যও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দেশের 'মুরুব্বীরা' অবশ্যই অবগত আছেন যে, পৃথিবীর সব উন্নয়নই মানবকেন্দ্রীক। এতদ্‌সত্ত্বেও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরটি বন্ধ করে দেয়ার মত একটি সরকারী সিদ্ধান্ত জাতির জন্য একেবারে অনাকাংখিত এবং অত্যন্ত বেদনাদায়ক। ইউএনডিপির বার্ষিক প্রতিবেদন অনুসারে মানব উন্নয়নে যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশের পিছিয়ে পড়ে থাকার বিষয়টি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর বন্ধ

করে দেয়ার মত এমন মর্মান্তিক একটি সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রাক্কালে সরকারী বিবেচনায় আনা উচিৎ ছিল।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তারা এও জানেন, মানব উন্নয়ন শুধু আর্থিক অবস্থার উন্নতি নয়। মানুষের অনেক ইচ্ছার মধ্যে অর্থ উপার্জন একটি এবং তা' করতে মানুষ বেশী পছন্দ করে। এটা নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ। তবে তা' সব ইচ্ছা বা পছন্দের প্রধান নয়। অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধি মানব উন্নয়নের অন্যতম প্রধান উপাদান হতে পারে। তবে আরও অনেক কিছু আছে যা' মানুষের কাছে অনেক দামি ও মূল্যবান। আবার তাও সবার কাছে এক রকম দামি বা মূল্যবান নয়। যেমন, একজন গরীব মানুষের জীবনে চাহিদার প্রাধান্য অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, তার চাহিদার প্রাধান্যের সঙ্গে অন্যের চাহিদার প্রাধান্যের মিল নেই। অধিক আয় করার ইচ্ছাটাই তার মধ্যে প্রবল এবং মুখ্য। পর্যাপ্ত পুষ্টি, নির্ভেজাল পানি, ভাল স্বাস্থ্য সেবা, শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় ও ভাল স্কুলের ব্যবস্থা, সুলভ পরিবহন, পর্যাপ্ত আশ্রয়স্থল, অব্যাহত কর্মসংস্থান, নিরাপদ জীবিকা বা জীবিকা নির্বাহের উপায় এবং উৎপাদনকর, লাভদায়ক এবং সন্তোষজনক চাকরি, মাথাপিছু উচ্চ আয় ইত্যাদিও মানব উন্নয়নে সফলতার সূচকও মাপকাঠিতে পড়ে।

জীবনের জন্য অনেক অ-বস্তুবাচক সুযোগ-সুবিধাও রয়েছে, যা' গরীব সাধারণের কাছে তাদের মৌলিক সুযোগ-সুবিধার চেয়েও অনেক মূল্যবান। এগুলো হচ্ছে, কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ অবস্থা, চাকুরি ও জীবিকা পছন্দে স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা ও চলা-ফেরার স্বাধীনতা, অত্যাচার, হিংস্রতা ও শোষণ থেকে মুক্তি, বে-আইনী আটক ও নির্যাতন থেকে মুক্ত থাকার নিশ্চয়তা, সুখদায়ক পারিবারিক জীবন, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় নিশ্চয়তা, পর্যাপ্ত বিশ্রামের সময় এবং তার সন্তোষজনক উপভোগের ধরণ, জীবনের লক্ষ্য ও কর্মের উদ্দেশ্যে যৌক্তিকতা, সভ্য সমাজে যোগদানে এবং তার কার্যকলাপে সক্রিয় অংশ গ্রহণের সুযোগ এবং সামাজিক কর্মকান্ডে অবদান রাখতে সক্ষম একজন হিসেবে একটা অনুভূতি ও গর্ববোধ। এসবকে অনেক সময় তারা তাদের অধিকার ও উৎপাদন কাজে সন্তুষ্টির মাধ্যম বিবেচনা করে অর্থের চেয়েও অনেক মূল্যবান মনে করে। কোন নীতি প্রণেতা এসব অর্জনের সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা দিতে পারেনা অথবা এমন কি, এসব আকাঙ্খা অধিকাংশ

পূরণেও না। কিন্তু একথা সত্যি যে, এসব আকাঙ্খা পূরণের জন্য সঠিক নীতি প্রয়োজনীয় সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। যা' হোক, কোন একক মানদন্ড বা যৌগিক সূচীতে অথবা এমন কি, বিস্তারিত একগুচ্ছ পরিসংখ্যানেও যা' ধারণ করা হয় মানব উন্নয়ন তার চেয়েও অত্যন্ত গভীর ও উন্নততর কিছু। তবুও, মানব উন্নয়নে অগ্রসরতা মনিটর করার জন্য একটি সহজ হাতিয়ার আবশ্যক, যাতে মানব উন্নয়নের সফলতাগুলো মানুষের যোগ্যতার মধ্যে প্রতিফলিত হয় এবং যা' দীর্ঘ জীবন ও জ্ঞানমণ্ডিত একটি সুন্দর ও মানগত জীবন-যাপনের দিকে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায়। মূলতঃ তিনটি পরিবর্তনশীল মাত্রায় মানব উন্নয়ন মনিটর করা যায়, যেমন-(১) মানুষের আয়ু (Life Expectancy), (২) মানুষের শিক্ষাগত যোগ্যতা (Educational Attainment) এবং (৩) মানুষের মাথাপিছু আয় (Percapita Income)। অতএব, অর্থ উপার্জন বা মাথাপিছু আয় মানব উন্নয়ন সূচকগুলির অন্যতম হতে পারে অথবা মানব উন্নয়নের অন্যতম উপায় হতে পারে মাত্র; কিন্তু কেবল তা-ই মানব উন্নয়ন নয়। তবে শৈশব থেকে মানুষের জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের যথাযথ দায়িত্ব পালনের ওপরই মানব উন্নয়ন নির্ভরশীল।

মানব উন্নয়নে বাংলাদেশের অবনত অবস্থান সচেতন সমাজকে আহত করে। মানব উন্নয়ন মানুষের জীবনে তার পছন্দসমূহ বিকাশের একটি প্রক্রিয়া। এটা কেবল কোন পরিষ্কারক সামগ্রী, টেলিভিশন চ্যানেল বা গাড়ীর মডেলের মত কিছু পছন্দের ব্যাপার নয়। বরং তা' হচ্ছে, শৈশব থেকে মানুষের জীবনে অর্জিত যোগ্যতা বা শিক্ষা ও দক্ষতাসম্পন্ন মানুষের ক্রিয়াকলাপ দ্বারা সৃষ্ট কিছু, যা' মানুষ তাদের জীবনে রূপায়ণেও সক্ষম। মানব উন্নয়নের জন্য কিছু যোগ্যতা অত্যাবশ্যক, যা' ব্যতীত মানব জীবনের অনেক পছন্দ বা চাহিদা দুষ্প্রাপ্যই থেকে যায়। আর সে অতি প্রয়োজনীয় যোগ্যতা হচ্ছে, দীর্ঘ, সুস্থ ও সুশিক্ষায় জ্ঞানমণ্ডিত সুন্দর জীবন মানে প্রবেশ করার সম্পদ ভোগে উপযুক্ত হতে পারা এবং এটাই UNDP-র মানব উন্নয়ন সূচীতে (Index-এ) প্রতি বছর প্রতিফলিত হয়। এ ছাড়া, মানুষের কাছে আরও বেশ কিছু পছন্দ মূল্যবান। সেগুলি হচ্ছে, তাঁদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা; একটি সমাজ বা গোষ্ঠী-মেজাজ, সৃজনশীলতা ও উৎপাদনশীলতার সুযোগ-সুবিধা, আত্ম-

মর্যাদা, আত্ম-নির্ভরশীলতা, ন্যায়পরায়ণতা তথা মানবাধিকারের বাস্তবতা। আর মানবাধিকার অর্জন প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ শিশু অধিকার। শিক্ষা মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। বাংলাদেশে সব শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক। তবে এ আইনের চর্চায় যে নীতি ও ব্যবস্থার প্রয়োজন তা' বাংলাদেশে এখনও অনুপস্থিত বিধায় সব শিশুর জীবনে প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা আজও সম্ভব হয়নি। শিশু অধিকার অর্জনের যথাযথ চর্চার মধ্য দিয়েই পর্যায়ক্রমে বয়স্কদের মধ্যেও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা পায়। তার অনুপস্থিতিতে মানব উন্নয়ন কখনও সম্ভব নয়।

১৯৯০ সালে UNDP-র Human Development Index-এ ১৬৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৪৬ ক্রমিক নম্বরে। ১৯৯৯ সালে অর্থাৎ ১০ বছর পরে UNDP-র Human Development Index (HDI) অনুসারে পৃথিবীর ১৭৪টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৫০ ক্রমিকে। অর্থাৎ এ দশ বছরে মানব উন্নয়নে বাংলাদেশের অবস্থান অবনতির সম্মুখীন হয়েছিল। ২০০৩ সালের মানব উন্নয়ন ইনডেক্সে পৃথিবীর ১৭৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের স্থান ১৩৯ তম এবং ২০০৪ সালে ১৭৭টি দেশের মধ্যে তা ১৩৮তম অবস্থানে যায়। অর্থাৎ বিগত দু'বছরে মানব উন্নয়নে বাংলাদেশের কিছুটা অগ্রগতি লক্ষ্যণীয়। তবে ২০০৪ সালের মূল্যায়নের মূল বিষয় বা 'থিম' ছিল **'সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা'** আর ২০০৩ সালে তা' ছিল **'মানব দারিদ্র্য'**। ১৯৯০ সালে ইউএনডিপি প্রথম মানব উন্নয়ন রিপোর্ট প্রকাশ করে। সে মূল্যায়নের মূল বিষয়বস্তু ছিল : Concept And Measurement of Human Development বা **'মানব উন্নয়নের ধারণা ও মাপকাঠি'**। ১৯৯৯ সালে অর্থাৎ দশ বছর পর UNDP দ্বিতীয় রিপোর্ট প্রকাশ করে। ২০০০ সালের মানব উন্নয়ন মূল্যায়ন রিপোর্টের মূল বিষয়বস্তু ছিল **'মানবাধিকার ও মানব উন্নয়ন'** বা Human Rights & Human Development এবং ২০০১ সালে Making New Technologies Work For Human Development এবং ২০০২ সালে তা ছিল Deepening Democracy in Fragmented World. মানব উন্নয়ন আর মানবাধিকার পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। মানব উন্নয়ন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার পূর্ব শর্ত। আবার মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই কেবল মানব উন্নয়নের চর্চা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব।

২০০৪ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ইউএনডিপি বাংলাদেশ এবং ঢাকাস্থ অস্ট্রেলিয়ান হাইকমিশনের উদ্যোগে ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'মানবাধিকারের প্রাতিষ্ঠানিক রক্ষা : জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা' শীর্ষক তিন দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি সৈয়দ জে. আর মুদাস্‌সির হুসেইন তার বক্তব্যে বলেন, আধুনিক যুগেও যুদ্ধ এমনকি স্বাভাবিক সময়েও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মানবাধিকার মারাত্মক লংঘিত হচ্ছে। আমাদের দেশে সাম্প্রতিক সন্ত্রাসী ঘটনাগুলো শান্তিকামী মানুষদের হতাশা ও দুশ্চিন্তার মাঝে ফেলেছে। তিনি বলেন, আমাদের ধর্ম, দর্শন এবং সংবিধান সহনশীলতার কথা বলে। অধিকার খোঁজার সময় নাগরিক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতাকে এড়িয়ে যাওয়া ঠিক নয়। সমাজে সমতা, ভালবাসা, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি আনতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রধান বিচারপতি আরও বলেন, **"The recent events of violence in our society have unveiled the fangs of hardened miscreants. It has thrown the entire peace loving people of the country into an abyss of tension and frustration."** প্রধান বিচারপতি অত্যন্ত দুঃখের সাথে আরও বলেন, **"Nowadays political one-upmanship has taken ugly proportions, and violence pervades politics and political activities. To go through a news paper or hear the news on television now requires very strong nerves with steel frame."**

সম্মেলনের সভাপতি বাংলাদেশের আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ব্যরিষ্টার মওদুদ আহমেদ তার বক্তব্যে বলেন, যে কোন ধরনের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হল গণতন্ত্র এবং সুশাসন। দেশের সংবিধানে মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। তবে দুঃখজনক হলেও সত্যি, আমাদের দেশের মানুষের একটি বড় অংশ তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়। তিনি বলেন, সরকার দেশে একটি স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে। বিষয়টি মন্ত্রীসভার বিবেচনাধীন রয়েছে। সরকার একটি কার্যকর স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ইউএনডিপির ঢাকাস্থ আবাসিক প্রতিনিধি ইয়োর্গেন লিসনার তাঁর বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন, স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা এবং শক্তিশালী সংসদ দরকার। তিনি তাঁর বক্তব্যে মানবাধিকার লংঘনের ক্ষেত্রে পুলিশ বাহিনীর ভূমিকার সমালোচনা করেন।

অস্ট্রেলিয়ান হাইকমিশনার মিস লরেইন বারকার বলেন, বাংলাদেশের প্রতিশ্রুত বিচার পদ্ধতির সঙ্গে বাস্তবতার মিল নেই। আদালতগুলোতে মামলার কাজে অতিরিক্ত খরচ, দীর্ঘসূত্রিতা প্রভৃতির কারণে অধিকাংশ মানুষের জন্য ন্যায় বিচার পাওয়াটা এক দুরূহ ব্যাপার। তিনি তাঁর বক্তব্যে স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

বাংলাদেশে মানবাধিকার পরিস্থিতির অবনতি সম্পর্কে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের উদ্বেগ ঃ ২০০৩ সালে বাংলাদেশে মানবাধিকার পরিস্থিতির অবনতিতে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট এ উদ্বেগ প্রকাশ করে। পার্লামেন্টের অভিমত, সন্ত্রাসীদের অপ্রতিরোধ্য অপরাধ এবং পুলিশের ব্যর্থতার কারণে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। অব্যাহত সন্ত্রাসের পেছনে অপরাধী পুলিশ ও কিছু রাজনীতিবিদের যোগসাজশ রয়েছে। ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের কমিশনার ও হংকংয়ের সাবেক গভর্নর ক্রিস প্যাটেন এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কমিশনার ক্রিস প্যাটেন ২০০৩ সালের ১৮ নভেম্বর এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে বলেন, ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট বাংলাদেশের অবনতিশীল আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি এবং মানবাধিকার লংঘনের ঘটনায় উদ্বিগ্ন। বিশেষ করে ১৯৯৭ সালের পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে কোন অগ্রগতি না থাকায় পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে অসন্তোষ ও উত্তেজনা বাড়ছে। কমিশনার মনে করেন, সরকার ২০০২ সালে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের জন্য যে 'ক্লিন হার্ট' অভিযান পরিচালনা করেছিল, ২০০৩ সালের অবনতিশীল আইন-শৃংখলা পরিস্থিতিকে বিবেচনায় নিলে বলা যায়, সে অভিযানের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে।

নয়

অর্থনৈতিক অবকাঠামো ও পরিকল্পনা গণদারিদ্র্য বিমোচনে অপারগ

যে দারিদ্র্যপীড়িত কোটি কোটি গণমানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য মহান মুক্তিযুদ্ধের অবতারণা তাতে অর্জিত স্বাধীনতার তেত্রিশ বছরেও **জীবনমুখী শিক্ষা-সমন্বিত দারিদ্র্য-বিমোচন কার্যক্রম** পরিচালিত হয়নি। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ এ চব্বিশ বছর জাতীয় সংহতির নামে রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির মানসে পাকিস্তানের একাংশ হিসেবে বাংলাদেশ ভূখণ্ডের (পূর্ব পাকিস্তানের) অধিবাসীদের 'মুসলিম মুসলিম ভাই-ভাই' বলে পশ্চিম পাকিস্তানীরা নজিরবিহীন শোষণের অন্তরালে নকল সম্মান প্রদর্শন করে থাকলেও সাধারণতঃ 'ভূখা বাঙ্গালী' বলে তিরস্কারই করতেন। তাতে পূর্ব-পাকিস্তানের কিছু কিছু আত্ম-সম্মান সচেতন সাহসী মুসলিম জাতীয় মুক্তির মহান নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের নির্ভীক নেতৃত্বে প্রতিবাদী হয়ে উঠলেও পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর দোসর তথা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও সম্পদের অংশীদার এবং চাটুকার পূর্ব-পাকিস্তানী মুসলিম নেতাদের সমর্থন তাঁরা কখনও পাননি; বরং চরম নির্যাতনের শিকারই হতে হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিব সহ তাঁদের অনেককে। এটা সত্যি যে, পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশ ভূখণ্ডের সাধারণ মুসলিমদের 'অরিজিন' ছিল দারিদ্র্য-পীড়িত। অর্থনীতির কোন সুপ্রভাবে তাঁরা আর্থিক স্বচ্ছলতার মুখ জীবনে কখনও দেখতে পায়নি। ইসলামের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মহান সৃষ্টিকর্তার রহমত লাভের আশায় তাঁরা দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলিম হয়েছিলেন সত্যি; কিন্তু অশিক্ষিত ও গরীব রয়ে গেছে বলে প্রকৃত স্বাধীনতা ও আত্ম-সম্মানবোধে তারা সচেতন হতে পারেনি। তবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সক্রিয় ভাবে জেগে উঠতে তাদের যে সময় লেগেছিল তা' অখণ্ড পাকিস্তানের প্রায় গোটা সময়টার সমান (তেইশ বছর)—যেমন লেগেছিল পাকিস্তান নামের স্বাধীন ভূখণ্ড অর্জনে বৃটিশ শাসিত অখণ্ড ভারতের মুসলিমদের পুরো দু'শ বছর। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ভূখণ্ডের মুসলিমদের মধ্যেকার সে আত্ম-সচেতন, প্রতিবাদী-স্বাধীনতাকামী অংশ এক বিশাল মুক্তিবাহিনীর রূপ নেয়। পাকিস্তানী হানাদার সেনাবাহিনীর অতর্কিত আক্রমণ

ও গণহত্যার জবাবে মহান জাতীয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে মহান দেশপ্রেমিক সেনা অফিসার মেজর জিয়াউর রহমানের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার প্রেক্ষিতে এ মুক্তিবাহিনী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে। প্রতিবেশী ভারত সরকারের সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতায় মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল এম.এ.জি ওসমানীর নেতৃত্বে শোষক, আগ্রাসী ও হানাদার পাকিস্তানী শাসনের বিরুদ্ধে এ মুক্তিযুদ্ধ পরিপূর্ণ স্বাধীনতা যুদ্ধের রূপ লাভ করে। ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ তৎকালীন কুষ্টিয়া জেলার (বর্তমানে মেহেরপুর জেলা) মেহেরপুরের আম্রকাননে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে (পাকিস্তানে কারারুদ্ধ) রাষ্ট্রপতি করে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়। সে সরকারের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল এম, আতাউল গনি ওসমানির পরিচালনায় দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধের ফসল এ স্বাধীন বাংলাদেশ। ত্রিশ লক্ষ জীবন, অগণিত মা-বোনের ইজ্জত এবং অবর্ণনীয় ত্যাগ-তিতীক্ষার বিনিময়েই অর্জিত হয় এ স্বাধীনতা। আফসোস, সে স্বাধীনতা আজও যেন ভৌগলিক স্বাধীনতাই রয়ে গেল। এ স্বাধীনতার ফসল আজো সে ত্যাগী মুক্তিযোদ্ধা ও সংগ্রামী-ত্যাগী গণমানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরেই রয়ে গেল। তবে দেশের রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী ও তাঁদের আত্মীয়-স্বজন, দলীয় রাজনৈতিক অনুসারী-সহকর্মী, সহযোগী-চাটুকারদের ঘর স্বাধীনতার ফসলে ভরে গেছে; তাঁদের জীবন স্বাধীনতার 'সুফলে' এত বেশী সজ্জিত হয়েছে যে, অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্যে তাঁদের পরিবার তথা বংশের সবার জীবন থেকেও মুসলিম 'অরিজিন'-এর সে দারিদ্র্য সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। অর্থাৎ তাঁদের বসত বাড়ী ও আবাসিক এলাকার আভিজাত্য প্রত্যক্ষ করলেই তা' সহজে অনুমেয়। অন্য কারও উন্নতি যে হয়নি তা' নয়। শত প্রতিকূলতার মধ্যেও স্বাধীন বাংলাদেশের কিছু অধ্যবসায়ী জীবন-সংগ্রামীর জীবনেও অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ও উন্নতি অর্জিত হয়েছে। তবে তাঁদের এ অর্জনকে স্বাধীনতার সুফল প্রভাবিত বলা চলে না। আশির দশকের প্রথম দিকে দেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় একজন খ্যাতনামা বর্ষীয়ান লেখক-সাংবাদিক এক প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, **'বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা বাংলাদেশের সরকারই; কারণ—সরকারে যারা আসেন-যান তাঁরা নিজেরা নিজেদের স্বার্থ নিয়েই বেশী ব্যস্ত থাকেন, দেশের সমস্ত সম্পদ যেন তাঁদেরই সম্পদ; আর দেশের স্বাধীনতা যেন তাঁদের এবং তাঁদের আত্মীয়-স্বজনদের জন্যই অর্জিত হয়েছে।'** স্বাধীন বাংলাদেশের সরকারেরা দেশের অবহেলিত কোটি

কোটি মানুষকে তাদের দারিদ্র্য পীড়িত 'অরিজিন' থেকে উত্তোরণের যথার্থ পথটা এতদিনেও করে দিতে সক্ষম হয়নি। কবে কি ভাবে এ গণদারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব হবে তার কোন স্বচ্ছ-নির্বিঘ্ন পরিকল্পনাও লক্ষ্য করা যায় না। তবে বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানের ভাষ্যেও জানা যায়, সামষ্টিক অর্থনীতি ভাল হলেও সুশাসনের অভাবে এবং অনুকূল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও অবকাঠামোর অভাবে তার ফসল ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে সুষম ভাবে বিতরণ করা সম্ভব হয়ে উঠছে না। ৪ঠা অক্টোবর, ২০০৪ বিশ্ব বসতি দিবসে দেশের একটি দৈনিকে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, দেশের প্রায় এক কোটি মানুষের মাথা গোঁজার মতো নিজস্ব বসতভিটা নেই। নদীভাঙন, জলোচ্ছ্বাস ও উপকূলীয় এলাকায় নদী ভাঙ্গনে প্রতি বছরই গৃহহীন হচ্ছে প্রায় দেড় লাখ মানুষ। শুধু রাজধানী ঢাকা সহ দেশের শহরগুলোর বস্তিতেই অমানবিক ভাবে বসবাস করে প্রায় অর্ধ কোটি মানুষ। তাছাড়া নগর ও গ্রামাঞ্চলের রেল লাইন এবং সড়ক-মহাসড়কের ধারে, নদীর চরে, রেল, বাস ও লঞ্চ স্টেশন, সংরক্ষিত বনাঞ্চল, পাহাড়, টিলাসহ অন্যান্য সরকারি খাস জমিতেও লাখ লাখ গরিব, দুঃস্থ, অসহায়, সহায়-সম্বলহীন মানুষ বসবাস করে। দেশের এ চিত্রকে সামনে নিয়েই প্রতি বছরের মতো ২০০৪ সালের অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবারও উদযাপিত হল 'বিশ্ব বসতি দিবস'। মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে 'গৃহহীনদের বাসস্থানের ব্যবস্থা' করার সরকারী পরিকল্পনার কথা অন্যসব বারের মত এবারও জানা যায়। তবে দেশবাসী তার বাস্তবতাও দেখতে চায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, বুয়েটের নগর পরিকল্পনা বিভাগ, গণপূর্ত অধিদফতর, বিভিন্ন এনজিও এবং বেসরকারি হাউজিং ব্যবসায়ীদের সূত্রে জানা যায়, দেশের প্রায় ১৫ কোটি জনসংখ্যার এক কোটিরই কোন বসতবাড়ি নেই। অন্যের আশ্রয়ে, সরকারি খাস জমি বা শহরাঞ্চলের বস্তিতে তারা যে নাজুক পরিবেশে বসবাস করে তা রীতিমতো অমানবিক এবং দুঃসহ যন্ত্রণার শামিল। রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলাসহ ছোট বড় ৫২২টি শহরে বর্তমানে বসবাস করে প্রায় সাড়ে ৩ কোটি মানুষ। নগরকেন্দ্রিক জনসংখ্যার হার বৃদ্ধির বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী ২০১৫ সালে শুধু শহরাঞ্চলের জনসংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ৮ কোটিতে। অপরিকল্পিত নগরায়ন ও এর পাশাপাশি জনসংখ্যা বৃদ্ধির

এই হারের ফলে রাজধানী ঢাকা এখন জনসংখ্যায় বিশ্বের ১৯তম শহরে পরিণত হয়েছে। নদীভাঙন, জলোচ্ছ্বাস, উপকূলীয় ভাঙন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং অগ্নিকাণ্ডে সর্বস্বান্ত মানুষগুলো মাথা গোঁজার ঠাঁই ও বেঁচে থাকার অবলম্বন খুঁজতে ছুটে আসছে ঢাকাসহ বড় বড় শহরে। শহরে এসে তারা পূতিগন্ধময় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে গড়ে ওঠা বস্তি সহ রেললাইন বা নর্দমার ধারে ঝুপড়িতে গাদাগাদি করে মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। গৃহহীন, সহায়-সম্বলহীন এসব অসহায় দুঃস্থ মানুষের নেই বিশুদ্ধ খাবার পানির সংস্থান, নেই স্যানিটেশন বা পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা, নেই স্থায়ী কাজের সংস্থান। তাদের মধ্যে পুরুষদের কেউ কেউ রিকশা-ভ্যান-ঠেলাগাড়ী চালিয়ে, কেউবা কুলি-মজুরের কাজ করে, কেউ ফেরি করে মাছ-তরকারি সহ অন্যান্য জিনিসপত্র বিক্রি করে, কেউ গার্মেন্টসসহ বিভিন্ন কলকারখানা, হোটেল-রেঁস্তোরায় শ্রমিকের কাজ করে, আবার কেউ নানা অপরাধের সঙ্গে মিশে গিয়ে জীবন নির্বাহ করে। মেয়েদের অনেকেই বিভিন্ন গার্মেন্টস ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কাজ করে, কেউবা বাসাবাড়ির ঝি'র কাজ করে, কেউ হোটেলে মশলা বেটে, মেসে রান্না করে আবার কেউ রূপ-যৌবন বিক্রি করেও জীবনকে টিকিয়ে রাখছে এ মহানগরীতে।

কিন্তু গৃহহীন অসহায় দুঃস্থ-নিঃস্ব এ বিরাট জনগোষ্ঠীর মাথা গোঁজার ঠাঁই বা তাদের বেঁচে থাকার ন্যূনতম কাজের সংস্থান করে দিতে সরকারের পরিকল্পনা কোথায়? এ নিয়ে বাস্তবধর্মী কোন চিন্তা-ভাবনাও সরকারের আছে বলে লক্ষ্য করা যায় না। অন্যদিকে বেসরকারী খাতেও নতুন কর্মসংস্থানের কোন সুযোগ উল্লেখ করার মতো নেই। দেশে বিনিয়োগের সুযোগ থাকলে কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি হয়। বিনিয়োগ মন্দার কারণে দেশের ব্যাংকগুলোতেও অলস অর্থের পাহাড় গড়ে উঠেছে। ঋণের সুদের হার কমাবার পরও তুলনামূলক ভাবে বেসরকারী খাতে বিনিয়োগ বাড়ছে না। ব্যাংকারদের মতে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি, অবকাঠামোগত অসুবিধা, সরকারী সেবা খাতে দুর্নীতি ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ইত্যাদি কারণে দেশী উদ্যোক্তারাও বিনিয়োগে নিরুৎসাহিত হচ্ছে।

২০০৪ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর একটি দৈনিকে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দক্ষতার অভাবে বাংলাদেশ বিশ্ব ব্যাংকের ১৭

হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন সহায়তা ও ঋণ ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়েছে। রাজনৈতিক অস্থিরতা, সরকারি নীতির পরিবর্তন, দুর্নীতি, আমলাতন্ত্র, সামাজিক প্রতিবন্ধকতা, ম্যাচিং ফান্ডের অভাব ও দুর্বল প্রতিষ্ঠানের কারণে এই বিপুল পরিমাণ সহায়তা ব্যবহার করা যায়নি। বিশ্বব্যাংক সূত্র জানায়, ১৯৭২ সাল থেকে ২০০৪ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ ২শ' কোটি মার্কিন ডলার বা প্রায় ১৭ হাজার কোটি টাকার সহায়তা ও ঋণ ব্যবহার করতে পারেনি। উল্লেখিত সময়ে বিশ্বব্যাংক ১ হাজার ১৪২ কোটি ২৪ লাখ মার্কিন ডলারের সহায়তা ও ঋণ দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু ওই সময়ে প্রকৃত সহায়তা মিলেছে ৮৬০ কোটি ৭৪ লাখ ডলার। বিশ্বব্যাংক স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকে বাংলাদেশে পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো উন্নয়ন, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাত উন্নয়ন, জনপ্রশাসন ও আর্থিক খাত সংস্কারে সহায়তা দিয়ে আসছে। তবে এটা একজন সচেতন নাগরিক বোঝে যে, ঋণ ও সহায়তার সদ্ব্যবহারের জন্য ঋণ ও সহায়তা দাতার শর্ত যত কঠিন হোক না কেন, দরিদ্র জাতির দারিদ্র্য বিমোচনের স্বার্থে শর্তের কাঠিন্যকে জয় করতে সক্ষম হতে পারলে এত টাকা ফেরত যেতো না বা দাতারা তা' ব্লক করে রাখতো না। **ঋণ ও সহায়তার অর্থ ছাড়করণে শর্ত যদি সে অর্থের সদ্ব্যবহারের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির শর্ত হয়ে থাকে তবে সে ঋণ ও সহায়তা গ্রহীতা তাকে কঠিন বলে জাতীয় লক্ষ্য (যদি থেকে থাকে) থেকে নিজেদের বিচ্যুত করবে কেন?**

বড় দুঃখের বিষয় হল, উন্নত দেশগুলোর মত বাংলাদেশের বিরোধী দলগুলো সরকারের অর্থনৈতিক সাফল্য ও ব্যর্থতার সমালোচনা জনগণের সামনে উপস্থাপনের পাশাপশি তাঁরা ক্ষমতায় গেলে কি ধরনের অর্থনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করবেন তা' দেশবাসীকে জানাতে অভ্যস্ত নয়। দেশবাসী সরকার বিরোধীদের ছায়া মন্ত্রীসভার কথা শুনতে চায়। দারিদ্র্য নিরসন, অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ, বেসরকারীকরণ, বেকারত্ব দূরীকরণ, বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা, দুর্নীতি দূরীকরণ, স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ, ক্ষুদে উদ্যোক্তাদের জন্য পুঁজির যোগান, নারীর উন্নয়ন, দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা, পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদির মত কিছু মৌলিক, অর্থনৈতিক বিষয়ে বিরোধী দল কি ধরনের নীতি গ্রহণ করতে চায় তা জনগণকে জানিয়ে দেয়ার সংস্কৃতি আজও পর্যন্ত বাংলাদেশে গড়ে উঠেনি। অন্যদিকে, বাংলাদেশের সরকার বা

সরকারী দল সাধারণতঃ নিজেদের কোন ব্যর্থতাই স্বীকার করতে চায় না। তবুও অন্যান্য ক্ষেত্রের মত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সরকার ঘোষিত সাফল্যের পাশাপাশি সরকার বিরোধীদের সরকার বা সরকারী দলের ব্যর্থতা ও তা' উত্তরণে তাদের কর্ম পরিকল্পনার কথা জনগণকে অবহিত করলে গণবিতর্কের ভিত্তি অর্থপূর্ণ হতে পারতো; নিজেরা স্বাধীন ভাবে নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরাই নিতে সক্ষম হতে পারতো এবং দেশে গণতন্ত্র, সমাজ ও মানব উন্নয়নের ভিত্তি টেকসই হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা সহজ হতো।

টেকসই উন্নয়নের জন্য উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রয়োজন। কিন্তু শুধু ভাল প্রবৃদ্ধিই উন্নয়নের একমাত্র উপাদান নয়। অর্থনীতির বাইরেও নানা উপাদান রয়েছে যার সব মিলে মানুষের স্বাধীনতা সহ অন্যান্য মানবাধিকার নিশ্চিত করতে পারে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ফসল বিচ্ছিন্ন ভাবে জনগণের ঘরে পৌছাতে পারে না; বরং তা' হতে গেলে সমাজে বৈষম্যই বাড়ে এবং আরও বাড়ে সামাজিক অস্থিতিশীলতা ও অশান্তি। ফলে, বিদ্যমান সামাজিক মূল্যবোধের পুঁজিটুকুও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সে কারণেই প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি সামাজিক ন্যায়বিচারের বিষয়টিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। তবে এটা সত্যি যে, দারিদ্র্য দূর করতে হলে ভাল মানের প্রবৃদ্ধি চাই। তা না হলে সামাজিক উন্নয়ন খাতে বাড়তি সরকারি ব্যয় সম্ভব নয়। নব্বইয়ের দশকের শেষার্ধে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির হার বরাবরই পাঁচ শতাংশের বেশীতে উন্নীত হয়নি। বন্যার কারণে আটানব্বই-নিরানব্বই অর্থ-বছরে প্রবৃদ্ধির হার পাঁচ শতাংশের সামান্য কমে (৪.৮৭%) নেমে যায়। ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে তা' হয়েছিল ৫.৯৪ শতাংশ হারে। ২০০১-২০০২ অর্থ-বছরে এই প্রবৃদ্ধি ৬.৪ শতাংশে উন্নীত হয়। ২০০২-০৩ অর্থ-বছরে তা কমে আবার ৪.৪ শতাংশে দাঁড়ায়।

২০০৩-০৪ অর্থ বছরে প্রবৃদ্ধি ৫.৫ শতাংশ হয়েছিল। কিন্তু ২০০৪ সালের দু'তিন দফা বন্যা ও অতিবৃষ্টির কারণে ২০০৪-০৫ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার পাঁচ শতাংশের নিচে থাকবে বলে অর্থনীতিবিদ এবং দাতা সংস্থার বিশেষজ্ঞরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। বন্যা-পরবর্তী অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের কাজটি নির্বিঘ্ন ভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হলে প্রবৃদ্ধির ঘাটতি কিছুটা পূরণ হতে পারে। তবে এ প্রবৃদ্ধি দেশের খসড়া দারিদ্র্য বিমোচন তথা উন্নয়ন কৌশলপত্রের প্রস্তাবিত হার থেকে অনেক কম। তাতে ২০০৪ সালে অন্ততঃ ৬ শতাংশ, ২০০৫ সালে ৬.৫ শতাংশ, ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ৬.৮ শতাংশ এবং ২০০৮

অর্থবছরে ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করার কথা রয়েছে। আর তা' অর্জিত না হলে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যও অর্জন সম্ভব হবে না। ২০০১-২০০৩ এ তিন বছরের দারিদ্র্য নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাবিত প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় না। মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্যে (Millenium Development Goal) এক নম্বরের অঙ্গীকার হচ্ছে, নব্বই সালে দারিদ্র্যের যে হার ছিল তা ২০১৫ সালে অর্ধেকে নামিয়ে আনতে হবে। সে সময় বাংলাদেশের দারিদ্র্যের হার ছিল মোট জনসংখ্যার ৫৯ শতাংশ। অর্থাৎ দারিদ্র্যের হার ৩০ শতাংশ কমাতে হবে এবং ২০০৪ থেকে আগামী ১১ বছরের প্রতি বছরই অন্তত ৩.৩ শতাংশ হারে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার কমাতে হবে। ২০০১ থেকে ২০০৩ পর্যন্ত তিন বছরে সরকার বড়জোর দেড় শতাংশ হারে দারিদ্র্য কমাতে সক্ষম হয়েছে। ২০০৪ সালে বন্যার কারণে এক-দেড় কোটি নতুন দরিদ্র তৈরি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের এক হিসেবে বলা হয়েছে, ২০০৪ সালে মাথাপিছু আয় শতকরা ৪.৫ শতাংশ হারে না বেড়ে তা ৩.৭ শতাংশ হারে বাড়তে পারে। তার অর্থ এই দাঁড়ায়, গরীব মানুষ এ বছর আরও বেশি গরিব হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। একই সঙ্গে এ আশঙ্কাও রয়েছে যে, দারিদ্র্য সীমার সামান্য ওপরে যারা এমন মানুষের ৫ থেকে ১০ শতাংশ দারিদ্র্যের কবলে পড়ে যাবে। প্রশ্ন হচ্ছে, এ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর এ পতন ঠেকাতে যে পর্যাপ্ত সামাজিক নিরাপত্তা আবশ্যক তা' দিতে সরকারের প্রত্যয়-প্রস্তুতি কতটুকু আছে? বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার সবেচেয়ে বেশি দরিদ্র মানুষের বাসভূমি। দরিদ্র মানুষের সংখ্যার বিচারে পৃথিবীর মধ্যে ভারত ও চীনের পরই বাংলাদেশের স্থান। আর সে কারণেই দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যে জাতীয় যুদ্ধের প্রয়োজন তা' পরিচালনায় সরকারী প্রত্যয়, পরিকল্পনা ও কার্যকলাপ লক্ষ্য করা যায় কি? এর আগের সরকারগুলোর আমলেও তা' পরিলক্ষিত হয়নি। তবে জিনিসপত্রের দাম স্থিতিশীল থাকলে এবং সার্বিক ভাবে সামাজিক নিরাপত্তা ও আইন-শৃংখলা ও শান্তি বজায় থাকলে ক্ষুদে উদ্যোক্তারা সক্রিয় থাকে এবং দরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রা অনিশ্চয়তা ও হাহাকারমুক্ত থাকে। কিন্তু তা' কখনও থেকেছে কি—আছে কি? বরং সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, দুর্নীতিসহ আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির চরম অবনতির কারণে সৃষ্ট নিরাপত্তাহীনতার মত অর্থনীতির বাইরের অনেক উপাদান জোরদার হয়েছে। এদিকে ধনীরা আরও বেশী ধনী হচ্ছে আর গরীবরা গরীবই হচ্ছে।

অর্থাৎ ধনী-দরিদ্রদের বৈষম্য দ্রুত বেড়েই চলেছে। সরকারী তথ্যানুযায়ী ১৯৯১-৯২ সালে বাংলাদেশের জাতীয় আয়ে সমাজের সর্বাধিক বিত্তশালী ৫ শতাংশ পরিবারের হিস্যা ছিল ১৮.৮৫ শতাংশ। ১৯৯৫-৯৬ সালে তা' বেড়ে দাঁড়ায় ২৩.৬২ শতাংশ এবং তার চার বছর পর ২০০০ সালে তা' আরও বেড়ে ৩০.৬৬ শতাংশে উন্নীত হয়। অন্যদিকে একই সময়ে সমাজের সর্বাধিক দরিদ্র ৫ শতাংশ পরিবারের জাতীয় আয়ের হিস্যা ১.০৩ শতাংশ থেকে কমে যথাক্রমে ০.৮৮ এবং ০.৬৭ শতাংশে দাঁড়ায়। এতে দেখা যায়, দেশে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান কিভাবে বেড়ে চলেছে। অতএব, এহেন পরিস্থিতিতে দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে বাংলাদেশের সফলতা স্বপ্ন দেখার মত নয় কি?

সুশাসনের অভাবেই অর্থনীতির সুফল সুষম বন্টন হচ্ছে না! অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এম সাইফুর রহমান বলেছেন, বাংলাদেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সব ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা দরকার। সুশাসনের অভাবেই সামষ্টিক অর্থনীতির সুফল সুষম বন্টন হচ্ছে না। বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য অবকাঠামো ব্যবস্থা এখনও সুসংহত হয়নি শুধু সুশাসনের অভাবে। হোটেল সেনারগাঁওয়ে বাংলাদেশ সরকার, জাপান সরকার ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের যৌথ উদ্যোগে ২০০৪ সালে অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি' শীর্ষক এক সেমিনারে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি একথা বলেন। অর্থমন্ত্রী প্রধান অতিথির ভাষণে আরও বলেন, বাংলাদেশে প্রচুর রাস্তাঘাট তৈরি করা হচ্ছে। চাষাবাদের জমির মধ্যেও অপরিকল্পিত ভাবে বাড়িঘর, রাস্তাঘাট তৈরি করা হচ্ছে। ফলে, পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তিনি বলেন, পরিকল্পনা কমিশনে এমন অনেক প্রকল্প আসে যা রাজনৈতিক ভাবে তৈরি। কিন্তু এসব প্রকল্প সুদূরপ্রসারী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তেমন কোন প্রভাব রাখবে না। স্থানীয় সরকারের সমালোচনা করে অর্থমন্ত্রী বলেন, মুখে বলা হচ্ছে স্থানীয় সরকার। কিন্তু পৌরসভা, মিউনিসিপ্যালিটি চালাতে হয় কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা দিয়ে। স্থানীয় সরকার নির্বাচনের আগে জনগণকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়, আগামীতে কোন কর দেয়া লাগবে না। কিন্তু নির্বাচনের পরই টাকার জন্য চলে আসে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। যে স্থানীয় সরকার নিজে আয় করতে পারবে না সেটা স্থানীয় সরকার হয় কিভাবে?

নব্বইয়ের দশকের প্রথমার্ধে রফতানির হার ছিল জিডিপির ৮.৬ শতাংশ, শেষার্ধে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ১২.৭ শতাংশ এবং রফতানির এ তেজীভাব ২০০১-২০০৪ পর্যন্তও অব্যাহত থাকায় রফতানির হার শতকরা ১৫ শতাংশে উন্নীত হয়। এক্ষেত্রে গার্মেন্টস খাতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য। ২০০৫ সালের শুরু থেকে কোটামুক্ত প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে বাংলাদেশ এই সাফল্য কতটা ধরে রাখতে পারবে? ২০০৪ সাল শেষ হতেই 'মাল্টি ফাইবার অ্যারেঞ্জমেন্ট' (এমএফএ) যুগের অবসান ঘটবে এবং গার্মেন্টস রফতানীতে কোটা পদ্ধতি উঠে যাবে। অথচ তারই প্রাক্কালে ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প গড়ার জন্য সরকার তোড়জোর শুরু করে। প্রশ্ন হচ্ছে, গত দশ বছর ধরে দেশের সরকার কি করেছেন? এদিকে ২০০৪ সালের নভেম্বর অর্থাৎ নবযুগের সূচনার মাত্র এক মাস আগেও পরিস্থিতি মোকাবেলার প্রস্তুতি নেই। অথচ এক মাস পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বাজার হাতছাড়া হতে চলেছে, কমপক্ষে এক হাজার গার্মেন্টস বন্ধ হতে যাচ্ছে এবং কমপক্ষে তিন লাখ শ্রমিক বেকার হবার আশংকা দেখা দিয়েছে। ফলে, দেশের অর্থনীতি এক বড় ধরনের ধাক্কার মুখোমুখি হবার উপক্রম হয়েছে।

রফতানির পাশাপাশি বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের পাঠানো রেমিটেন্স ২০০১ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত অনেক বেড়েছে। তিন বিলিয়ন ডলারেরও বেশি হয়েছে। ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ার বিপর্যয়ের পর থেকে অর্থ স্থানান্তরে কড়াকড়ি এবং ব্যাংকিং চ্যানেলে অর্থ প্রেরণের ওপর জোর দেয়ায় ইতালি, কানাডা, মধ্যপ্রাচ্য ও সিঙ্গাপুরে সরকারি ব্যাংক চালু করার সরকারি উদ্যোগের সফল বাস্তবায়ন এবং প্রবাসী ভাই-বোনদের সক্রিয় অবদানের কারণে ২০০১ থেকে ২০০৩ পর্যন্ত এ তিন বছরে এ খাতের প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য হারে ভাল হওয়ায় দেশের লেনদেনের ভারসাম্য পরিস্থিতির উন্নতি হলেও বিদেশী মুদ্রার মজুদ তিন বিলিয়ন ডলার যথেষ্ট নয়। পরিবর্তিত এ বিশ্বে এ মুজদ ন্যূনতম পাঁচ-সাত বিলিয়ন হওয়া উচিৎ নয় কি? এছাড়া বৈদেশিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের ভারসাম্য যেভাবে বিপরীতে চলে গেছে তাকে উপযুক্ত পর্যায়ে আনতে হলে রফতানি আরও বাড়াতে হবে। রফতানি বাড়ানোর জন্য এখনও পর্যন্ত আর্থিক খাতের সংস্কার যথাযথ এগুচ্ছে বলে কি দাবি করা যায়? দেশে আমদানীর চেয়ে রফতানী এত কম যে, বছরে ঘাটতি দাঁড়ায় চব্বিশ হাজার কোটি টাকা।

বর্তমান সরকার ব্যাংকিং খাতের যে সংস্কার হাতে নিয়েছে তার পুরো উদ্যোগই বাইরে থেকে এসেছে। দেশজ ব্যাংকিং সংস্কার কমিটির প্রস্তাব মতো ব্যক্তি খাতের ব্যাংকগুলোর সংস্কারে যে সুফল পওয়া গিয়েছিল সে কথাটি মনে না রেখে সরকার বাইরের চাপিয়ে দেয়া ব্যাংকিং সংস্কারের যে পথ বেছে নিয়েছে, অর্থনীতিবিদদের মতে, তাতে বরং এ খাতের বিশৃঙ্খলা ও অস্থিতিশীলতার আশংকাই লক্ষণীয়। তাঁরা এও বলেন, ২০০১ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত তিন বছরে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকিং খাতের অবস্থা শোচনীয় অবস্থায় দাঁড়িয়েছে। কারণ, তাতে দুর্নীতি ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপও বেড়েছে। ব্যাংকারদের মনোবল ভেঙে পড়েছে। অথচ সরকারি খাতের ব্যাংকগুলোয় দেশজ সংস্কার সম্ভব। সরকার সে পথে চলেনি। মালিকানা বদল হলেই ব্যাংকিং খাতের কাঙ্ক্ষিত উন্নতি হবে এ কথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। প্রতিবেশী দেশ ভারতে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের ব্যাংকগুলো যথেষ্ট গতিশীলতার পরিচয় বহন করছে। কিন্তু বাংলাদেশ একেবারে ভিন্ন পথে কেন চলতে যাচ্ছে সে প্রশ্নের সঠিক উত্তর কে দেবেন?

ব্যাংকিং খাতের গতিশীলতার সঙ্গে বিনিয়োগের প্রশ্নটি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। আর বিনিয়োগ না বাড়ালে কর্মসংস্থানও হবে না। আদমজী জুটমিল, চট্টগ্রাম স্টিল মিলস, খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস, চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। লক্ষ লক্ষ লোক বেকার হয়েছে। এখনও এসব মিলের হাজার একরের ওপর জমি অকেজো পড়ে আছে। এ জমিতে ব্যক্তি খাতে নয়া শিল্প-কারখানা গড়ে উঠতে পারতো। দেশে বছরে দশ লাখের মত নয়া মুখ শ্রম বাজারে ঢোকার চেষ্টা করছে। কিন্তু বিনিয়োগে স্থবিরতার কারণে তাদের আর নতুন কাজ মিলছে না। বরং পুরনো চাকুরেদের কাজ চলে যাচ্ছে। বেকারত্ব তাই তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশে বেকারত্ব অনেক বেড়েছে। সমাজে এর প্রভাব প্রকট আকার ধারণ করেছে। সন্ত্রাস, চাঁদাবাজির পেছনে বেকারত্বের বড় ভূমিকা রয়েছে বলে সমাজ বিশ্লেষকরাও মনে করেন। সঙ্গে যুক্ত হয়েছে উচ্চতর মুদ্রাস্ফীতি। ২০০১-২০০৩ এর মুদ্রাস্ফীতির হার ৫.১ শতাংশ বেড়ে ২০০৪-২০০৫ সালে তা ৬ শতাংশ ছাড়িয়ে যাবার আশংকা রয়েছে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস তথা খাদ্য দ্রব্যের মূল্য গরীব-সাধারণের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে বিরাজ করছে। অথচ গরীব মানুষের ওপর ভ্যাটের চাপও বেড়েছে। ধনীদের আয়করের হার কমেছে! প্রকৃত অর্থে দেশে ধনী-দরিদ্রের আয়ের বৈষম্য দ্রুত বেড়েই

চলছে। এ ধরনের আরও সমস্যার মধ্যে দেশের অর্থনীতিকে কিন কিন ঝুঁকিপূর্ণ হতে দেয়া বিপজ্জনক নয় কি? বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়েছে—ভাল কথা। বিশেষজ্ঞদের প্রশ্ন হচ্ছে, এই রিজার্ভের কোলাটারেল মূল্য কি সরকার আদায় করতে পেরেছে? এ রিজার্ভ-ডলারের বিনিময়ে কি বেশী বেশী পুঁজি ও ইকুইপমেন্টের পণ্য আমদানি করে দেশের ভেতরে বিনিয়োগ বাড়ানো সম্ভব হয়েছে? বিনিয়োগ বাড়িয়ে কি অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়া গেছে? বাংক ঋণ পদ্ধতিও বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির অনুকূল নয়। বাংলাদেশে বাংক সুদের হারও অত্যধিক, পৃথিবীর আর কোন দেশে বাংক সুদের হার এত বেশী নয়। জাপান ও আমেরিকায় বাংক সুদের হার এক শতাংশেরও কম। প্রতিবেশী ভারত, এমনকি পাকিস্তানেও বাংক সুদ বাংলাদেশের চেয়ে অনেক কম। সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান ও থাইল্যাণ্ডে বাংক-সুদের গড় হার ৫%। অতএব, বিনিয়োগ তথা কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে বাংক-সুদের হার বাস্তবধর্মী করা উচিৎ নয় কি?

দশ

কর-নীতি শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানে অনোপযোগী

বাংলাদেশ সরকারের রাজস্ব আয়ের প্রায় শতকরা পঞ্চাশ ভাগ আসে আমদানী খাত থেকে। ব্যক্তি-কর থেকে আসে মাত্র ছয় শতাংশ। এর প্রধান কারণ, জনগণের অধিকাংশই 'প্রত্যক্ষ কর' (Direct Tax) প্রদান করে না। এটা কি জনগণের সদিচ্ছার অভাব বা কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা ? অনেকে তা' মনে করলেও আসলে তা সঠিক নয়। বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু বাৎসরিক গড় আয় মাত্র ৩৭০ ইউএস ডলার অথবা ২২ হাজার টাকার মত। কিন্তু সরকারের ট্যাক্স সিলিং হচ্ছে এক লাখ টাকা। অর্থাৎ কারও আয় এক লাখ টাকার বেশী হলেই কেবল তার ওপর সরকারকে কর দিতে হয়। এমতাবস্থায় এটা স্পষ্ট যে, দেশের সিংহভাগ মানুষের কর দেয়ার মত আয় হয় না; বা তাদের ততটা আয় করার সুযোগ নেই। এক কথায়, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্মক্ষম মানুষ অর্থনৈতিক দৈন্যতার মাঝেই কালাতিপাত করে।

কর্মসংস্থানের অভাবে তাদের কর্মক্ষমতা যথার্থ ব্যবহার করার পর্যাপ্ত সুযোগ সেই বিধায় তেমন আয় করার সুযোগও তারা পায় না।

দেশের কর্মক্ষম অথচ বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থান করা সরকারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গণতান্ত্রিক ও অগণতান্ত্রিক কোন সরকারই এ যাবৎ সে দায়িত্বটা পালনে সক্ষম হয়নি। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে, সরকারের কর-নীতি বা ব্যবস্থা। সরকার তার বিভিন্নমুখী আয়ের জন্য আমদানি শুল্কের ওপর যতটা নির্ভরশীল; আয় করের ওপর ততটা নয়। সরকারের বাস্তবতাবিমুখ কর-নীতি বা ব্যবস্থার কারণে দেশের শিল্পায়নে কাংখিত প্রসার ঘটেছে না বরং তা' সংকুচিত হয়ে পড়ায় দেশের বর্তমান বেকারত্ব পরিস্থিতি আশংকাজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচাইতে ঘন বসতিপূর্ণ একটি দেশ। প্রায় ১৪ কোটি মানুষের এ কৃষি নির্ভর দেশটিতে বেকারত্ব এক বিরাট সমস্যা। কৃষি ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হলেও তার জন্য আজও পর্যন্ত উপযুক্ত পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। কৃষির আধুনিকায়ন ও কৃষিভিত্তিক শিল্পায়নে ব্যাপকতা আনা সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে, অকৃষি শিল্প খাতেও স্থবিরতা লক্ষণীয়; বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশ ও অবকাঠামোর অভাবে নতুন উদ্যোগ বা উদ্যোক্তার অভাব বিরাজমান এবং শিল্পায়ন বা শিল্পের প্রসার মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়। শিল্পে প্রয়োজন এমন অনেক কাঁচামাল বাংলাদেশে উৎপাদিত হয় না বা তা' করা সম্ভব নয়। সেজন্য ওসব কাঁচামাল অবশ্যই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। **কিন্তু সরকার শিল্পের এসব কাঁচামাল আমদানি শুল্কে কোন রেয়াত দেয় না।** ফলে, আমদানীকৃত কাঁচামালের মূল্য পড়ে বেশী। আর এ উচ্চমূল্যের কাঁচামালে উৎপাদিত শিল্প দ্রব্যের ব্যয়ও পড়ে বেশী। তাছাড়া, এ উচ্চ উৎপাদন-ব্যয়ের সঙ্গে অবকাঠামোগত সমস্যাবলীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও প্রতিকূল প্রভাব তো রয়েছেই। অতএব, এসব শিল্প-পণ্যের মূল্যও বেশী হতে বাধ্য। এসব কারণে অনেক ক্ষেত্রে এসব শিল্প-দ্রব্যাদির গুণগত মানও যথাযথ রক্ষা পায় না। ফলে, এ উচ্চ মূল্যের কিন্তু অপেক্ষাকৃত নিম্ন-মানের শিল্প-পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টেকে না এবং দেশীয় বাজারেও কম মূল্যে আমদানীকৃত মানসম্পন্ন পণ্যের কাছেও মার খায়।

পোশাক শিল্পে বাংলাদেশ যে সফলতা অর্জন করেছে তার প্রধান কারণ হচ্ছে— এ শিল্পের কাঁচামাল আমদানিতে শিল্পপতিদের কোন শুল্ক দিতে হয় না। 'বন্ডেড ওয়ার হাউস' এর মাধ্যমে সরকার শুল্ক মওকুফের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। ফলে, পোশাক শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে এবং ফলে, জাতীয় আয়ে এ শিল্পের অবদানও উল্লেখযোগ্য। গার্মেন্টস শিল্পপতিরা সরকারকে করপোরেট ট্যাক্স পরিশোধ করেন। তাঁরা নিজেরা এবং তাঁদের উচ্চ বেতনভুক কর্মচারীরাও সরকারকে আয়কর পরিশোধ করেন। এছাড়া, এ শিল্পে বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ব্যবহার করা হয়। তা থেকেও সরকার উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রাজস্ব পায়। সর্বোপরি, ব্যাপক ভাবে প্রসারিত গার্মেন্টস শিল্পে প্রায় বিশ লাখ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছে ; ওসব শ্রমিকদের আয় বেড়েছে বলে তাদের বেঁচে থাকার একটা উপায়-অবলম্বনও হয়েছে। ক্রয়-ক্ষমতা অর্জনের ফলে তারা বাজারে ভোগ্যপণ্যের ওপর আরোপিত ভ্যাটে ব্যাপক ভাবে অংশগ্রহণ করে; অর্থাৎ Indirect Tax (পরোক্ষ কর) পরিশোধ করে।

পোশাক শিল্পের ব্যাপকতা ও তাতে আর্জিত সফলতার আলোকে যদি সরকার অন্যান্য শিল্পে আমদানীযোগ্য সব ধরনের কাঁচামালের ওপর থেকেও শুল্ক উঠিয়ে নেয় তাহলে দেশের অর্থনীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটতে পারে। যেসব পণ্য দেশে বিক্রি হবে তার ওপর ভ্যাট হবে আর বিদেশে রপ্তানী পণ্যের ওপর কোন ধরনের ভ্যাট হবে না। তা'হলে শিল্প উদ্যোক্তারা শিল্প প্রসারে উৎসাহীত হবে, পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিতকরণে মনযোগী হবে এবং প্রতিযোগিতামূলক দেশ ও বিদেশের বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের চাহিদাও অনেক বেড়ে যাবে। তখন এটা আশা করা যাবে যে, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের জাতীয় ও মাথাপিছু আয় প্রায় তিন গুন বৃদ্ধি পাবে। আর সরকারকে বর্তমানের মত আমদানী শুল্কের ওপর ততটা নির্ভর করতে হবে না বর্তমানে যতটা করা হয়। তখন সরকারের রাজস্ব আয়ের সিংহভাগ ব্যক্তি-কর থেকেই আসবে। কেননা মানুষ তখন ভাল কর্মসংস্থানের মাধ্যমে কর দেয়ার মত যথেষ্ট আয় করবে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলো কাঁচামালের ওপর আমদানী শুল্ক তুলে দিয়েই শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হয়েছে। মালেয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেই মাত্র পনের বছরে তাদের জাতীয় আয় দশগুন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। অতএব, বাংলাদেশ পারবে না কেন?

এগার

শিল্প-সংকোচন শিল্প খাতে বিরাজমান বিশৃংখলার ফলশ্রুতি

২০০৪ সালের ২০ মার্চ একটি দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুসারে দেশের শিল্প খাতে বিশৃংখল অবস্থা বিরাজ করছে। শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির হার কম। আইন-শৃংখলা পরিস্থিতিও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে শিল্প খাতের ওপর। অবাধ আমদানির ফলে দেশীয় শিল্প পণ্য অসম প্রতিযোগিতার মুখে পড়েছে। ঋণ নীতি সংকোচনের ফলে নতুন শিল্প স্থাপনের ঋণ পওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিধি-নিষেধের কারণে সিন্ডিকেশন ছাড়া বড় অংকের ব্যাংক ঋণ দেয়া যাচ্ছে না। তবে এখনও শিল্প স্থাপনে সিন্ডিকেশন ঋণের পরিমাণ যেমন বাড়েনি, তেমনি শেয়ার বাজার থেকে পুঁজি সংগ্রহের পরিবেশও তৈরি হয়নি। **অপরদিকে সরকারি সেবা খাতের দুর্নীতি ও সেবার মূল্য বৃদ্ধির কারণে শিল্প উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।** এছাড়া, মাত্রাতিরিক্ত মুদ্রাস্ফীতির পাশাপাশি কর্মসংস্থান তেমন না বাড়ার কারণে মানুষের ক্রয়ক্ষমতাও কমে গেছে। সরকারি হিসাবেও শিল্প খাতের প্রকৃত চিত্র পাওয়া যাচ্ছে না। শিল্প খাতে ঋণ বিতরণ, শিল্পের মেশিনারিজ, কাঁচামাল আমদানি বাড়লেও উল্লেখযোগ্য হারে বাড়েনি শিল্প উৎপাদন। ২০০৪-০৫ অর্থবছরের জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত সময়ে শিল্প খাতের উৎপাদন বেড়েছে মাত্র ২ দশমিক ৬২ শতাংশ। এ বৃদ্ধির হার ঋণ বিতরণ ও কাঁচামাল আমদানির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলে মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা। **আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতির কারণে শিল্প পণ্য পরিবহন ও শিল্প স্থাপনের ব্যয় বেড়ে গেছে। কোন এলাকায় শিল্প স্থাপন করতে গেলেই স্থানীয় মাস্তানদের বড় অংকের চাঁদা দিতে হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন দেশের কয়েকজন শিল্পপতি। এছাড়া পণ্যবাহী ট্রাক ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটছে প্রায়ই। সরকারি সেবা খাতের সীমাহীন দুর্নীতি, সেবার মূল্য বৃদ্ধির কারণে শিল্প স্থাপন ব্যয় বেড়ে গেছে বহুগুণ।** ২০০১ থেকে ২০০৪ এ সময়ের মধ্যে বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয়েছে দুই দফা, ওয়াসার পানি, গ্যাস ও জ্বালানি তেলর দাম বেড়েছে এক দফা। এসব কারণে বেড়েছে পরিবহন ব্যয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবসায়ীরা শিল্প পণ্য বাজারজাতকরণে নতুন কৌশল

নিয়েছেন। তারা পণ্যের দাম বাড়ানোর জন্য বাজারজাতকরণের খুচরা ওজন বা একক কমিয়ে দিচ্ছেন।

২০০২-০৩ সালের জুলাই-সেপ্টেম্বর মাস থেকে হঠাৎ করে দেশে শিল্প খাতে ঋণ বিতরণের হার বেড়ে গেছে। ২০০৩-০৪ অর্থবছরের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আগের অর্থ-বছরের একই সময়ের তুলনায় এ বৃদ্ধির হার ছিল ১০৬ দশমিক ২৯ শতাংশ। ২০০২-০৩ অর্থ বছরের জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত শিল্প খাতে মেয়াদি ঋণ বিতরণ বেড়েছে প্রায় ৭৬ শতাংশ। একই সময়ে ঋণ আদায় কম হওয়া এবং ঋণের ওপর আরোপিত সুদ সহ মাঠ পর্যায়ে বকেয়া ঋণের পরিমাণ বেড়েছে। মধ্যবর্তী শিল্প পণ্য আমদানি এবং এলসি (লেটার অব ক্রেডিট) খোলার পরিমাণ কমেছে। বেড়েছে বিবিধ শিল্পের যন্ত্রপাতি আমদানির পরিমাণ। গত কয়েক বছর ধরে দেশে শিল্পের মেশিনারিজ ও কাঁচামাল আমদানির পরিমাণ বাড়ছে। কিন্তু সে হারে বাড়ছে না শিল্প কারখানা স্থাপন ও শিল্প উৎপাদন। শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য যেসব বিলাসবহুল গাড়ি আমদানি করা হয় সেগুলো শিল্পের যন্ত্রপাতির মধ্যে পড়ে। এর ফলে শিল্পের যন্ত্রপাতি আমদানি বৃদ্ধির হার নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। শিল্পের যন্ত্রপাতির নামে আমদানি হচ্ছে বিলাসবহুল গাড়ি। ফলে, প্রকৃত মেশিনারিজের সঠিক তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। সংশ্লিষ্টরা শিল্প খাতের জন্য প্রকৃত যন্ত্রপাতি ও গাড়ি আমদানিকে আলাদা করে দেখানোর ব্যবস্থা করার দাবি করেছেন। শিল্পের যন্ত্রপাতি আমদানিতে বড় ধরনের ওভার ইনভয়েসিং বা মূল্য বেশি দেখানোর অভিযোগ তো পুরনো। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা বাণিজ্যিক ব্যাংকে ওইসব যন্ত্রপাতির মূল্য সম্পর্কে অভিজ্ঞ জনবল না থাকায় কেউ এর মূল্যায়ন করতে পারছেন না। ২০০৩-০৪ অর্থবছরের জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ২০০২-০৩ অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় দেশে শিল্প উৎপাদন বেড়েছে ২ দশমিক ৬২ শতাংশ। অন্যান্য সময়ে এ বৃদ্ধির হার ছিল আরও বেশি। ২০০৩ সালের অক্টোবরে ২০০২ সালের একই মাসের তুলনায় শিল্প উৎপাদন বেড়েছে ১ দশমিক ২৪ শতাংশ। আগস্টে এ বৃদ্ধির হার ছিল ১ দশমিক ৯৭ শতাংশ এবং ২০০৩ সালের জুনে এ বৃদ্ধির হার ছিল ৫ দশমিক ৭৩ শতাংশ। এদিকে ২০০৩ সালের জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বরের তুলনায় অক্টোবরে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প খাতের তুলনায় ফার্নিচার, কাঠ জাতীয় পণ্য, রাসায়নিক, পেট্রোলিয়াম ও

রাবার জাতীয় পণ্যের উৎপাদন কমেছে। শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির হার কম হওয়ার কারণ হলো, সাম্প্রতিক সময়ে দেশে অনেক সরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। যে হারে শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ হচ্ছে সে হারে নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান চালু হচ্ছে না। আদমজী পাটকল বন্ধ করার পর পাটজাত পণ্যের উৎপাদন কমে গেছে। সার্বিক শিল্প উৎপাদনেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্র জানায়, সাম্প্রতিক সময়ে শিল্প খাতে মেয়াদি ঋণ ও চলতি মূলধন বিতরণের হার বেড়েছে। শিল্পের কাঁচামাল আমদানি বৃদ্ধির হার থেকেই অনুমান করা যায় দেশে শিল্প উৎপাদন বাড়ছে। কিন্তু বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসেবে তা প্রতিফলিত হচ্ছে না। তাদের হিসাবে শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির হার খুবই কম। সরকারি সূত্র জানায়, বর্তমানে শিল্প ঋণ বিতরণের প্রভাব শিল্প খাতে পড়বে কিছুদিন পর। শিল্প প্রসারের স্বার্থে শিল্প খাতে বিরাজমান বিশৃংখলা দূর করা জরুরী নয় কি?

বার

কৃষি খাত অবহেলিত—আধুনিকায়নের গতি মন্থর

পৃথিবীর সব উন্নত দেশই তাদের উন্নয়নের প্রাথমিক সোপান হিসেবে পরিকল্পিত কৃষি উন্নয়নের ওপরই সবচেয়ে বেশি মনযোগ দিয়েছে। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে শুরু করে ইউরোপের প্রায় সব দেশ এবং পূর্ব-উত্তর দিকে দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, চীন ইত্যাদি দেশ কৃষির বিভিন্ন ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি ও পদ্ধতি ব্যবহার করে দেশের অর্থনৈতিক ভিত তৈরি ও মজবুত করার পর শিল্প উন্নয়নে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণে অগ্রসর হয়। নতুন মিলেনিয়াম শুরুর প্রায় দশককাল আগে থেকেই উন্নত দেশগুলোর প্রায় সবকটি (প্রতিবেশী ভারতের বেশ কয়েকটি প্রদেশ সহ) দেশে আইসিটি নির্ভর প্রযুক্তি ব্যবহার করে উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রকে অধিকতর বিকশিত ও উন্নত করার কাজ এগিয়ে নেয়ার কাজে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছে। উপরোক্ত দেশগুলোর উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে বেগবান করেছে সঠিক তথ্য বা উপাত্ত। কৃষি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য বা উপাত্তে

বাংলাদেশ এখনও খুবই দুর্বল। তার পাশাপাশি অদক্ষ ব্যবস্থাপনার কারণে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে স্থবিরতা বিরাজমান। জাতির দুর্ভাগ্য, কৃষিনির্ভর দেশ হিসেবে এ বিষয়গুলোর ওপর গত এক-দেড় দশকে যতটুকু মনযোগ ও গুরুত্ব প্রদান করার কথা ছিল সংশ্লিষ্টরা তা' দেননি; বরং কম গুরুত্বপূর্ণ এবং ক্ষেত্রবিশেষে অপ্রয়োজনীয় কাজে নিজেদের অনেক বেশী ব্যস্ত রেখেছেন। সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ, পদযাত্রা ইত্যাদি কাজকর্মে অত্যধিক জড়িত থেকেছেন তাঁরা। কিন্তু কৃষি বিষয়ে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করার সময়টা করে নেননি।

দু'দশক আগে ঢাকা থেকে প্রকাশিত জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের উন্নয়ন বিষয়ের সব তর্ক-বিতর্ক ঘুরেফিরে **'জন, জমি আর জল'** এ তিনটি বিষয়ের ওপরই আবর্তিত হয়। কেননা এগুলোই হচ্ছে এদেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ এবং অন্য কথায়, এগুলোই আবার অদম্য সমস্যাও বটে।

২০০৩-২০০৪ অর্থবছরের কৃষি খাতে ৩০০ কোটি টাকার ভর্তুকি বিষয়ে যে বাস্তব চিত্র পাওয়া যায় তা' অবশ্যই কৃষির প্রতি অবহেলারই চিত্র। সে বছরের তিনশ' কোটি টাকা ভর্তুকির মধ্যে সর্বসাকুল্যে কৃষি মন্ত্রণালয় পেয়েছে মাত্র ৩১ কোটি টাকা, আর বাকি ২৯৬ কোটি টাকার সিংহভাগ দেয়া হয় তিতাস/বাখরাবাদ গ্যাস কোম্পানি তথা জ্বালানি মন্ত্রণালয়কে সার উৎপাদনে ভর্তুকি হিসেবে। নতুন অর্থবছরে (২০০৪-২০০৫) প্রস্তাবিত ৬০০ কোটি টাকা ভর্তুকির বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণায়ের ভাগে কত টাকা আসতে পারে, এ প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে যতটুকু জানা যায় তাতে নতুন বছরেও গতবারের (২০০৩-২০০৪) তুলনায় অনধিক ৭০ কোটি টাকা পাওয়া যেতে পারে আর বাকি ৫৩০ কোটি (কম-বেশী) টাকা যাবে মূলত জ্বালানী মন্ত্রণালয় খাতে রাসায়নিক সার উৎপাদনে কম মূল্যে গ্যাস সরবরাহজনিত ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য ভর্তুকি হিসেবে। **প্রশ্ন হচ্ছে, রাসায়নিক সার উৎপাদনে গ্যাস সরবরাহে সংশ্লিষ্ট ঘাটতি বা ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা কৃষি খাতে ভর্তুকি হিসেবে বিবেচনা করা সমীচীন কি?** কৃষিনির্ভর দারিদ্র্যতাড়িত এবং বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার শিকার এ অতি মন্থর উন্নয়ন গতি সম্পন্ন বাংলাদেশের স্থায়ী উন্নয়ন সাধন নিশ্চিত করতে কৃষি সেক্টরকে এখনও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে

বিবেচনা করে কৃষি উন্নয়নে গতি সঞ্চারের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না কেন? অথচ এ বিষয়ে অর্থমন্ত্রীর ২০০৪-২০০৫ অর্থবছরের বাজেট (১১-৬-০৪) বক্তৃতার উচ্চারিত প্রত্যয় বাস্তবায়িত হলে আর সে প্রশ্নের কোন অবকাশই থাকে না। তবে কৃষি ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে অর্থমন্ত্রীর উদারতার প্রতিফলন মাঠ পর্যায়ের কৃষি কর্মকর্তাদের মধ্যে লক্ষ্যণীয় নয়। ব্যতিক্রম বাদে, 'ব্যক্তিগত সন্তুষ্টির' আগে সরকারী নীতির কোন উদারতাই তাঁদের মাঝে কাজ করে না। দেশের কৃষির ওপর নির্ভরশীল প্রায় ৭০-৮০ ভাগ জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়ন তথা বাংলাদেশ নামক এ বড় গ্রামটির উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয় দ্রুত কৃষি উন্নয়নে এবং এর আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বিশাল কর্মীবাহিনীকে গতানুগতিক দায়িত্ব পালনের পদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিক পদ্ধতিতে দায়িত্ব পালনে যথার্থ যোগ্য ও দক্ষ করে তোলার ব্যবস্থা আজও পর্যন্ত নিয়েছে কি? সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে কি? আর এ কাজগুলো আধুনিক প্রক্রিয়াভূক্ত করার লক্ষ্যে কৃষি সম্পর্কে মন্ত্রণালয় ও তার আওতাধীন সংস্থাসমূহের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ সহ সংশ্লিষ্ট সবার আধুনিক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করার বিষয়টি জরুরি বলে বিবেচনা করা হয়েছে কি?

কৃষিনির্ভর এ বাংলাদেশের অর্থনীতির উন্নত ভবিষ্যৎ চিন্তা করে পশুসম্পদ, মৎস্য, পোল্ট্রি, উন্নত মানের ধান, শাক-সব্জি, আলু, রসুন-পেঁয়াজ, কলা, পেঁপে ইত্যাদি উৎপাদন বিষয়ে কোন উন্নত দেশের উদ্ভাবিত উপায়, অনুসৃত নীতি এবং অর্থায়ন ও বাজারজাতকরণ পদ্ধতি এবং প্রযুক্তি বিচার-বিশ্লেষণ করে উপযুক্ত নীতি, পদ্ধতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা কি সম্ভব নয়? প্রশিক্ষিত ও দক্ষ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি দেশের অবহেলিত কৃষি সেক্টরে কর্মরত অগণিত কর্মীবাহিনীকেও আধুনিক প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ করে গড়ে তোলা হয়নি কেন? এসব কারণেই রাষ্ট্রীয় নেতা-কর্তাদের 'কৃষি বিপ্লব' কখনও বাস্তবতার মুখ দেখতে পায় না; বক্তৃতা আর কাগজে কলমেই আবদ্ধ থেকে গেছে তাঁদের 'কৃষি বিপ্লব'। বাংলাদেশের মতো আয়তনে ছোট, কৃষিনির্ভর, বিপুল জনসংখ্যা ভারাক্রান্ত কিন্তু অত্যন্ত উর্বর জমিসমৃদ্ধ দেশটির দ্রুত কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে যুগোপযোগী বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার যথাযথ বাস্তবায়ন অত্যন্ত জরুরী। আর তার পূর্বশর্ত হিসেবে দেশে কৃষি

জমির পরিমাণ, জমির রকম, আঞ্চলিক (জেলা/উপজেলার) মাটির উর্বরতা শক্তি, সেচের প্রয়োজনীয়তা এবং বিদ্যমান সেচ ব্যবস্থার ধরণ-ধারণ, সার ও বীজের চাহিদা, কৃষি ঋণের প্রয়োজনীয়তা ও পরিমাণ, উৎপাদিত কৃষিপণ্যের পরিমাণ এবং এসবের বাজারজাতকরণ, সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের হালনাগাদ অবস্থা এবং উদ্বৃত্ত কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণের জন্য গৃহীতব্য ব্যবস্থাদি, কৃষিপণ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা এবং বিদ্যমান সংরক্ষণ ব্যবস্থার কার্যকারিতা ইত্যাদির ওপর যে সব মূল্যায়ন ও গবেষণার কথা জানা যায় তাতে প্রাপ্ত সুপারিশগুলোর রূপায়ন হয় না কেন? দেশের প্রায় ১৪ কোটি মানুষের স্বার্থে কৃষি উন্নয়নের গতি সঞ্চারের লক্ষ্যে বিদেশে কৃষিপণ্য রফতানির পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি এবং তাতে প্রয়োজনীয় সরকারী সমর্থনে বিরাজমান ঘাটতি দূর করা জরুরী। অতীতে বিশ্বব্যাংকসহ বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার বিপুল অর্থায়নে Agriculture Sector Review সহ ডজন ডজন সমীক্ষা চালানো হয়েছে। তাতে অনেক সুপারিশও প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমানেও খামারবাড়িতে একাধিক কনসাল্টিং ফার্ম ও বিশেষজ্ঞ কৃষিসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেশ ব্যয়বহুল গবেষণা কাজে ব্যস্ত রয়েছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, এসব কাজে নিট ফলাফল কি? কৃষি প্রধান দেশে কৃষিতেই কাংখিত উন্নতি সাধিত হয়নি; কর্মসংস্থানের পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি। ফলে, গ্রামের লাখ লাখ বেকার শ্রমজীবী মানুষের জীবন-জীবিকার প্রধান উপায় এখনও শহর-উপশহরের রিক্সাই। **কৃষি উন্নয়নে যথার্থ ও প্রয়োজনীয় মনোযোগ দিলে এসব রিক্সা-চালকদের বিকল্প কর্মসংস্থান কৃষি খাতেই করা সম্ভব।**

তের

স্থল-বন্দরগুলোর বিদ্যমান অবস্থা মর্মান্তিক

২০০৪ সালের ৯ সেপ্টেম্বর একটি দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নানা সমস্যায় জর্জরিত দেশের সীমান্তবর্তী ২৮টি স্থল বন্দর অচল হওয়ার উপক্রম হয়েছে। স্বাধীনতার তেত্রিশ বছরেও ওসব বন্দরের

অবকাঠামোগত কোন উন্নয়ন হয়নি। আধুনিক কোন সুযোগ-সুবিধাও নেই এসব স্থল বন্দরে! অধিকাংশ বন্দরের আশপাশের ১০ থেকে ১২ কিলোমিটারের মধ্যে কোন ব্যাংক নেই। নেই কোন টেলিফোন সুবিধা, পণ্য পরীক্ষার জন্য নেই কোন যন্ত্র। নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুতের সমস্যা তো লেগেই আছে। এসব স্থলবন্দরের কাছাকাছি কোন ওয়্যার হাউস না থাকায় শুল্কায়নের অপেক্ষায় খোলা আকাশের নিচে আমদানি করা পণ্য দিনের পর দিন পড়ে থাকে। এ রকম এক পরিস্থিতিতে বেহাল দশায় চলছে দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থলবন্দরগুলো। অথচ রাজস্ব আয়ের দিক থেকে ওসব বন্দর জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন সীমান্তে স্থাপিত কাস্টমস-এর ১৮০টি বন্দরের শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থা রয়েছে। এর মধ্যে অন্তত ১৫২টি দীর্ঘদিন ধরে নিষ্ক্রিয় রয়েছে। মূলতঃ রাজনৈতিক তদবির, স্থানীয় রাজনীতিবিদ, এমপি ও প্রভাবশালীদের চাপের মুখে ওসব বন্দর খোলা হয়েছিল। স্বাধীনতা-উত্তর বিভিন্ন সময়ে ওসব বন্দর খোলা হয়। কিন্তু অর্থনৈতিক দিকটা বিবেচনা না করেই বন্দর চালুর অনুমতি প্রদান ও বন্দরের অবকাঠামো উন্নয়ন সাধন না করার ফলে ৯০ ভাগ বন্দরই ক্রমশ নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। বর্তমানে ২৮টি স্থল বন্দর দিয়ে আমদানি-রফতানি পরিচালিত হচ্ছে। ২৮টি বন্দরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঃ লালমনিরহাটের সীমান্তবর্তী বুড়িমারী, চাঁপাইনবাবগঞ্জের সোনা মসজিদ, দিনাজপুরের হিলি ও বিরল, বগুড়ার সান্তাহার, কুড়িগ্রামের রৌমারী, সিলেটের তামাবিল, পঞ্চগড়ের বাংলাবান্ধা, কুমিল্লার বিবির বাজার, চুয়াডাঙ্গার দর্শনা, সাতক্ষীরার ভোমরা, নীলফামারীর চিলাহাটি, গোদাগাড়ী উপজেলার গোদাগাড়ী শুল্ক স্টেশন, সিলেটের জকিগঞ্জ প্রভৃতি। কিন্তু এগুলোর অধিকাংশের অবস্থা বেশ নাজুক। অবকাঠামোর অভাবে সরকারের রাজস্ব আদায় চরম ভাবে ব্যাহত হচ্ছে। রাজস্ব আদায়ের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বুড়িমারী স্থল বন্দরে ১২ মাইলের মধ্যে কোন ব্যাংক নেই, কোন বিদ্যুৎ ও টেলিফোন সুবিধা নেই, কাস্টমস কর্মকর্তাদের থাকার কোন আবাসস্থল নেই। অধিকাংশ বন্দর বিভাগীয় শহর থেকে অনেক দূরে থাকায় সেখানে কাস্টমস কর্মকর্তা নিয়মিত অবস্থান করেন না। পণ্য পরীক্ষার জন্য কোন ল্যাবরেটরী না থাকায় আমদানি করা ফলমূলে রোগজীবাণু আছে কিনা তা পরীক্ষা করার যন্ত্র নেই। সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে, ওসব শুল্ক বন্দরের ওয়্যার হাউস না থাকায় আমদানি করা মালামাল খোলা আকাশের নিচে পড়ে

থাকে। এগুলো কাস্টমসের হেফাজতে না থাকায় সিএণ্ডএফ এজেন্টের নিয়ন্ত্রণে থাকে। ফলে প্রতিদিন কি পরিমাণ মালামাল আসে তার হিসাব কাস্টমসের কাছে থাকে না। দেখা যায়, মালামাল এসেছে পাঁচ ট্রাক, কিন্তু কাস্টমস মাত্র এক ট্রাকের শুল্ক পায়। বাকি চার ট্রাক বিনা শুল্কে সরিয়ে ফেলা হয়। বন্দরের কাছে কোন ব্যাংক না থাকায় আমদানিকারকরা যথাসময়ে চালান জমা দিতে পারে না। ফলে, তাদের মালামাল খালাসে বিলম্ব হয়। বুড়িমারী শুল্ক স্টেশন দিয়ে প্রতিদিন ১৫০ থেকে ১৬০টি ট্রাক পণ্য নিয়ে বাংলাদেশে ঢোকে আর বাংলাদেশ থেকে ১০ থেকে ১২টি ট্রাক ভারতে প্রবেশ করে। ২০০২-২০০৩ অর্থবছরে ওই বন্দর থেকে ৪২ কোটি টাকার রাজস্ব আদায় হয়েছিল। বন্দরের অবকাঠামো উন্নয়ন করতে পারলে শুল্ক আদায় কমপক্ষে দ্বিগুণের বেশী হবে। বুড়িমারীর মতো অন্যান্য শুল্ক বন্দরেরও এ করুণ দশা। কাস্টমস-এর কোন নিজস্ব অফিস নেই; নেই কোন আবাস। ফলে, তারা সার্বক্ষণিক ভাবে ওসব বন্দরে দায়িত্ব পালন করতে পারেন না। প্রশ্ন হচ্ছে, এ দুঃখজনক বাস্তবতার নিরীখেও সরকার এখনও কি নিষ্ক্রিয়?

চৌদ্দ

সমুদ্রসীমা ও সমুদ্র বন্দর সর্বোচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ

দেশের বৃহত্তম সমুদ্রবন্দর চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর। তাতে বিরাজমান প্রতিকূল পরিবেশ সম্পর্কে আগেও বলা হয়েছে। খুলনার মঙ্গলা বন্দর দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমুদ্রবন্দর, যাকে সচলই বলা চলে না। তার ওপর যদি বন্দরগুলো মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে পৌছায় তবে তা' দেশের অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক নয় কি? ২০০৪ সালের ৯ সেপ্টেম্বর একটি দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুসারে গত ৬ বছরে বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমার অভ্যন্তরে ২১১টি জলদস্যুতার ঘটনা ঘটেছে। জলদস্যুদের এসব আক্রমণের মধ্যে ৩৪টি ঘটনা তুলে ধরে **'ইন্টারন্যাশনাল ম্যারিটাইম ব্যুরো'** (আইএমবি) বাংলাদেশের সমুদ্র এলাকা ও সমুদ্র বন্দরগুলোকে বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপজ্জনক হিসেবে চিহ্নিত করেছে। সমুদ্রের জলসীমায়

দস্যুদের আক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় বিদেশী জাহাজগুলো বাংলাদেশে না আসার হুমকি দেয়া অব্যাহত রেখেছে। বিদেশী জাহাজগুলো নিরাপত্তার অভাববোধ করছে বলেও বারবার সংশ্লিষ্টদের জানাচ্ছে। বাংলাদেশের সাগর ও বন্দর এলাকায় জলদস্যুতার ওপর আইএমবি'র প্রতিবেদনটি সম্প্রতি নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের এক বৈঠকে উপস্থাপন করার লক্ষ্যে টীম গঠন এবং অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত হয়। আইএমবি'র প্রতিবেদনে বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমার ওপর বিগত ৬ বছরে জলদস্যুতার চিত্র তুলে ধরে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের সাগরে ও বন্দর এলাকায় ১৯৯৯ সালে ২৭টি, ২০০০ সালে ৫৫টি, ২০০১ সালে ২৬টি, ২০০২ সালে ৩২টি, ২০০৩ সালে ৩১টি এবং ২০০৪ সালের জুন পর্যন্ত ৬৫টি জলদস্যুতার ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনার মধ্যে ২৩টি ঘটনা তুলে ধরে প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশের সাগর ও বন্দর এলাকা বর্তমানে বিশ্বের সর্বোচ্চ দ্বিতীয় ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপজ্জনক এলাকা। এতে বলা হয়, বাংলাদেশের সঙ্গে জলসীমায় যেসব বিদেশী জাহাজ মালামাল নিয়ে যাওয়া-আসা করছে সেসব জাহাজের বেশীর ভাগই বাংলাদেশে আসতে চাইছে না। সাগরে জলদস্যুদের আক্রমণকে ভয় পাচ্ছে। বাংলাদেশের সাগরপথকে বিদেশী জাহাজ মালিকরা নিরাপদ মনে করছেন না। দুঃখের বিষয় হলো, দেশের সমুদ্রসীমা বা সমুদ্র বন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ফলে, ক্রমান্বয়ে তা' বিশ্বের দ্বিতীয় ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে দাঁড়ায়। এ প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কি করছেন?

পনের

বিনিয়োগে জটিল পরিবেশ অর্থনীতির গতিরোধক

আসলে, বাংলাদেশের কোন্ পরিবেশটাকে উন্নয়ন-বান্ধব বলা চলে? পরিবেশটা যদি বিনিয়োগ পরিবেশ হয়ে থাকে তবে তা' দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্পে বিনিয়োগের পরিবেশকেই বোঝাবে। বিনিয়োগ দেশী হোক বা বিদেশীই হোক, তার জন্য চাই বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশ। তবে বাংলাদেশের ব্যর্থমান শাসনাধীন অর্থনীতিতে বিনিয়োগে ইচ্ছুকদের কাছে বিনিয়োগ-পরিবেশটাই প্রধান। বাংলাদেশের বিনিয়োগ পরিবেশ নিয়ে দেশ-

বিদেশের সংবাদ মাধ্যমে পরিবেশিত নানা খবরাখবর ও গোলটেবিল বিতর্কও শোনা যায়। বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশের জন্য যে অনুকূল রাজনৈতিক সংস্কৃতি, আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি, আইনের শাসন ও জীবনের নিরাপত্তা, উন্নয়ন নীতি, লাগসই বিনিয়োগ নীতি-ব্যবস্থাদি ও অবকাঠামো আবশ্যক বাংলাদেশে তা' অনুপস্থিত। দেশী-বিদেশী উদ্যোক্তাদের সবার ভাষ্যও তাই। এ কারণে দেশী উদ্যোক্তারা যেমন বিনিয়োগ-প্রচেষ্টায় ক্লান্ত হয়ে ভগ্নমনোরথে ঘরে ফেরেন আর বিদেশী উদ্যোক্তারা অনুকূল পরিবেশধারী ভিন্ দেশে চলে যান। ফলে, বাংলাদেশে বিনিয়োগ আশানুরূপ হয়ে ওঠে না। অর্থাৎ এখানকার পরিবেশ বিনিয়োগ-বান্ধব বা বিনিয়োগ-উৎসাহী নয়। নতুন কারো উৎসাহ দেখা গেলেও প্রতিকূল বাস্তবতায় তা' ফুরিয়ে যায়। বাংলাদেশে বিরাজমান এ বিনিয়োগ-প্রতিকূল অবস্থার জন্য নাজুক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও ক্ষমতাকেন্দ্রীক রাজনৈতিক সংঘাত ও সন্ত্রাসময় রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং ঘুষ সহ ব্যাপক দুর্নীতি প্রধানতঃ দায়ী। দুর্বল বা ব্যর্থমান শাসনের সুযোগে আমলাতন্ত্রের 'লাল ফিতার' দৌরাত্ম্যও বিনিয়োগের জন্য অনুকূল পরিবেশের পথে এক বড় প্রতিবন্ধক। দেশ ও জাতির স্বার্থে 'বর্তমানকে সম্বল করে পেছনের অভিজ্ঞতার আলোকে সামনে চলার' নৈতিক প্রত্যয়-প্রতিজ্ঞা রূপায়নে দেশের রাজনীতিক ও সিভিল সার্ভেন্টদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচার-আচরণে যে সমন্বয় আবশ্যক তাও বাংলাদেশে অনুপস্থিত। সামনে এগোবার জন্য যে লাগসই বা উপযুক্ত পরিবেশ দরকার, তার জন্য আবশ্যকীয় পরিবেশ-নীতি না থাকায় পরিবেশ রক্ষা বা তার উন্নয়নে বেসরকারী বিনিয়োগকারীদের আন্দোলন লক্ষণীয় হলেও তাদের দ্বারা তো সে কাজ হবার নয়। দুঃখের বিষয়, সরকারী পর্যায়ে পরিবেশ উন্নয়নে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেয়ার আগেই দরিদ্র দেশ বলে সামর্থ্যের বা অন্যান্য অজুহাতে 'পিছু টান নীতি' অনুসরণই আর এক নব্য-নীতি। এ নাজুক অবস্থা অব্যাহত থাকলে জাতীয় অর্থনীতি এক করুণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে বাধ্য। **সরকারি ও বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি জাতীয় প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধির পূর্বশর্ত।** কিন্তু বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশে বিনিয়োগ জিডিপির ২৩ শতাংশেই **'মার্ক টাইম'** করছে। সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, সরকারি বিনিয়োগ ৬-৭ শতাংশের বেশী হচ্ছে না। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে সরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল মাত্র ৬.২ শতাংশ। নব্বইয়ের দশকে ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ যদিও বেড়েছিল, বর্তমানে আবার ১৬ শতাংশের কাছাকাছি **'মার্ক টাইম'** শুরু

করেছে। সরকারি খাতের বিনিয়োগ বাড়ছে না বলে ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগও বাড়ছে না। এছাড়া, ২০০১ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত এ তিন বছরে সরকারি খাতের বিনিয়োগ নেই বললেই চলে। এডিপির আকার থেকে এ অনুমান করা যায়। এডিপির বড় অংশই যথাযথ ভাবে বাস্তবায়ন করা যায়নি। তবে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি দাবি করে, ২০০৩-০৪ অর্থবছরের শেষ কোয়ার্টারে মোট এডিপির ৪০-৭০ শতাংশ অর্থ ছাড় হয়েছে। এর অর্থ তার বাস্তবায়ন নয়। বরং প্রশ্ন হচ্ছে, এত অল্প সময়ে আট-দশ হাজার কোটি টাকার মত এই বিপুল অংক কি করে সরকার ব্যয় করতে সক্ষম হল? ব্যাপারটা বিস্ময়কর নয় কি? অবকাঠামো খাতে এ বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ হলে ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগকারীদের অবদানও নিশ্চয় বাড়তো। ব্যক্তি বিনিয়োগকারীরা বাড়তি ঋণ নেয়ার জন্য ব্যাংকে যেতেন। কিন্তু তাঁরা যাননি বলে ব্যাংকে অলস অর্থের পাহাড় জমেছে। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আস্থার অভাবে বিনিয়োগে স্থবিরতা বিরাজ করছে। এ অবস্থার জন্য আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি, রুলস অব গেম না মেনে রাজনৈতিক বিবেচনায় এবং ঘুষ সহ দুর্নীতির আশ্রয়ে প্রকল্প বিতরণ, আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতা, স্থল ও নদী বন্দরের অব্যবস্থা সহ অবকাঠামোগত দুর্বলতা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমন্বয়হীনতা এবং সর্বগ্রাসী চাঁদাবাজি ও ব্যাপক সন্ত্রাস দায়ী নয় কি?

২০০৪ সালের ৫ জুলাই সন্ধ্যায় বৃটেনের হাউজ অব লর্ডস-এ অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ বিষয়ক এক দীর্ঘ সংলাপ। ২০০৪ সালের ৩ আগস্ট একটি দৈনিকে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, এ সংলাপে ব্রিটিশ উন্নয়ন প্রশাসন ও বাংলাদেশী কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ বলেছেন, বাংলাদেশ কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করলেও দেশের সার্বিক পরিবেশ কিন্তু ব্যবসায়-বাণিজ্য ও বিনিয়োগের জন্য অনুকূল নয়। এখানে অনেক বাধা, অনেক ঝকমারি। হরতালের কথাও তারা বলেন। তাঁরা দুঃখ করে বলেন, ব্রিটেনে বাংলাদেশী প্রবাসীরা দেশে ব্যবসায় করতে চাইলে বাংলাদেশ সরকারের নানা স্তরে তাঁদের ধরনা দিতে হয়; প্রভাব খাটাতে হয়। তাঁরা অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হন; হয়রানির শিকার হন। এসব বিষয়গুলো উঠে এসেছিল বুশ প্রশাসন প্রণীত মিলেনিয়াম চ্যালেঞ্জ এ্যাকাউন্ট

(এমসিএ)'র ছায়া মিল ব্যাংকের সংলাপেও। কারণ, অনেক বক্তা সুশাসন নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের ওপর উপযুক্ত শর্ত আরোপ ও তা যথাসময়ে বাস্তবায়নে বাধ্যবাধকতা সৃষ্টির জন্য ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। সোজা কথায় বৈদেশিক সাহায্য জিম্মি করে উন্নয়ন সাহায্যের জন্য সে শর্ত মানতে বাংলাদেশ প্রশাসনকে বাধ্য করা। একজন বক্তা দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছিলেন, এমন একটি চেকলিষ্ট উদ্ভাবন করতে যা' পরীক্ষা করেই তবে ডিএফআইডির সাহায্য বাংলাদেশকে দিতে। যুক্তরাষ্ট্রের এমসিএ কিন্তু ইতোমধ্যেই এই কাজটি আনুষ্ঠানিক ভাবে শুরু করেছে। তারা যোগ্যতা নির্ধারণী ষোলটি সূচক উদ্ভাবন করেছে। বাংলাদেশ সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের এমসিএ (Millenium Challenge Account) সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তদবির সত্ত্বেও তার আবেদন নাকচ করা হয়েছে। কারণ, অন্যান্য ক্ষেত্রের অযোগ্যতা ছাড়াও দুর্নীতি দমনে দেশটি যেসব ব্যবস্থা নিয়েছে তা সন্তোষজনক নয় বলে বিবেচিত হয়েছে মার্কিন প্রশাসনের কাছে। এ সংলাপে প্রবাসী বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, আইনজীবী, চিকিৎসক সহ বিভিন্ন পেশার শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ অংশ নেন। তবে সেদিনের সংলাপে ব্রিটিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে তেমন কিছুর ইঙ্গিত মিলেনি। বরং সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ব্রিটেনের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন মন্ত্রী গ্যারেথ থমাস বলেন, যেসব সমস্যা দেশটি মোকাবেলা করছে তার অবসানে দাতাদের একটি প্রভাব বলয় রয়েছে ঠিকই কিন্তু বাংলাদেশের জনগণকেই তাদের দেশের ভবিষ্যৎ ঠিক করতে হবে। তাঁর কথায়, বাংলাদেশের কি করা উচিত বা কি করা উচিত নয় তা লণ্ডন থেকে ডিক্টেট করার বিষয় নয়। ২০০৪ সালের এই সংলাপে যোগ দিতে ঢাকা থেকে গিয়েছিলেন বৃটিশ সরকারের ডিএফআইডির বাংলাদেশ মিশন প্রধান পল এক্রয়েড। তিনি তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রয়াসের ইতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরে বলেন, দেশটির অর্থনৈতিক কাঠামো বদলে গেছে। তার নাটকীয় ইতিবাচক প্রভাবও পড়ছে। কিন্তু আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার দিকটি এখনও উদ্বেগজনক। জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের যোগদানের প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, এক্ষেত্রে কিছুটা উন্নতি ঘটেছে। তবে পল এক্রয়েড বাংলাদেশের এটুকু প্রশংসার পাশাপাশি স্পষ্ট করে তার অসন্তোষও ব্যক্ত করেন। বাংলাদেশে চার বছরের দায়িত্ব পালনের

অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ এক্রয়েড সংস্কারের ক্ষেত্রে সরকারি দোদুল্যমানতা ও দ্বিধার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে বলেন, জনপ্রশাসন সংস্কারে এ পর্যন্ত সতেরটি রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে। অথচ সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হয়েছে মাত্র তিনটি। তাঁর কথায় বিস্মিত হতে হয় এটা ভেবে যে, কেন বাংলাদেশের সরকারি খাত আরও বেশি সক্রিয় ও গতিশীল ভূমিকা রাখতে পারছে না! বেসরকারিকরণে সবাই একমত অথচ এক্ষেত্রে তেমন অগ্রগতি নেই। ব্রিটেনের বিশিষ্ট 'বাঙালি ধনকুবের ইকবাল আহমেদ বলেন, বাংলাদেশের বিনিয়োগের বড় সমস্যা হচ্ছে, সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছুই বদলে যায়। তা'ছাড়া অবনতিশীল আইন-শৃংঙ্খলা পরিস্থিতি এবং হরতালের মতো রাজনৈতিক সহিংসতা ব্যবসায় ও বিনিয়োগের পথে বিরাট অন্তরায়। ৪৭ বছর বয়স্ক শীর্ষ বাংলাদেশী ব্যবসায়ী ইকবাল আহমেদ ৯৩ মিলিয়ন পাউন্ডের মালিক। তিনি বাংলাদেশ বিনিয়োগ বোর্ড সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য করেন। বললেন, এই প্রতিষ্ঠানটির কাছ থেকে যেসব তথ্য পাওয়া যায় তার অধিকাংশই ভুল। বাংলাদেশ রাজস্ব বোর্ডসহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সর্বশেষ অবস্থার সঙ্গে এর কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি বলেন, আমরা বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে চাই। কিন্তু এমন একটি পরিবেশ চাই যেখানে ব্যবসায় করতে গিয়ে কোন মন্ত্রীর দরজায় করাঘাত করতে হবে না। মিল ব্যাংকের সেই সংলাপ সন্ধ্যায় হাউজ অব লর্ডসের ইতিহাসে প্রথম এবং একমাত্র বাংলাদেশী সদস্য ব্যারনেস উদ্দিনের অনুরোধে প্রদত্ত বক্তৃতায় মিঃ আহমেদ বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা, সংসদ বয়কট, সন্ত্রাস, দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার ইত্যাদির সঙ্গে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ, স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন, মানবাধিকার কমিশন, নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা এবং রাজনৈতিক দল নিবন্ধন অ্যাক্ট প্রণয়ন করতে শাসক শ্রেণীর অব্যাহত প্রবল অনীহার প্রত্যক্ষ যোগসূত্র রয়েছে বলে মনে করেন। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ কখনোই ওয়েস্ট মিনিস্টার মডেলের সংসদীয় গণতন্ত্র অনুশীলন করেনি। অথচ বাংলাদেশের শাসক শ্রেণী ও তাদের মিত্র এলিটরা এটা দাবি করতে ভীষণ পছন্দ করেন। এর রহস্য ভেদ করা জরুরী।

জনাব ইকবাল আহমেদ প্রস্তাবিত স্বাধীন দুর্নীতিদমন কমিশন গঠনের স্বাধীনতায় সংশয় প্রকাশ করে বলেন, বাংলাদেশের সংবিধানের

উপযুক্ত সংস্কার ছাড়া এই কমিশন কতটা সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত থেকে দায়িত্ব পালন করতে পারবে তা' নিয়ে অনেকের মনে প্রশ্ন থাকতে পারে। সংলাপে উপস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশনার তাঁর সমাপনী বক্তাব্যে মিঃ আহমেদের শেষোক্ত মন্তব্যের যথার্থতা নিয়ে কিঞ্চিত আলোকপাত করেন। হাউস অব লর্ডসের সংলাপে প্রবাসী বাংলাদেশীরা দুর্নীতি ও বিনিয়োগ নিয়েই ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন বেশী।

ষোল

বেকারত্বের গতি আশংকাজনক

শ্রমজীবীদের মধ্যে মৌলিক শিক্ষা ও দক্ষতার অভাব আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর শিল্প কারখানায় নূতন কর্মসংস্থানে প্রতিবন্ধক। কৃষি প্রধান বাংলাদেশের পাট ছিলো এককালে সোনালী আঁশ। তখন দেশের বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগই অর্জিত হতো পাট রপ্তানী থেকে। সেজন্য পাটের অপর নাম ছিলো সোনালী আঁশ। কালক্রমে বাংলাদেশের পাট আন্তর্জাতিক বাজার হারিয়ে ফেলে। কিন্তু কেন? এ প্রশ্নের সদুত্তর দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাবিদ এবং রাজনীতিবিদরাই বেশী জানেন। প্রতিযোগিতায় টেকা যায়নি বলেই তাঁরা তাদের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পেরেছেন! নীতিনির্ধারণে নিয়োজিতদের দেশপ্রেম থাকলে এবং তা' যথাযথ কাজে লাগালেই হয়ত বাংলাদেশ সে প্রতিযোগিতায় অন্ততঃ টিকে যেতো। অমন কিছু করার মত চেষ্টা-তদবিরের কোন নজির এতদিনেও লক্ষ্য করা গেছে কি? আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের পাটের কদর প্রায় শূন্যে নেমে যাওয়ার কারণ যারা জানেন তাঁরা কি যথাসময়ে পাটের বাজার পুনরুদ্ধার করার কার্যকর কোন পদক্ষেপ নিয়েছিলেন? বাংলাদেশের সাধারণ কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর সিংহভাগই সেকালে পাট চাষে এবং পাটকলগুলোতেই কর্মরত ছিল। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অপারদর্শিতা, অদক্ষতা ও অব্যবস্থাপনার ফলশ্রুতিতে পাট শিল্পে সৃষ্ট রুগ্নতার কারণে, হাতেগোনা সামান্য ক'টি ব্যতিক্রম বাদে, ধীরে ধীরে প্রায় সব পাটকলই বন্ধ হয়ে গেল এবং তাতে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীরাও বেকার হয়ে গেলো। প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক বাজারে পাটের হৃত চাহিদা আর

পুনরুদ্ধার করা গেল না। অবশেষে, সে পাট কলগুলোর বৃহত্তম আদমজী পাটকলও লোকসান দিতে দিতে একদিন বন্ধ হয়ে গেলো এবং বেকারত্ব বরণ করতে হলো তার হাজার হাজার শ্রমিক-কর্মচারীকেও। সোনালী আঁশ পাট শিল্প লোকসানী শিল্প বলে জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বহীন হয়ে পড়লো। ইতোমধ্যে গার্মেন্টস শিল্পের প্রসার ঘটলো এবং এ শিল্প দেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের সিংহভাগ অর্জনেও সক্ষম হলো আর কর্মসংস্থান হল প্রায় বিশ লাখ বেকার লোকের, যাতে গরীব-অশিক্ষিত মেয়েদের সংখ্যাই ছিলো সিংহভাগ। এতদিন মোটামুটি ভালই চলছিলো গার্মেন্টস শিল্প এবং ২০০৪ এর ডিসেম্বর পর্যন্ত তা' হয়ত অব্যাহতও থাকবে। কিন্তু ২০০৫ সালের শুরুতে আন্তর্জাতিক বাজারে কোটা-সুবিধা উঠে গেলে গার্মেন্টস শিল্প থেকে বর্তমান বৈদেশিক মুদ্রা আয় বিঘ্নিত হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। অনেক গার্মেন্টস শিল্প-কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশংকাও দেখা দিয়েছে। দেশের লাখ লাখ গরীব ঘরের যুবক-যুবতীরা গার্মেন্টস শিল্পে কর্মসংস্থান পেয়ে জীবন ধারণের একটা উপায় খুঁজে পেয়েছিল। ইতোমধ্যে দেশের ব্যবসায়ী সমাজের উদ্যোগে এবং পরিস্থিতির পরিণতি বিবেচনায় তা' মোকাবেলার লক্ষ্যে সরকারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার কথা বলা হয়েছে। তার পরও প্রশ্ন হচ্ছে, এবার তাদের মধ্যে যারা বেকার হয়ে পড়বে তারা যাবে কোন শিল্পে? দেশের অসংখ্য কর্মক্ষম নারী-পুরুষ এখনও বেকার। জীবন-জীবিকার জন্য তাদের অনেকেই চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, রাহাজানী, খুন-সন্ত্রাসের মত নানা অন্যায় ও সমাজ বিরোধী কাজেও লিপ্ত। দেশের পরিসংখ্যান পদ্ধতি সঠিক নয় বিধায় বেকারের সঠিক সংখ্যাও রাষ্ট্রীয় পরিসংখ্যানে আসে না। সরকারের মনঃপুত না হলে কোন বেসরকারী পরিসংখ্যান জাতীয় গ্রহণযোগ্যতা পায় না। অতিরিক্ত জনসংখ্যার ভারে অর্থনীতিও জর্জরিত। তবে ব্যাপক বেকারত্বের জন্য শুধু জনসংখ্যার আধিক্যই দায়ী নয়। নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে লাগসই জনসংখ্যা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার সঠিক বাস্তবায়নের অভাবই বেকারত্বে এ ব্যাপকতার মূল কারণ। শ্রমজীবীদের ব্যবহারিক শিক্ষা ও দক্ষতার অভাব এবং দেশের পরিকল্পনাবিদ ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গিতে সমন্বয় সংকটের ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়ের অভাবে বেকারত্বের গতি আশংকাজনক রূপ নেয়। উপরন্তু, জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের মধ্যে প্রয়োজনীয় ঐক্য ও সহযোগিতাও সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এ কারণে

স্বাধীনতার প্রায় তিন যুগেও দেশের সাধারণ মানুষ তাঁদের জীবন ও দেশাত্ববোধে যথাযথ সচেতন, জাগ্রত ও সক্রিয় হবার কোন সঠিক নির্দেশনা পায়নি। দেশে বিরাজমান রাজনৈতিক অপসংস্কৃতি ও বিশৃংখলা এবং ব্যর্থমান শাসনের ফলশ্রুতিতে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির চরম অবনতির কারণে সৃষ্ট বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশের অভাব এবং শিল্প বাণিজ্যের প্রসারে অবকাঠামোগত সুবিধাদির দুষ্প্রাপ্যতা দেশী-বিদেশী শিল্প উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগে নিরুৎসাহিত ও নিষ্ক্রিয় করে। অব্যাহত এ রাজনৈতিক অপসংস্কৃতির কারণে কিংকর্তব্যবিমূঢ় সাধারণ মানুষ উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম হয়ে পড়ায় স্বকর্মসংস্থানের উদ্যোগও কদাচিৎ দেখা যায়। সৎ সাহসে বলীয়ান কেউ স্বকর্মসংস্থানের উদ্যোগ নিলেও তাতে সফলতা বিরল। দেশে বর্তমান শিল্পনীতি শিল্পোদ্যোক্তাদের উৎসাহ ও স্বার্থ সংরক্ষণে সক্ষম নয়। ফলে, দেশে শিল্প প্রসারের স্থলে শিল্প সঙ্কোচনের মাত্রাই আশংকাজনক। দেশের শিল্প-সঙ্কোচন বেকারত্বের এ চরমাবস্থার জন্য প্রধানতঃ দায়ী। বিশ্বে বেকারত্বের হার অনুযায়ী প্রথম বিশটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের স্থান ১২তম। সংখ্যায় দেশের মোট বেকার জনশক্তি দেড় কোটি এবং ২০১৫ সালে তা' পাঁচ কোটিতে দাঁড়াবে। বর্তমানে দেশের মোট জনশক্তি পাঁচ কোটির পঁয়ত্রিশ ভাগ সম্পূর্ণ বেকার আর পঁয়ত্রিশ ভাগ আন্ডার-এমপ্লয়েড বা আংশিক কর্মসংস্থান প্রাপ্ত। বাংলাদেশে বার্ষিক বেকারত্ব বৃদ্ধির হার বর্তমানে সাড়ে তিন শতাংশ।

সতের

অফিস-আদালতে বিরাজমান পরিবেশ অরাজক

অফিস কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাঁদের স্ব-স্ব কর্মস্থলে দায়িত্ব ও নিষ্ঠাবান না হলে অফিস-আদালতের স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় থাকে না। শিল্প-কারখানায় প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিতরা দলীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়লে তাতে বিরাজমান উৎপাদন-বান্ধব পরিবেশ বিঘ্নিত হয়। শিল্প-কারখানার উন্নতি হলে দেশ ও জাতির উন্নতি হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু দলীয় স্বার্থসিদ্ধির যে কোন রাজনৈতিক অপপ্রয়াসই সংশ্লিষ্ট শিল্প-কারখানায়

বিরাজমান উৎপাদন-বান্ধব বা মানসম্পন্ন উৎপাদন অনুকূল পরিবেশ বিনষ্ট করে এবং স্বাভাবিক উৎপাদন ব্যহত করে। শিল্প-কারখানায় অব্যাহত রাজনৈতিক চর্চা সংশ্লিষ্ট শিল্প কারখানাকে রুগ্ন করে তোলে। বাংলাদেশের প্রায় নব্বই শতাংশ শিল্প কারখানা ইতোমধ্যেই 'সিক' বা রুগ্ন হয়ে পড়েছে বলে সংবাদ মাধ্যমগুলোতে প্রকাশ। এর দায়-দায়িত্বও মূলতঃ সরকার ও রাজনৈতিক দলের নেতা-নেতৃবৃন্দের। সাধারণতঃ অফিস-আদালতে বা শ্রমজীবীদের কর্মস্থলে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আচার-আচরণ, চাকুরী বিধি-শৃংখলার প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধাশীলতা, দায়িত্ব-কর্তব্যজ্ঞান, মন-মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির ওপর তার পরিবেশ নির্ভরশীল। বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারী, আধাসরকারী-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে ট্রেড ইউনিয়ন সরকার স্বীকৃত। শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ট্রেড ইউনিয়নের বিকল্প নেই। এজন্য তা' বিশ্ব-স্বীকৃত একটি ব্যবস্থাও। ট্রেড ইউনিয়নের প্রকৃত নিয়মসিদ্ধ চর্চায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের গুণগত উন্নতি সাধিত হয়। এ ধরনের ট্রেড ইউনিয়ন চর্চা শ্রমিক-রাজনীতি বলেও অভিহিত। কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী তাতে উদ্ভুত কোন সমস্যা বা বিরাজমান কোন সমস্যার সমাধান স্বাভাবিক নিয়মে না হয়ে থাকলে তা' ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন বা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের মধ্যেকার দ্বিপাক্ষিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই তা' সম্পন্ন হয়ে থাকে। এতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে (অফিস-আদালতে) কাজের যথার্থ পরিবেশ বজায় থাকে। ট্রেড ইউনিয়নের অভ্যন্তরীণ ঐক্যই শ্রমজীবীদের শক্তি বাড়ায় এবং সফলতা আনতে সাহায্য করে। কিন্তু দলীয় রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তির কারণে দ্বিধাবিভক্ত ট্রেড ইউনিয়ন পরিণামে স্বীয় প্রতিষ্ঠান ও ট্রেড ইউনিয়ন উভয়ের জন্যই বিপর্যয় বয়ে আনে। এর সুচনা হয় শ্রমজীবীদের দ্বারা তাদেরই চাকুরী দাতা প্রতিষ্ঠানের বিধি-বিধান ও শৃংখলা ভঙ্গের মাধ্যমে। প্রশাসন বা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষও নিজ নিজ জীবন-জীবিকার স্বার্থে ট্রেড ইউনিয়ন নামধারী কিন্তু রাষ্ট্রের ক্ষমতাসীনদের দলীয় অঙ্গ বা শাখা সংগঠনের নেতৃবৃন্দের দাপটে বা অনাকাঙ্খিত প্রভাবের কাছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নতজানু হতে বাধ্য হন; প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে তাঁদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিফল হতেই দেখা যায়। ফলে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে কাজের পরিবেশ যেমন বিনষ্ট হয়ে যায় তেমনি দুর্নীতিই পরিণত হয় 'সুনীতিতে'। বক্শিস, ঘুষ, সালামী ছাড়া কোন কাজই হয় না অমন সব প্রতিষ্ঠানে। কোন অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের বিভাগীয়

ক্ষমতাও স্বাধীন ভাবে প্রয়োগ করা যায় না। এ ধরনের পরিবেশ বিপর্যয় বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত সহ প্রায় সব সরকারী, আধাসরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানেই বিরাজমান; যা' আবার সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানগুলোতে অত্যন্ত প্রকট ও অবর্ণনীয়।

আঠার

আবাসিক পরিবেশ কর্তৃপক্ষের ঔদাস্য ও অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতিবিম্ব

শহুরে আবাসিক এলাকাগুলো মোটামুটি চার রকমের এবং তাতে পরিবেশ ও এলাকার রকম ভেদে বিভক্ত। বিত্তবান বা শিক্ষিত বিত্তবানদের আবাসিকের নাম অভিজাত এলাকা, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত-আধাশিক্ষিতদের আবাসিকের নাম সাধারণ এলাকা, নিম্ন-মিধ্যবিত্ত শিক্ষিত-অশিক্ষিতদের আবাসিককে সংক্ষেপে ঘিঞ্জি এলাকা আর অবশিষ্ট আবাসিকের নাম বস্তি এলাকা। এলাকা ভেদে পরিবেশের তারতম্য সচেতন যে কেউ বোধ করতে সক্ষম। তবে অভিজাত এলাকা বাদে অবশিষ্ট তিনটির পরিবেশ তিন রকম। শহুরে আবাসিক এলাকার অধিবাসীদের জীবন-বান্ধব পরিবেশের দাবিটা যথার্থ। কারণ, এ পরিবেশ রক্ষার জন্য যথাযোগ্য সরকারী কর্তৃপক্ষ রয়েছেন। সিটি কর্পোরেশন নামের মহা দুর্নীতিপরায়ন এ কর্তৃপক্ষকে তার আওতাধীন আবাসনগুলোতে বসবাসকারী নাগরিকদের জন্য প্রতিশ্রুত প্রয়োজনীয় নাগরিক সুবিধাদির বিনিময়ে নির্দিষ্ট হারে কর প্রদানের বিধান রয়েছে। বাংলাদেশের ঢাকা সহ বড় বড় সিটি কর্পোরেশন, শহর-উপশহরে, পৌরসভা কর্তৃপক্ষ অভিজাত এলাকা বাদে অপর দু'টি এলাকায় তাদের প্রতিশ্রুত সেবাদি প্রায় না দিয়েই কর দিতে নাগরিকদের বাধ্য করে থাকে। বস্তিবাসীদের জীবন-বান্ধব সুবিধা বাদেই তারা বেঁচে থাকতে পারে বলে এক্ষেত্রে ওসব সুবিধার কথা কর্তৃপক্ষ ভাবেন-ই-না বা ভাববার প্রয়োজনই মনে করেন না। বাংলাদেশের গ্রামে বসবাসকারী অতি সাধারণ প্রায় নব্বই ভাগ মানুষের পরিবেশ সম্পর্কে ভোটের প্রয়োজন ছাড়া সরকার বা রাজনীতিকদের মনে পড়ারই কথা নয়।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ। একজন ঈমানদার মানুষ অন্যের ক্ষতি সাধন করতে পারে না। কারণ, 'শরমেই ধরম' অর্থাৎ যার শরম বা লজ্জা আছে তার মধ্যেই ধর্ম থাকে। সমাজের বেশরম দায়িত্ব-জ্ঞানহীন মানুষগুলোর আচার-আচরণ সামাজিক পরিবেশকে যেমন বিনষ্ট করে তেমনি অন্যের স্বাস্থ্যের হানিও ঘটায়। যেমন, যেখানে সেখানে থুথু ফেলা, প্রশ্রাব-পায়খানা করা, খালি জায়গা জবরদখল করে ঘর তুলে বসবাস শুরু করা, প্রকাশ্যে ধুমপান করা, ধোঁয়া নির্গত হয় এমন বিকল গাড়ী চালানো, সজোরে গাড়ীর হর্ণ বাজানো ও সজোরে মাইকিং করা ইত্যাদি। এছাড়া গাছ-পালা, পশু-পাখী ও অন্যান্য জীব-জন্তু নিধন, বন উজাড় ইত্যাদিও পরিবেশকে দূষিত করে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট করে। সামাজিক শিক্ষা ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতার অভাবে এসব ঘটে। সরকারে পরিবেশ মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এসব দেখেও যেন দেখে না! তবে পরিবেশ বিষয়ক যে কোন দিবস পালনে তাঁদের জুড়ি নেই।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য নিয়ে কবি-সাহিত্যিকরা কবিতা-প্রবন্ধ লিখে, গায়েনরা গান বাঁধে। আর দেশবাসী পড়ে-শুনে তা উপভোগ করে। কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশ বা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার দায়িত্ব কবি-সাহিত্যিক-গায়েনদের নয়। বন্যা বিধ্বস্ত বাংলাদেশের অবস্থার ওপরও তারা লিখতে-গাইতে পারবে কিন্তু দূষণ থেকে পরিবেশকে রক্ষা বা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার দায়িত্ব মূলত সরকারের নয় কি?

উনিশ

ধর্ম নিয়ে রাজনীতি ইসলামী আদর্শ বিশ্বাসে বিদ্যমান দুর্বলতা ও বিচ্যুতির ফসল

বাংলাদেশে ইসলাম শুধু ধর্মই নয়, রাষ্ট্র ধর্মও। এ দেশের মোট জনসংখ্যার নব্বই ভাগই মুসলিম। কিন্তু এ মুসলিমরা তাদের ধর্মের অনুশাসন যথার্থ মেনে চলে কি? চৌদ্দ'শ বছরেরও অধিক সময়ে ইসলাম কায়েমে তারা সফল হতে পারেনি কেন? বাংলাদেশে এত মসজিদ, মাদ্রাসা; ইসলামী

রাজনৈতিক দল কি করছেন? ইসলাম কায়েমের লক্ষ্যেই তো কাজ করছেন তাঁরা? দেশের কত শতাংশ মুসলিম শুদ্ধ করে কলেমা পড়তে পারে; কত শতাংশ মুসলিম নামাজ শুদ্ধরূপে আদায় করতে পারে, তার কোন পরিসংখ্যান কারো কাছে আছে? পশু কোরবানী আর রোজা করে এবং ঈদোৎসব আর ঈদের নামাজ আদায় করলেই কি ইসলাম কায়েম হয়ে যায়? দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যক্তি বা সমাজ জীবনে ইসলাম কায়েমের জন্য প্রকৃত ইসলামিক শিক্ষা ও জ্ঞানার্জন এবং তার যথার্থ অনুশীলনের সুযোগ আছে কি? ইসলাম ধর্মগ্রন্থ পবিত্র কোরআন শিক্ষাকে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যক্রমে প্রত্যেক মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীর জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়নি কেন? তা' না করে আলাদা মাদ্রাসা বোর্ড করে জাতিকে যেভাবে সরাসরি দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে তার বর্ণনা আগেই দেয়া হয়েছে। ২০০৪ সালের ২৫ অক্টোবর একটি দৈনিকে প্রকাশিত এক নিবন্ধে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ে মাদ্রাসা শিক্ষায় বার্ষিক সরকারী ব্যয় ও শিক্ষার্থীদের দক্ষতা ও কর্মসংস্থানকে ভিত্তি করে পুরো মাদ্রাসা শিক্ষার ফসল সম্পর্কে মৌলিক কিছু প্রশ্ন নিবন্ধকার উত্থাপন করেছেন, যাতে নাগরিকের মৌলিক অধিকারে সৃষ্ট বৈষম্য ও তার ফলশ্রুতি পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠেছে। প্রশ্নগুলো হচ্ছে ঃ আলাদা ভাবে মাদ্রাসা শিক্ষা বিষয়টির প্রয়োজন ও গুরুত্ব বাংলাদেশে কতটুকু? কারা এই শিক্ষা ব্যবস্থা প্রথম চালু করেছিল? কি তাদের উদ্দেশ্য ছিল? সে উদ্দেশ্যটির সঙ্গে আজকের বাস্তবতা কতখানি সঙ্গতিপূর্ণ? একবিংশ শতকের একটি আধুনিক রাষ্ট্রে বা সমাজে, রাজনীতিতে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে এই শিক্ষা ব্যবস্থার ভূমিকা কি এবং তা' কতটুকু কার্যকর? তাঁর মতে, এ দেশটির পশ্চাদমুখিতার একটি প্রধান কারণ হচ্ছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার কিছু অসংশোধিত ও অপরিবর্তীত ত্রুটি। এই ত্রুটিগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে মাদ্রাসা শিক্ষার নামে দেশের এক বৃহৎ সংখ্যক নাগরিককে চিরকাল আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে আলোকিত জগত থেকে অজ্ঞতার অন্ধকার জগতে রেখে দেয়া। এ প্রক্রিয়াটি চলে আসছে বহুকাল আগে থেকে। এ প্রক্রিয়ারই ক্রমসঞ্চিত ও সুদুরপ্রসারী ফলই (Cumulative and long-term effect) আজ জাতি হিসেবে আমাদেরকে এতটা পিছিয়ে দিয়েছে। কেননা, একজন মাদ্রাসা পাস যুবক যখন আর কোন কাজে নিজেকে লাগাতে পারছে না তখন সে একটি নতুন মসজিদ বা আরেকটি নতুন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে সক্রিয় হচ্ছে এবং বছর বছর বাড়ছে মসজিদ-মাদ্রাসার সংখ্যা আর

বাড়ছে বেকার অথবা অর্ধ-বেকার (under-employed) লোকের সংখ্যা। এ মাদ্রাসা শিক্ষা খাতে শত শত কোটি টাকার সরকারী ব্যয় দেশের অর্থনীতিতে যেমন কোন অবদান রাখে না, তেমনি সমাজের আধুনিক চিন্তা-চেতনায়ও না। অর্থাৎ সরকারি এ ব্যয় দেশের জন্য যেমন উৎপাদনশীল নয়, তেমনি মানব উন্নয়নে কোন অবদান রাখতেও সক্ষম নয়। মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিতদের সম্মানজনক কর্মসংস্থানের দুষ্প্রাপ্যতাও লক্ষণীয়। নিবন্ধকার তাঁর এ ধারণার বাস্তবতা যাচাই করতে একজন অনুসন্ধিৎসু সাংবাদিক-গবেষকের এ বিষয়ে কিছু প্রশ্নের উত্তর খোঁজা উচিৎ বলে তিনি মনে করেন। তাঁর মতে, প্রশ্নগুলো এ রকম হতে পারে ঃ

(১) ১৯৭১ সালের পর থেকে এদেশে 'বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের' মাধ্যমে যত লোক চাকরি পেয়েছে তার কত শতাংশ প্রার্থী মাদ্রাসা শিক্ষা লাভ করে সে চাকরি-পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিলেন? কতজনের প্রথম ডিগ্রী (এসএসসি পর্যায়) মাদ্রাসার? কতজনের দ্বিতীয় ডিগ্রি (স্নাতক পর্যায়) মাদ্রাসার এবং কতজনের সর্বোচ্চ (মাস্টার্স পর্যায়) ডিগ্রি মাদ্রাসা থেকে নেয়া ছিল?

(২) ১৯৭১ সালের পর থেকে এদেশে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়, আইন মহাবিদ্যালয়গুলো থেকে যত স্নাতক বের হয়েছে তাদের মধ্যে কত শতাংশ মাদ্রাসা থেকে পাস করে এসে ওসব মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিল?

(৩) বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট কর্মকাণ্ড শুরু হওয়ার পর থেকে তাদের মাধ্যমে যত লোক মধ্যপ্রাচ্যে নিয়োগ নিয়ে গেছেন তাদের মধ্যে কতজন মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন?

(৪) নিজে মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে কতজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, উকিল, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়েছেন এবং এরকম দু-একশ' জনের মধ্যে কতজন নিজেদের ছেলেমেয়েদের মাদ্রাসায় পড়তে পাঠিয়েছেন?

(৫) মাদ্রাসা শিক্ষার সমর্থক বা এই শিক্ষা পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তার পক্ষে যুক্তিপ্রদানকারীদের কতজন তাঁদের ছেলেমেয়েকে মাদ্রাসায় পাঠিয়েছেন? এমনকি মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির 'স্থায়ী' নেতার পুত্র-সন্তানরাও মাদ্রাসায় শিক্ষা না নিয়ে সাধারণ শিক্ষালাভ করেছেন কি-না?

(৬) মাদ্রাসা ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক গবেষণা চালিয়ে তাদের পিতা-মাতার অর্থনৈতিক অবস্থানকে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত হিসেবে শ্রেণীভূক্ত করা যায় কি-না?

এসব তথ্য ছাড়াও হয়তো একজন অভিজ্ঞ সাংবাদিক-গবেষক আরও অনেক তথ্য সন্ধান করে দেখবেন। এসব বিষয়গুলো জানা প্রয়োজন এজন্য যে, এগুলো জানলে মাদ্রাসা শিক্ষা আমাদের কতটা কাজে লাগছে সঠিক ভাবে তা' নির্ণয় করা সম্ভব হবে। একই সঙ্গে সমান্তরাল দু'রকম শিক্ষা ব্যবস্থা চালিয়ে এবং দু'টির পেছনেই সরকারি অর্থ ব্যয় করে (কওমি মাদ্রাসাগুলো এসব হিসাবের বাইরে) দেশের কি লাভ হচ্ছে তা দেশবাসী জানতে সক্ষম হবে। ব্রিটিশরা যা চালু করেছিল এবং পাকিস্তানিরা যা চালু রেখেছিল, তা বাংলাদেশের জন্য কি ফল দিয়ে গেছে তার প্রতিফল মূল্যায়ন তো বাংলাদেশীদেরই করতে হবে। কেননা, বাংলাদেশ বিশ্বের একটি অন্যতম দরিদ্রতম দেশ এবং তার সম্পদও অত্যন্ত সীমিত।

দেশে মাধ্যমিক পর্যায়ে মাদ্রাসার জন্য সরকারের বার্ষিক ব্যয় অনেক এবং প্রতি বছর মাদ্রাসা থেকে বের হওয়া ছাত্রদের সংখ্যাও নেহায়েত কম নয়। ১৯৯৯ সালে দেশে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে মোট মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল ৬,০৮৭ এবং তাতে ছাত্রের সংখ্যা ছিল ১৯,৯১,৪৭০ জন; আর এতে সরকারী ব্যয় ছিল ৩২৯ কোটি ১ লক্ষ টাকা।

ইতোমধ্যে মাদ্রাসার সংখ্যা এবং তাতে সরকারী ব্যয়ের পরিমাণও অনেকগুণে বেড়েছে। ২০০৪ সালে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক মাদ্রাসার সংখ্যা ৭,২৯৮, তাতে শিক্ষকের সংখ্যা ১,১৮,৯৩৭ জন এবং মোট বার্ষিক ব্যয় ৫০৮ কোটি ৬২ লাখ টাকা। তাছাড়া, স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসার (এমপিও ভূক্ত) সংখ্যা ১,৫৮৬ এবং এতে সরকারী ব্যয় ৩ কোটি ৮০ লাখ ৮৪ হাজার টাকা। এ ব্যয় এবং এ জনসংখ্যা দেশ ও সমাজের জন্য যে অবদান রাখছে তার নীট ফলাফল ধনাত্মক না ঋণাত্মক তা দেখার প্রয়োজন তো অবশ্যই আছে। বহুদিন থেকেই বিভিন্ন মহল থেকে মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিক করার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবাধ প্রবেশ এখানে ঘটানো যায়নি। কেন যায়নি তাও খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। প্রশ্ন হচ্ছে, এককালে মাদ্রাসা থেকে আবুল ফজল, শওকত

ওসমানের মত মুক্তচিন্তার মানুষও বেরিয়ে আসছেন; তাঁদের পর আর আসছেন না কেন? মাদ্রাসা শিক্ষা থেকে ভাল কিছু গ্রহণ না করে রাজনৈতিক স্বার্থেই একে ব্যবহার করা হচ্ছে বলেই কি?

একজন নিবেদিতপ্রাণ সাংবাদিক-গবেষক, একজন ক্যাম্পেইনার এসব অনুসন্ধান করে যদি একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন তৈরি করেন তাহলে দেশের সরকারের পক্ষে, রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষে এবং সুশীল সমাজের পক্ষে এ বিষয়ে সংলাপ শুরু হতে পারে এবং তাতে এ শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে একটি উপযুক্ত সিদ্ধান্তও গৃহীত হতে পারে। কাউকে কোনরকম আঘাত না দিয়ে, কারও রুটি-রুজির ব্যাঘাত না ঘটিয়ে তার বাস্তবায়নে একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা সরকার হাতে নিতে পারে, যার পক্ষে দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল ও সুশীল সমাজের পূর্ণ সমর্থন চাওয়া যেতে পারে।

বিষয়টি দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, দেড় হাজার বছরেও ইসলাম ধর্মাবলম্বী সবার মধ্যে সে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা, জ্ঞানার্জন ও তার অনুশীলনের বিস্তৃতি ঘটেনি। এ কারণে তাঁদের মাঝে ঈমানী দুর্বলতা বিদ্যমান। সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা, ত্যাগ-ধৈর্যশিলতা, লজ্জা, উদারতা, পরমত সহিষ্ণুতা, সততা, স্বচ্ছতা, সরলতা, সহমর্মিতা, পরিচ্ছন্নতা, কর্মমুখিতা ইত্যাদির মত ঈমানের প্রধান প্রধান অঙ্গগুলোর রূপায়ন অধিকাংশ মুসলিমের জীবন-যাপনে আর আচার-আচরণে কদাচিৎ লক্ষ্য করা যায়। ইসলামের আদর্শভ্রষ্ট মুসলিমদের মধ্যে ওসবের বালাই তো নে-ই। ধর্মীয় নেতাবেশী মুসলিমদের অনেকের ধর্মীয় আদর্শচ্যুতি সাধারণ মুসলিমদের ধর্মীয় আদর্শ বিশ্বাসে বিদ্যমান দুর্বলতাকে আরও চরম পর্যায়ে নিয়ে যায়। মুসলিমদের ইসলাম ধর্ম শিক্ষা ও ধর্মীয় জ্ঞানার্জনে শত শত বছর ধরে অনুসৃত নীতি-পন্থাগুলোও কাংখিত কার্যকারিতার স্বাক্ষর বহন করে না। রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মের অপব্যবহার ধর্মীয় পবিত্রতা বিনষ্ট করে; ধর্মীয় বিশ্বাসকে বিতর্কিত করে এবং তাতে ধর্মের প্রতি যে অবমাননা সাধিত হয় তা' মহাপাপেরই তুল্য। বাংলাদেশের মুসলিমদের মধ্যে ধর্মীয় আদর্শের প্রকৃত চর্চার চাইতে রাজনীতি মেশানো ধর্মীয় আদর্শ চর্চার আধিক্যই বিদ্যমান বিধায় এখানে প্রকৃত ইসলাম কায়েমের কোন সম্ভাবনাই লক্ষণীয় নয়।

বিশ

স্বাস্থ্যনীতি ও সবার জন্য স্বাস্থ্য কৌশল

পৃথিবীজুড়ে সবার জন্য স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে গঠিত-প্রতিষ্ঠান এখনও হয়ে পড়ে অপরূপ বিরাজমান। বাংলাদেশের মত পৃথিবীর অনেক দেশ পরীক্ষা দেশের প্রথম টেস্ট কোটি মানুষের সবার জন্য স্বাস্থ্যের কথা আজও শুধু বক্তব্যই রয়ে যায়, বাস্তবে তার নাগাল পাওয়া বড় কঠিন। স্বাস্থ্য খাতে যে সেবায়, যাইনমার যেটিস মতো বাংলাদেশে জনসাধারণের জন্য যে সেবার ইতিমধ্যে পাওয়ার সমস্যার লক্ষ্য করা যায়নি। অথচ, তা আজকের দেয় স্বাস্থ্য আর বঞ্চনা-বঞ্চনার স্বাস্থ্যের বাস্তবিক রূপে। বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে 'সবার জন্য' স্বাস্থ্যের প্রশ্নটি দেখা যায়। দেশের সবারে মানুষের জন্য বিদ্যমান যায় মূলিনি এর অর্থাৎ যে, আজকের দেয় যায়-স্বাস্থ্য, বাস্তবায়নের স্বাস্থ্য এবং বিরাজমান সব মানুষের পড় করলে দেশের যায়সমূহের প্রথম টেস্ট কোটি মানুষের জন্য 'হীর-যায়-যায়-ই' বলা যায়। শহরের লক্ষ লক্ষ নিম্ন-মধ্যবিত্ত, পরীব বস্তিবাসী, শ্রমিক, মজুর, রিক্সা চালক, হকার, জনপুরে দেখার আর কারখানাগুলি, শিল্প-কারখানা-শ্রমিক এবং গ্রামের কৃষক-শ্রমিক-চেরকার ও তাদের সব অন্যান্য যায় মানের পেশাজীবী মিলে দেশের প্রায় নব্বই শতাংশ মানুষের যায়সেবা ক্রীন-হাসপে প্রয়োজনীয় মূলিনির মুখোপায় বাংলাদেশ। ২০০০ সালের মধ্যে দেশের সবার জন্য যায়' নিশ্চিত করার সরকারী সিদ্ধান্ত যাবতীয় তার রূপায়ন সম্ভব হয়নি। দেশের সব পরিচিত হাসপাতালেই জনসাধারণের স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে এবং স্বাস্থ্য রক্ষাবেক্ষণেই নিয়োজিত বলে দাবী করা হলেও তাদের বিরাজমান পরিষেবাটিই যায়সেবার নয়, যা স্বাস্থ্যের জন্য প্রথম পূর্বশর্ত। একই কারণে বহু একটির তার প্রাইভেট কোম্পানীও অনেক হাসপাতাল-ক্লিনিক যাবতায় নিয়োজিত যাচ্ছে। তারা সব প্রাইভেট হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলোর জনস্বাস্থ্য সেবার আড়ালে ব্যবসায়িক লক্ষ্যটিই মূল। ফলে, পরীব জনসাধারণ তাদের সেবা পাবার বা নেবার ক্ষমতা রাখে না। সরকারসহ মফস্বলের পরিচিত হাসপাতাল, ক্লিনিক বা ইউনিয়ন যায় ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রগুলোতে

নিয়োগপ্রাপ্ত ডাক্তারদের অধিকাংশই শহরের সুবিধা ও উন্নত জীবন-যাপনের উপযোগী পরিবেশের অভাবে কর্মস্থলে অবস্থান করেন না। উপজেলা, জেলা ও বিভাগ পর্যায়ের হাসপাতাল-ক্লিনিকগুলোতে লক্ষ লক্ষ টাকার চিকিৎসার যন্ত্রপাতি ও ঔষধ-পত্রের প্রতি অভাব নিত্যদিন। এসব যন্ত্রপাতি ও ঔষধ-পত্র সরবরাহ এবং সংরক্ষণের এ সমস্ত অবহেলার ইতিবৃত্ত স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য-সম্পর্কীদের জানা কিন্তু কোন ব্যবস্থাপত্রে এর অবসানের পরিবেশ গঠিত ও নিত-মন্ত্রিত হচ্ছে না। যে স্বাস্থ্য সেবা দেয়া হয় তার প্রকৃত চেহারাটা সহজেই অনুমেয়। মুশকিল অন্যত্রই কি সরকারী স্বাস্থ্য সেবার অবস্থা এত করুণ। যদি তাই হয়ে থাকে তবে শাসনকর্তারা তাতে মুশকিল প্রবেশ করছেন না কেন? তাদের ব্যবহারের জন্যে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার অভাবে এসব পরিচালক হাসপাতাল বা ক্লিনিকের ওপর পরিবার সরবরাহের অস্ত্র নষ্ট হবে না কেন? স্বাস্থ্যের সঙ্গে পরিবার কল্যাণের সম্পর্কটাও অনেকটা আমাদের কাছেই গৌণমাত্র। অত্ পরিবার পরিকল্পনার যাবতীয় ব্যয়ই জনগণের বা পরিবার কল্যাণ সমিতির হয় না। জনসংখ্যা যে হারে বেড়ে চলেছে তা আশাব্যঞ্জক নয় কি? শিক্ষা ও অশিক্ষার কারণে সকল সম্পত্তিদের মধ্যে জীবন ও সমাজিক পরিবর্তনের অন্যতমও একটি। বহু মুসলিম আগে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ একজন বিদেশী কূটনীতিক বলেছিলেন, আগামী দিন বহু পর বাংলাদেশের মুসলিম শ্রেণীর প্রথম সারই কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে। কারণ, বাংলাদেশের প্রায় সকল ভাল মা ও শিশু অপুষ্টিতে ভুগছে। দেশের বর্তমান স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য সেবার উন্নতি এবং তার যথাযথ বিস্তৃতি না ঘটলে আগামীদিনে এসব শিশু কিশোর বহুর বয়সী মুসলিম পরিণত হবে। পুষ্টিহীনতায় ভোগে ওঠা এসব মুসলিম প্রয়োজনীয় মেধার অভাবে কোন কর্মক্ষমতার অধিকারী হবে না। কারণ, ইতোমধ্যে আমরা পৃথিবীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যে উন্নতি সাধিত হয়েছে তাতে মেধা ও শক্তিহীন কোন মুসলিমেই টিকে হবে না। তাহলে দেশের শাসন ক্ষমতায় যারা অধিষ্ঠিত আছেন বা হবেন তাঁদের দৃষ্টি অবশ্যই এদিকে নিবদ্ধ করতে হবে। তা না হলে জাতিকে এক মহাসংকটের সম্মুখীন হতে হবে। অধিকাংশ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মতো বিজ্ঞান মনস্কতার বিপক্ষে অবস্থান এবং অযাচিত দৃষ্টিভঙ্গি 'পরিবর্তিত পরিবার মূল্যায়ন ও যাচাই জীবনের চাহিদাই' এ সত্য প্রতিষ্ঠার পথে এক

বড় ও জটিল প্রতিবন্ধক। ফলে, এ মহা-স্বাস্থ্য সংকটে বাংলাদেশে খোদ মানবতাই বিপন্ন। কারণ, স্বাস্থ্যকর জীবন-যাপনের জন্য নির্বিঘ্ন-নিরাপদ কোন উপায় বুঝবার ও তা অবলম্বনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাব এবং প্রকৃত ধর্মীয় জ্ঞানে অজ্ঞতা বশতঃ বিরাজমান ব্যাপক তারতম্যের কারণে জীবনের জন্য যা' যা' চরম সত্য তা' দেশের বিশাল অশিক্ষিত ও অদক্ষজনদের একযোগে প্রভাবিত করতে পারে না। জীবন ও জীবনধারণ পদ্ধতিকে স্বাস্থ্যকর, সৌন্দর্যমণ্ডিত ও সম্মানজনক করতে হলে তাতে প্রয়োজনীয় যে উপাদানগুলোর সমন্বিত বাস্তবায়ন আবশ্যক তার আয়োজনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সক্রিয় মনযোগিতা লক্ষ্য করা যায় না। দেশদরদী কোন পরিকল্পকের সে মনযোগিতা থেকে থাকলেও দুর্নীতির ছোবলে তা অকার্যকর হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক দলীয় প্রভাব ও মোটা অংকের ঘুষ প্রদানের বাধ্যবাদকতা ডাক্তারী ফাইনাল পরীক্ষা পাশ করা থেকে বিভাগীয় ডাক্তার কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিয়োগ-বদলী পর্যন্ত প্রায় সব ক্ষেত্রেই বিস্তৃত। অতএব, ব্যবস্থাপনা ও সেবা দু'টোই একত্রে বিপর্যস্ত নয় কি?

স্বাস্থ্য সেবার গণমুখিতার জন্য যে পর্যাপ্ত অবকাঠামো প্রয়োজন তা' বাংলাদেশে আজও পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি। সারাদেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মোট হাসপাতালের সংখ্যা ১,২৭৩টি। এর মধ্যে সরকারী ৬৪৭টি এবং বেসরকারী ৬২৬টি। হাসপাতালগুলোতে 'বেড'-এর সংখ্যা প্রতি ৩,২৪৯ জন লোকের জন্য ১টি এবং ডাক্তারের সংখ্যা প্রতি ৪,০০০ জন লোকের জন্য ১ জন। দেশে মোট রেজিষ্টার্ড ডাক্তারের সংখ্যা ২৯,৬১৩ জন, আর মোট নার্সের সংখ্যা ১৬,১০৪ জন। ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন ও স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের সংখ্যা মোট ৪,২০০টি, যেগুলোকে হাসপাতাল বলা চলে না। এগুলোর অধিকাংশই এখনও ডাক্তার-বিহীন। আগেই বলা হয়েছে, নাগরিক সুবিধার অভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ডাক্তাররা গ্রামে বসবাস করে জনসেবা করতে আগ্রহী নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, জনস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণে সরকারের 'সবার জন্য স্বাস্থ্য সেবা' কার্যক্রম এ জীর্ণ অবকাঠামোতে কখনও সম্ভব হতে পারে কি?

একুশ

ভারসাম্যহীন প্রাকৃতিক পরিবেশ ও আর্সেনিক-এর বিস্তৃতি মারাত্মক!!

দেশের সাধারণ পরিবেশ দেশবাসীর মধ্যে বিরাজমান ব্যাপক অশিক্ষা ও দরিদ্রতা এবং বাস্তবতা বিবর্জিত জন গণবিমুখ রাজনীতি প্রভাবিত। দরিদ্রতম দেশের জনসাধারণ দারিদ্র্য পীড়িত হবে—এটাই স্বাভাবিক। নিরক্ষরতা, অশিক্ষা ও অজ্ঞতার কারণে অধিকাংশ মানুষ এখনও পরিবেশ সচেতন নয়। দেশের কোন জীবন-বান্ধব পরিবেশও দূষিত হয়ে পড়ে যখন সেখানে পরিবেশ-অচেতনদের সমাগম ঘটে। অর্থাৎ সেখানকার বিদ্যমান পরিবেশ তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। আবার দারিদ্র্যের কষাঘাতে; যঠরের তাগিদে অসংখ্য ভূমিহীন ভাসমান কোন জনগোষ্ঠী যখন দু'বেলা অন্ন যোগাবার সংগ্রামে শহর-বন্দরে বা তার আশপাশে খোলা আকাশের নীচে মাথা গোঁজার ঠাঁই করতে বসতি স্থাপন করে তখন থেকে সে বস্তিবাসীদের মানবেতর জীবন-যাপনে ও আচার-আচরণে গড়ে ওঠা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তার চারপাশের বিদ্যমান সাধারণ পরিবেশকে আরও দূষিত করে। সারা দেশে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন এবং শহর ও উপশহরে পয়ঃ নিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাব প্রকট। শহর ও উপশহরের যত্র-তত্র শিল্প-কারখানার বর্জ্য নিষ্কাশনেও উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাব এবং তার প্রতিকূল প্রভাবে সৃষ্ট পানি ও বায়ু দূষণে যে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি হয় তা' প্রাকৃতিক পরিবেশকেও যার পর নাই দূষিত করে। শহর-উপশহরে সাধারণ ড্রেনেজ ব্যবস্থাও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অচল ও অকেজো পড়ে থাকে বিধায় প্রাকৃতিক পরিবেশকে অসহনীয় করে তোলে। অর্থাৎ, এক কথায়, কিছু সংরক্ষিত অভিজাত এলাকা বাদে সারা দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশকে মোটেই জীবন-বান্ধব বলা চলে না। দেশের অদ্ভুত রাজনৈতিক চর্চা আর ব্যর্থমান শাসনও সুস্থ জীবন-বান্ধব নয়। আর এহেন পরিবেশের উন্নয়ন সাধনে তেমন কার্যকর কোন পদক্ষেপও লক্ষণীয় নয়। এ প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করেই দেশের মানুষ জীবনের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে। কিন্তু যাবে কত দূর? তার স্বীয় ক্ষমতার বাইরে তো নয়! অন্যসব উন্নয়নের মত পরিবেশ উন্নয়নও মূলতঃ মানব কেন্দ্রিক। মানব উন্নয়ন মানুষের আচার-আচরণে উর্বরতা আনে আর সেজন্য পরিবেশের

আরসেনিক মানব দেহের পক্ষে বিষতুল্য। মানব দেহে বাংলাদেশ যে কত বেশী পিছিয়ে তা সংশ্লিষ্টদের সবারই জানা।

বাংলাদেশ আর্সেনিকেও প্রথম!! ২০০৪ সালের ৬ এপ্রিল একটি দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী বুলগেরিয়ার পর বাংলাদেশ আর একটি ক্ষেত্রেও প্রথম হয়েছে এবং তা' আর্সেনিকে। আর্সেনিক বিষযুক্ত পানি। ব্রাকপুর (ডারহ) বিশ্ববিদ্যালয় এবং ব্রাক কর্মিটমেন্ট হাসপাতালের যৌথ রিপোর্টে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়। রিপোর্টটি উপস্থাপন করেন যুক্তরাষ্ট্রের ব্রাকপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইউজিন শাপন। এতে বলা হয় যে, বিশ্বের তেইশটি দেশের পানি আর্সেনিকযুক্ত। এর মধ্যে বাংলাদেশের স্থান প্রথম। এছাড়া অধিক আর্সেনিকযুক্ত পানি বিশ্বের অন্য কোন দেশে নেই। একই সময়ে আর একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। কয়েকটি সংস্থা যৌথভাবে রিপোর্টটি প্রকাশ করে। এর মধ্যে আছে মিউনিসিপাল এন্ড ওয়াটার সাপ্লাই এজেন্সী, ইউনিসেফ, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এবং ডানিডা প্রভৃতি। শেষোক্ত সংস্থাগুলো বাংলাদেশের প্রায় সবকটি জেলা ও উপজেলায় জরিপ কাজ পরিচালনা করে। জরিপ রিপোর্টে বলা হয় যে, বাংলাদেশের চৌষট্টিটি জেলার মধ্যে চুয়ান্নটি জেলা এবং প্রায় দুশো উনসত্তরটি উপজেলার পানি আর্সেনিকযুক্ত। এসব এলাকায় প্রায় সাড়ে আট কোটি লোকের বাস। এরা জেনে এবং না জেনে প্রতিদিন আর্সেনিক বিষযুক্ত পানি পান করে যাচ্ছে। এছাড়া ব্যবহার করছে নানা কাজে। কেবল তা নয়, আগে পানি আর্সেনিক দূষণযুক্ত হলেও খাদ্যশস্য ছিল না। এখন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাংলাদেশে কোন কোন খাদ্যশস্যে আর্সেনিকের পরিমাণ নাকি তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি।

আর্সেনিক এমন এক বিষ যা মানুষের হাতে পায়ে কত রোগ সৃষ্টি করে। প্রথমদিকে তেমন কোন অসুবিধা ও যন্ত্রণাদায়ক বোধ হয় না। কিন্তু দিনে দিনে কত গভীর হতে থাকে। ত্বকের পরে হাত পা সহ সারা দেহে। সঙ্গে সঙ্গে ভুগা যন্ত্রণাও বেড়ে যায়। রোগে কাজ করা কষ্ট হয়ে পড়ে। আর্সেনিক বিষজনিত কত রোগে প্রথমদিনি ঘটার তেমন কোন নজির নেই। এর সবচেয়ে খারাপ দিক হলো মানুষের কর্মশক্তি হ্রাস পায়। সময়মতো চিকিৎসার ব্যবস্থা করা না হলে কতরোগে কর্মশক্তি ও প্রাণশক্তি কমে যায়। স্বাভাবিক ভাবে কাজ করা সম্ভব হয় না। ফল যা হবার তাই হয়ে থাকে।

একসময় বাংলাদেশের পানিতে আর্সেনিক ছিল কি না। একথা কিন্তু একটা বিষাক্ত পদার্থ থাকতে পারে তা-ই জানা ছিল না মানুষের। তখন মানুষ হেসে খুলে, দীঘি, নদী কিংবা বিলের পানিতে নাওয়া খাওয়া ধোয়া-মোছা ইত্যাদি সব কাজ করতো তাতে কোন সমস্যা আর্সেনিক ছিল না। এখনও আছে বলে জানা যায় না। তবে আজকাল বিলে বা পাতকুয়া ইত্যাদি প্রায় নেই-ই বলা চলে। অনেকখানি জলাধারে প্রায় সবই ভরাট হয়ে যাচ্ছে। সেসব স্থানে পড়ে উঠেছে ফসলাদি আর না হয় তৈরী হয়েছে বাড়িঘাটি। অন্যদিকে বাংলাদেশ পানির স্তর বহু নীচে নেমে গেছে। পুকুর দীঘি যাচ্ছে শুকিয়ে। আজকাল বর্ষাকালেও অনেক দীঘিতে এক ইঞ্চি পানি থাকে না। নদীগুলোর দশাও কম-বেশী অভিন্ন। বহু নদী শুকিয়ে গেছে। কোন কোনটি সরে গেছে লোকালয় থেকে দূরে।

পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়ার প্রধান কারণ ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন। শত শত বছর ধরে বাংলাদেশে খাল-নালার পানি নিয়ে নেমে পড়িয়ে জমিতে সেচ কাজ করা হতো। কয়েক দশক আগ থেকে সরকারপক্ষ প্রদত্ত প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ভূগর্ভস্থ পানি তোলা শুরু হওয়ার পর থেকে নদী নালা খননের কাজ উপেক্ষিত হয়ে পড়ে। অধিকাংশ পানি তোলার ফলে পানির স্তর এত নীচে নেমে যায় যে, দশ-পঁচিশ ফুট দীর্ঘ পলিথিন পাইপ নিয়েও নলকূপের সাহায্যে পানি পাওয়া কঠিকর হয়ে দাঁড়ায়। যেটুকু পাওয়া যায় তাতে থাকে আর্সেনিক। এর উপর আছে রাসায়নিক সার ও বিষাক্ত কীটনাশকের বিরূপ প্রতিক্রিয়া। পানির সঙ্গে বর্জ্য মিশে যাওয়ায় বহু পুকুর, দীঘি ও নদীর পানি পান করা বা ব্যবহার করার অনুপযোগী হয়ে পড়ে। এখন ধোয়া-মোছা এবং খাবার পানির প্রধান উৎস টাপা কিংবা নলকূপ। ঢাকায় প্রধান প্রধান কতিপয় শহরে টাপের পানি পাওয়া গেলেও গ্রামাঞ্চলে এর কোন অস্তিত্ব নেই। গ্রাম বাংলার মানুষের প্রধান ভরসা টিউবওয়েল বা নলকূপ। এমনকি, কোন কোন জেলা এবং উপজেলার অধিকাংশেরও তাই। বাংলাদেশে নলকূপের সংখ্যা প্রায় পঁচিশ লাখ। তাদের দশ-পঁচিশ ফুট দীর্ঘ একটি পাইপ বসিয়ে পানি পাওয়া যেত। এর বিস্তৃতা নিয়ে কোন সংশয় ছিল না। ছাপার অক্ষরে যা বের হতো তাই সত্যি, এক সময় এরকম একটি ধারণা পোষণ করতো মানুষ। ঠিক তেমনি একটি ধারণা ছিল, নলকূপের পানি সম্পর্কেও। নলকূপের পানি মানেই বিশুদ্ধ পানি। এটা বিশ্বাস করতো মানুষ। দুই-তিন দশক আগে এ বিশ্বাসে চিড় ধরে। কোন কোন এলাকার মানুষ। দুই-তিন দশক আগে এ বিশ্বাসে চিড় ধরে। কোন কোন এলাকার

পানিতে ধরা পড়ে আর্সেনিক। সে থেকে শুরু হয় পানি আর্সেনিকমুক্ত করার কাজ। তবে যতটা দ্রুত ও পরিকল্পিতভাবে করা উচিত ছিল তা করা হয়নি। বিভিন্ন এলাকার নলকূপের পানি পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, এক সময় যে পানিকে বিশুদ্ধ মনে করা হতো, আসলে তা বিশুদ্ধ নয়, আর্সেনিক বিষ মেশানো।

আর্সেনিক বিষ মেশানো পানির ক্ষতিকর প্রক্রিয়া হতে জনগণকে রক্ষা করার জন্য কাজ শুরু করার পর এগিয়ে আসে বিভিন্ন দাতা সংস্থা। এক তথ্য থেকে জানা যায়, দাতা সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকে এ পর্যন্ত সাহায্য দেওয়া হয়েছে তিন কোটি বিশ লাখ ডলার বা প্রায় একশ নব্বই কোটি টাকা। এ টাকায় একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের এক কর্মকর্তার মতে প্রকল্পটি পুরোমাত্রায় সফল হয়নি। কেন হয়নি? জবাব, তহবিল সংকট। প্রায় গোটা দেশজুড়ে পানিতে আর্সেনিকের যে বিস্তার, তার মতে, এর মোকাবেলা করার জন্য আরো অনেক বেশী অর্থ দরকার। পক্ষান্তরে ইউনিসেফের বাংলাদেশস্থ প্রধান মরটিন জিয়ার সিং বলেছেন, আর এক কথা। তার কথাটি হলো, স্থানীয় এনজিও সংগঠন পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা নিরূপণ করার কাজ করে যাচ্ছে। সন্দেহ নেই কাজটি মহৎ। তবে তার প্রশ্ন হলো, স্থানীয় এনজিও সংগঠনগুলোর পরীক্ষা কতটা বিজ্ঞানসম্মত? এখন পর্যন্ত এর কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

মরটিন জিয়ার সিং আরো বলেছেন, শুধু আর্সেনিক আক্রান্ত এলাকাগুলোর মানুষের জন্য নয়, কাজ করতে হবে সবার জন্য এবং সম্ভাব্য দ্রুততার সঙ্গে। তিনি মনে করেন, সময় খুব বেশি নেই। তার বক্তব্য থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার। তা হলো, আর্সেনিক বিস্তার যত দ্রুত ঘটছে বলে ধারণা করা হচ্ছিল আসলে ঘটছে এর চেয়েও অনেক বেশি দ্রুত গতিতে। এখনই যদি বিষয়টি গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করা না হয় তাহলে অচিরেই গোটা বিষয়টি একটি ফাঁকা ডিমে তা দেয়ার সামিল হয়ে পড়তে পারে।

পাবনা হতে পানি আর্সেনিকমুক্ত করার একটি দেশী পদ্ধতির কথা জানা যায়। কোন কোন গ্রামে নাকি এ পদ্ধতিতে পানি দূষণমুক্ত করা হচ্ছে। পদ্ধতিটি যারা গ্রহণ করছেন তাদের কারো বিজ্ঞান সম্পর্কিত কোন জ্ঞান নেই। এমনকি অনেকে লেখাপড়াও জানেন না। এরা গাঁয়ের বধূ বা গৃহিণী। এতে পানি সত্যি সত্যি কতটা বিশুদ্ধ হয় তা বলা যায় না। তবে পানিতে

আর্সেনিক বিষয় সম্পর্কে গ্রামের মানুষও যে কতটা সচেতন হচ্ছে তা বোঝা যায়। প্রিন্টিং ও ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়া যোগে পানি কিভাবে বিশুদ্ধ করা যায় তা তুলে ধরা হলে এর সচেতনতা অবশ্যই আরো বাড়তো। তখন দেখা যেতো, মানুষ নিজেরাই নিজেদের খাবার পানি বিশুদ্ধ করে নিচ্ছে। কোন দাতার করুণা ভিক্ষা করতে হতো না। সঙ্গে সঙ্গে ভূগর্ভস্থ কোন স্তর হতে তোলা হলে পানি কতটা বিশুদ্ধ পাওয়া যায় তাও পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। তা' হলে সেসব স্তর থেকে ব্যবস্থা করা যেতে পারে পানি তোলার। আর্সেনিক মিউটিগেশন এণ্ড ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্টের কর্মকর্তা তহবিল সংকটের কথা বলেছেন। সন্দেহ নেই যে ব্যাপক কার্যযজ্ঞ পরিচালনার ক্ষেত্রে এটি একটি বাধা। কিন্তু বর্তমান যুগে এ বাধা অনতিক্রম্য হতে পারে না। নিজেদের চেষ্টায়ও বহু পথ পাড়ি দেয়া যেতে পারে। এছাড়া, বিশ্বে এমন বহু ধনাঢ্য দেশ এবং দাতা ও সেবা সংস্থা আছে যারা মানবিক বিপর্যয় রোধে প্রয়োজনীয় সাহায্যের হাত অবশ্যই বাড়িয়ে দেবে। প্রয়োজন শুধু সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ এবং প্রাপ্ত অর্থের সদ্ব্যবহার করা। ইচ্ছাশক্তি মনোবল নিয়ে যদি এগিয়ে যাওয়া যায় এবং সৃষ্টি করা যায় আস্থা তাহলে অর্থাভাব প্রকাণ্ড বাধা হয়ে দাঁড়াবে তা মনে হয় না। এসঙ্গে আরো একটি কথা মনে রাখা দরকার। তাহলো ভূ-উপরিস্থ পানি প্রায় সবসময়ই আর্সেনিকমুক্ত থাকে। কোন না কোনভাবে এ পানি সংরক্ষণ করা যায় কিনা তাও ভেবে দেখা যেতে পারে।

মনীষীরা বলে গেছেন, অশিক্ষা শতকরা আশিভাগ সমস্যার হেতু। তাঁদের মতে 'শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দাও—দেখবে অন্ধকার কাটতে শুরু করেছে।' তেমনি মানবদেহ যত প্রকার রোগে আক্রান্ত হয় এর অর্ধেকের বেশী দূষিত পানি পান ও ব্যবহার থেকে। বাংলাদেশের বেশীরভাগ পুকুর, দীঘি, নদী এবং শাখা নদীর পানি এখন আর বিশুদ্ধ নেই। রাসায়নিক পদার্থ ও বর্জ্যের প্রতিক্রিয়ায় তা' দিন দিন ব্যাপক ভাবে বিষাক্ত হচ্ছে। সে সাথে খাদ্যশস্যেও ছড়িয়ে পড়ছে আর্সেনিকের বিষ। 'কাজ করতে হবে সবার জন্য এবং দ্রুত। সময় বেশী নেই'-বাংলাদেশস্থ ইউনিসেফ প্রধানের বক্তব্যটি তাই প্রণিধানযোগ্য।

বাইশ

প্রাকৃতিক দুর্যোগ— বন্যা প্রলয়ংকরী ও সর্বগ্রাসী

বাংলাদেশে বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ধারাবাহিক ভাবে সর্বগ্রাসী—প্রলয়ংকরী রূপ নিয়েছে। জুলাই-আগস্ট, ২০০৪ এর নজিরবিহীন প্রলয়ংকারী বন্যা এবং সেপ্টেম্বরের নজিরবিহীন অতিবৃষ্টি দেশ ও জাতির জন্য ছিল এক মহা-বিপর্যয়। এ বন্যার উপদ্রব সর্বগ্রাসী; গোখরা সাপের ছোবলের মত। উপদ্রব শেষে তার ফিরে যাওয়ার দৃশ্যও ভয়ানক। আসতে যেমন যেতেও তেমন। এ বন্যা বাংলাদেশের জন্য নতুন নয়। স্বাধীনতার প্রায় তিন যুগেও দেশের কোন সরকার পানির দেশের পানির যথার্থ ব্যবস্থাপনা ও বন্যা নিয়ন্ত্রণে কোন স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব পালন করেনি। এজন্য বাংলাদেশের গণমানুষ উত্তরোত্তর তীব্র থেকে তীব্রতর সর্বগ্রাসী বন্যার শিকার। দশ বছরের ব্যবধানে অর্থাৎ ১৯৮৮ এবং ১৯৯৮ এর সে দু'টি বন্যার ক্ষয়-ক্ষতি থেকেও ছয় বছরের ব্যবধানে অর্থাৎ ২০০৪ এর বন্যার ক্ষয়-ক্ষতি অনেক বেশী। এর কারণ, নদী ও পানি বিশেষজ্ঞরা অবশ্যই অবগত আছেন। পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা অচল বিধায় অতিবৃষ্টির-জলাবদ্ধতা শহর-প্লাবনেরও রূপ নেয় এবং তাতে ক্ষতির পরিমাণ অবর্ণনীয় ও অপরিমেয়। বন্যার প্রভাবে পরিবেশ দূষণ মারাত্মক রূপ নেয় এবং মানুষকে সে পরিবেশে মানবেতর জীবন-যাপন করতে হয়। সরকারে যারা ছিলেন বা আছেন সবাই কম আর বেশী অবগত আছেন যে, খাল খনন-পুনঃখনন এবং নদী ও সাগরে প্রয়োজনীয় ড্রেজিং-এর অভাবে খাল-নদী মজে যায়; পলিতে সাগরের বুক উঁচু হয়ে পড়ে এবং নদীর নাব্যতা হারায়—আর বর্ষা মৌসুমে বুক উঁচু সাগরের পানি বন্যার আকারে গড়ায় সমতলে। বন্যা মানুষের জীবনে আজ এক মহা অভিশাপ। বন্যার সমস্যা কাটিয়ে উঠতে জাতিকে এ যাবৎ যে মূল্য দিতে হয়েছে এবং দিতে হচ্ছে তার সঠিক পরিমাণ নির্ণয়যোগ্য নয়। প্রশ্ন হল ঃ সরকারের যৌথ নদী কমিশন ও পানি সম্পদ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কি করছেন? বন্যার স্থায়ী নিয়ন্ত্রণে উজান আর ভাটির দেশের মধ্যেকার আঞ্চলিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথা দেশবাসী সব সরকারের আমলেই শুনতে পায়। কিন্তু তার পাশাপাশি তাতে নিজেরা নিজেদের সামর্থ্য মত কি করা হয়েছে বা হচ্ছে তা' শোনা যায় না কেন? সংশ্লিষ্ট সবার মনে রাখতে

হবে, মাথা ব্যথা যার সে ব্যথা নিরাময়ের উপায় অবলম্বনের দায়িত্বও তার। অতএব, বন্যা সমস্যায় উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণে সরকারের কোন ঔদাসীন্য দেশবাসী আর দেখতে চায় না। দেশের শহর ও উপ-শহর যেসব খাল-নদীগুলোর ধারে ছিন্নমূল মানুষের ঘর বাঁধা আর লোভী মানুষগুলোর সে খাল-নদীগুলো ভরাট করে তাতে ইটের ভাটা, বাড়ী-ঘর-ইমারত সহ নানা অবৈধ স্থাপনা এবং ওসব থেকে নির্গত ময়লা-বর্জ্য জমাট বেধে খাল-নদীর নাব্যতা তথা পানি প্রবাহের স্বাভাবিক গতি বিঘ্নিত করে। ফলে, একদিকে তা' পঁচা-গলায় বায়ু দুষিত হয়— অন্যদিকে, নদী ভাঙ্গনে জনপদ বিলীন হয়ে হাজার হাজার মানুষকে নূতন করে ছিন্নমূল করে সর্বহারায় পরিণত করে। এসব কারণে নাব্যতা হারা নদীর পানি বিপদ সীমার উপরে প্রবাহিত হলে নূতন পানি ধারণ করতে তার অক্ষমতায় শহর ও উপ-শহরবাসীদের জীবনে প্লাবনের অবর্ণনীয় দূর্দশা নেমে আসে।

বহুকাল ধরে বাংলাদেশে প্রায় প্রতিবছরই বন্যা হয়ে আসছে, আর এর প্রকোপ ক্রমাগত বাড়ছে। অতীতে বন্যা হলেও এরকম নিয়মিত হতো না এবং তাতে এখনকার মতো এত ক্ষয়ক্ষতিও হতো না। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রাকৃতিক পরিবেশের ব্যাপক পরিবর্তন ও বিপর্যয়ের কারণে পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটছে। কিন্তু এহেন অবনতি সত্ত্বেও বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য এ পর্যন্ত কোন সরকারই কোন উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। বিরোধী পক্ষে থাকার সময় শাসকশ্রেণীর এক বা একাধিক দল এ ব্যাপারে সরকারের সমালোচনা করে। আবার নিজেরা যখন ক্ষমতায় আসে তখন তাদের মধ্যে দেখা যায়, আগের সরকারের মতোই ঔদাস্য ও উদ্যোগহীনতা। এটাও বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি!

তবে এও সত্যি যে, বন্যার স্থায়ী নিয়ন্ত্রণের জন্য শুধুমাত্র বাংলাদেশের একার চেষ্টাই যথেষ্ট নয়, এর জন্য আঞ্চলিক উদ্যোগ আবশ্যক। অর্থাৎ প্রতিবেশী নেপাল, ভারত ও বাংলাদেশ—এই তিন সরকারের যৌথ উদ্যোগ এবং পরিকল্পনা আবশ্যক। তবে এই যৌথ পরিকল্পনার পূর্ব শর্ত হল, এ তিন দেশের সরকারের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক, যা' বন্যা নিয়ন্ত্রণে তারা নিজেদের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টাকে সমন্বিত করতে সক্ষম হতে পারে। এ ক্ষেত্রে নিজ নিজ দেশের জনগণের প্রতি সরকারগুলোর ভালবাসা ও অঙ্গীকারের প্রশ্নটাই বড়। এ দু'টি বিষয়ে তিনটি সরকারেরই দৃষ্টিভঙ্গির ঘাটতি যে

বিদ্যমান তা বলাই বাহুল্য। ফলশ্রুতিতে প্রত্যেক বছর বা কয়েক বছর অন্তর নেপাল, ভারত ও বাংলাদেশ বন্যায় ভাসলে বা প্রলয়ংকারী বন্যায় বিস্তীর্ণ জনপদ ধ্বংস ও কোটি কোটি মানুষের জীবন চরমভাবে বিপর্যস্ত এবং বিপন্ন হলেও স্থায়ী বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা গ্রহণে এদের কারও মধ্যে কোন তাগিদ, উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায় না।

ভারত সরকার হালে ব্রহ্মপুত্র নদের পানি সরিয়ে ভারতের অন্য নদীর সঙ্গে যুক্ত করে তাদের পানি সংকট সমাধানের কাজ করছেন। ভারতের এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের জন্য বন্যার পাশাপাশি মরুভূমির শর্তও সৃষ্টি হবে, এমনকি ভারতের আসামের জন্যও। ভারত সরকার আসামের জনগণের স্বার্থের প্রতি কতখানি উদাসীন তাদের বিভিন্ন নদী-নীতিতেই তা' প্রকাশ পায়। বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থ দেখার বিষয়তো স্বাভাবিকভাবে পরেই আসে। ভারত সরকার বন্যা নিয়ন্ত্রণে যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণের স্থলে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে অন্যান্য ভারতীয় নদ-নদীর সংযোগ স্থাপন করার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তা অবশ্যই মানবতা বিরোধী।

বাংলাদেশের করণীয় হচ্ছে, উপরোক্ত তিন আঞ্চলিক সরকারের যৌথ উদ্যোগে বন্যা নিয়ন্ত্রণের মহা পরিকল্পনার গ্রহণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখে নিজস্ব উদ্যোগে বাংলাদেশ তার স্বীয় সামর্থ্য অনুসারে বন্যা নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা করতে পারে এবং তা বাস্তবায়নও করতে পারে। এ জন্য প্রয়োজন, সরকারের প্রত্যয় ও অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গি।

বাংলাদেশের মত ভিয়েতনামেরও একটি বড় সমস্যা ছিল বন্যা। উত্তর ভিয়েতনাম সরকার বন্যা মোকাবেলার জন্য যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল তার মধ্যে ছিল মূল নদীর পাশে বিশাল জলাধার তৈরি। বন্যার সময় মূল নদীর পানি সংযোগকারী খালের মাধ্যমে জলাধারগুলোতে অতিরিক্ত পানি রিজার্ভ করা হতো। ফলে, বন্যার প্রকোপ হ্রাস পেতো এবং বন্যা হলেও তা' প্রবল ও প্রলয়ংকরী রূপ নিতে পারতো না। এতে শুধু বন্যা নিয়ন্ত্রণই হতো না, শুষ্ক মৌসুমে এ জলাধারগুলোর পানি ব্যবহার করা হতো কৃষিতে সেচের জন্য। অর্থাৎ একই পরিকল্পনার মাধ্যমে বন্যার মোকাবেলা যেমন করা যেতো তেমনি শুষ্ক মৌসুমে খরার মোকাবেলাও করা যেতো। ভিয়েতনামের সে পরিকল্পনা বাংলাদেশেও বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

২০০৪ সালের ৮ অক্টোবর একটি দৈনিকে প্রকাশিত প্রকৌশলী টিএএম নূরুল বাশার রচিত এক উপ-সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়েছে, একযোগে নদী খনন ও পুনঃখননের মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও ভূমি উন্নয়ন সম্ভব। অনেক ত্যাগে গড়া জাতীয় সম্পদ প্রলয়ংকরী বন্যা গ্রাস করে নিয়ে যায়। অথচ এ বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য আমরা কি করছি? 'বিধির বিধান না যায় খণ্ডন' এ বিশ্বাসে শুধু দর্শকের ভূমিকা অবলম্বন করেই কি চলেছি আমরা? আমাদের কি কিছুই করার ক্ষমতা নেই! কিছু তো আমরা নিশ্চয়ই করতে পারি। এটা সত্যি, আমাদের হাতে আলাদীনের চেরাগের অলৌকিক ক্ষমতা নেই, যা' দিয়ে বন্যার মত জটিল সমস্যার সমাধান রাতারাতিই করে ফেলা যায়। কিন্তু দেশ ও জাতিকে রক্ষার প্রকৃত প্রত্যয়ে সঠিক পথে অগ্রসর হতে পারলে জাতি এ সমস্যা থেকে অবশ্যই মুক্তি পেতে পারে।

সরকার বেড়িবাঁধ দ্বারা নদী শাসন তথা বন্যা নিয়ন্ত্রণে কিছু বিচ্ছিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। কিন্তু তাতে এযাবত কাংখিত সফলতা অর্জিত হয়নি। বরং কোটি কোটি টাকার অপচয় হয়েছে। দেশকে বন্যামুক্ত করতে হলে প্রথমেই উজানের পানি নির্বিঘ্নে সমুদ্রে গমনের পথ প্রশস্ত করতে হবে। তার জন্য প্রধান নদীগুলোর প্রয়োজনীয় গভীরতা ও প্রশস্ততা নিশ্চিত করা আবশ্যক।

পদ্মা, মেঘনা ও যমুনার মতো বড় বড় নদীর বুকে প্রতি বছর পলি পড়ে অনেক চর বা দ্বীপের সৃষ্টি হয়। এ চরগুলো পানির স্বাভাবিক গতি ব্যাহত করে। ফলে, বর্ষার অতিরিক্ত পানি নদীর দু'কূল ছাপিয়ে পার্শ্ববর্তী অপেক্ষাকৃত নিচু জমিগুলো প্লাবিত করে। এভাবে বছর কয়েকের মধ্যে পলি জমতে জমতে ওসব চরের আকারও বড় হয়ে যায়। এতে নদী সংকুচিত হয়ে জলধারণের স্বাভাবিক ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। বর্ষা মৌসুমে উজানের অধিক পরিমাণে পানির সঙ্গে অতি বৃষ্টির পানির প্রবাহ নদীর বুকে ক্রমাগত বেড়ে উঠা চরের কারণে বাধাগ্রস্ত হয়; দ্রুত বেগে বা প্রয়োজনীয় গতিতে সমুদ্রে গিয়ে পড়তে পারে না। তখন নদীর পানি প্রবাহ বিপদসীমা অতিক্রম করে বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগকে জলমগ্ন ও প্লাবিত করে দেয়। ফলে, বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বন্যা দেখা দেয়। সুতরাং পানির স্বাভাবিক ও নির্বিঘ্ন প্রবাহ নিশ্চিত করতে হলে আমাদেরকে জরুরী ভিত্তিতে নদী বক্ষের এ অনাকাঙ্ক্ষিত চর অপসারণের ব্যবস্থা নিতে হবে। ড্রেজিং করে নদীর নাব্যতা পুনরুদ্ধার ও

স্বাভাবিক করণ এবং মাটি কেটে চর অপসারণ করা সম্ভব। কিন্তু এতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। তাই বলে কাজটি মোটেও অসাধ্য নয়। অতএব, আমাদের মতো গরীব দেশের কি করা উচিৎ এক্ষেত্রে জাতীয় প্রত্যয় ভঙ্গেরও কোন অবকাশ নেই। উন্নয়ন সহযোগী আন্তর্জাতিক কোন সংস্থা বা বন্ধু দেশের সক্রিয় সহায়তা অর্জন আবশ্যক। আর তা' সম্ভব না হলে অবশ্যই এর বিকল্প উপায় খুঁজে বের করতে হবে। হাত গুঁটিয়ে বসে থাকলে সমস্যার সমাধান হবে না, বরং তা' প্রকট থেকে প্রকটতর হতে থাকবে।

বাংলাদেশে প্রচুর সস্তা জনবল রয়েছে, যার এক বিশাল অংশ প্রায় সারা বছরই বেকার দিনাতিপাত করে। দেশের এ সস্তা জনশক্তিকে বন্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে শুষ্ক মৌসুমে নদী খনন, পুনঃখনন এবং চর কাটার কাজে নিয়োগ করা যায়। দেশে তৈরী অথবা আমদানি করা স্বল্প মূল্যের ছোট ছোট খনন-মেশিন ব্যবহার করে সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হওয়া যায়। এতে পর্যায়ক্রমে বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধান আশা করা যায়। শুকনো মৌসুমে অর্থাৎ বছরের ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল বা মে মাস পর্যন্ত দেশের নদীগুলোর পানি কমে গেলে চর বা দ্বীপগুলো জেগে উঠে। তখন প্রাপ্তিসাধ্য সস্তা জনবল ব্যবহার করে ওসব চরের মাটি কাটার কাজটি সম্পন্ন করা যায়। এই সময়েই কম খরচের ছোট ছোট মেশিন ব্যবহার করে নাব্যতা হারা নদীগুলো যথার্থ খনন ও পুনঃখনন করা সম্ভব।

প্রশ্ন হচ্ছে, ড্রেজিং বা খননপ্রাপ্ত মাটির উপযুক্ত ব্যবহার কোথায় হবে? এ জন্য লক্ষ্য ভিত্তিক জরীপ চালাতে হবে। সমগ্র বাংলাদেশই পলি দ্বারা গঠিত একটি দেশ। প্রতি বছর দেশের নদীগুলো ৪ বিলিয়ন টন পলিমাটি বহন করে আনে। সে পলি জমেই চরের সৃষ্টি হয়। এ চর খনন থেকে প্রাপ্ত মাটি কিছু ইঞ্জিনচালিত নৌকা বা ফ্লাটবেড ফেরী যোগে বহন করে নদীর তীরে জমা করে সেখান থেকে তা' নিকটবর্তী ভূ-ভাগের পরিত্যাক্ত নিম্ন জলাভূমিতে ফেলে তাকে উঁচু জমিতে পরিণত করে চাষযোগ্য করা যায়। তাছাড়া, সেখান থেকে ট্রাক বা তদ্রুপ অন্যান্য যানবাহন যোগে নদীর তীরের অদূরে বা অপেক্ষাকৃত দূরে অব্যবহৃত জলাশয়, খাল-বিল, ডোবা-নালা, হাজা-মজা পুকুর, অ-ফসলি অথবা এক-ফসলি নিচু জমি, সড়ক ও মহাসড়কের পাশের খাদ ইত্যাদি ভরাট করে তাদের আবাদি জমিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব। এ প্রেক্ষিতে কিছু বাস্তবসম্মত উদাহরণ দেয়া যায়। যেমন —

১) পলিতে জেগে উঠা যমুনা সেতুর ভাটির চর কেটে নদীর পূর্ব পাড়ের জেলা টাঙ্গাইলের কয়েক শত বর্গমিলোমিটার অনাবাদি নিচু জমি ভরাট করে তাকে উর্বর চাষযোগ্য জমিতে রূপান্তরিত করা যায়।

২) পদ্মার গোয়ালন্দস্থ পশ্চিম পাড়ের প্রায় আধা কিলোমিটার চর কেটে পাটুরিয়া/দৌলদিয়া ফেরি যোগাযোগের রাস্তা সুগম করা সম্ভব। অন্যদিকে দৌলদিয়া থেকে রাজবাড়ী/ফরিদপুর-এর মাঝে কয়েক শত কিলোমিটার জমি বছরের প্রায় সময় ফসল শূন্য থাকে। এগুলোকেও এ চরের মাটি দিয়ে ভরাট করে ২/৩ ফসলি জমিতে রূপান্তর করা সম্ভব।

৩) ঢাকা-ভাঙ্গা রুটে মাওয়া এবং চরজানাজাত ফেরিঘাটে পদ্মা নদীর মাঝে প্রস্থে দেড় কিলোমিটার আর দৈর্ঘ্যে ৮/৯ কিলোমিটার একটি বিশাল চর রয়েছে। অন্যদিকে পার্শ্ববর্তী মাদারীপুরে, বিশেষ করে শিবচর এলাকায় প্রচুর নিচু ভূমি রয়েছে, যেগুলো বছরের বেশিরভাগ সময় জলমগ্ন থাকে। চর কেটে পাইপ লাইন দিয়ে অথবা খালের মধ্য দিয়ে মাটি বহন করে এগুলোকে ভরাট করা সম্ভব।

৪) যমুনা নদীর বুকে মানিকগঞ্জের শিবালয় চর যমুনা নদীর প্রায় ৭০ শতাংশ প্রস্থ জুড়ে আছে। এ চর থেকে প্রাপ্তিসাধ্য মাটি দিয়ে পাবনা এবং মানিকগঞ্জের নিচু জমি ভরাট করা সম্ভব।

৫) গোপালগঞ্জের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চল এবং নাজিরপুরের উত্তরে বিস্তৃত বিলাঞ্চল, যা সারা বছর পানির নিচে থাকে, মধুমতি চর থেকে প্রাপ্তিসাধ্য মাটি দিয়ে ভরাট করা যায়।

৬) শুষ্ক মৌসুমে ফারাক্কা বাঁধের এপার অর্থাৎ বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে আরিচা পর্যন্ত পদ্মা নদীকে একটি সরু খালের মতো দেখায়। বর্ষা মৌসুমে অতিরিক্ত পানি প্রবাহে প্রচুর পরিমাণ পলি এসে জমা হয় এ নদীতে। এ পলি মাটি খনন করে নদীর দু'তীরে কমপক্ষে আধা-কিলোমিটার প্রশস্ত উচু বাঁধ নির্মাণ করা যায়। শুষ্ক মৌসুমে ফারাক্কা পদ্মায় পানি প্রবাহ কমিয়ে দেয়। ফারাক্কার প্রভাবে বর্ষা মৌসুমে এ নদীতে প্রবাহিত অতিরিক্ত পানি আটকিয়ে রাখার জন্য সে উচু বাঁধের মধ্যে সে আধা-কিলোমিটার পরিমাণ পদ্মাকে একটি প্রশস্ত জলাধার হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

৭) চাঁদপুরে মেঘনা ও পদ্মার মিলিত মোহনাটি প্রায় ৩০ কিলোমিটার এলাকাব্যাপী বিস্তৃত। এ বিস্তীর্ণ এলাকায় শত শত চর জেগে উঠেছে। এসব চর নদীর পূর্ব ও পশ্চিম তীর ভাঙ্গা পলি ও বালি মাটি দিয়ে গঠিত হয়েছে। এসব চর কেটে অপসারণ করে নদীর পশ্চিম তীর সংরক্ষণ করা গেলে একদিকে যেমন নদী ভাঙন রোধ সম্ভব অপরদিকে বর্ষা মৌসুমে সৃষ্ট প্রবল ঘূর্ণীস্রোত থেকেও রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

৮) নদী-তীরবর্তী সড়ক-মহাসড়কগুলোতে পলির অতিরিক্ত মাটি কাজে লাগানো যায়। সড়ক তৈরির সময় মাটি খনন করার ফলে দু'পাশে যে খাদের সৃষ্টি হয়েছে সেগুলো সে চরের মাটি দিয়ে ভরাট করা যায়। এতে ভবিষ্যতে অতিরিক্ত খরচ না করেই রাস্তার উন্নয়ন তথা প্রসস্থকরণ সম্ভব।

এ ভাবে বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলা করা গেলে জীবন ও সম্পদের যেমন ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাস পাবে তেমনি বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসন ব্যয়ও কমে যাবে। বন্যার মত এ জাতীয় মহাসমস্যা থেকে পরিত্রাণ পেতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাহায্য পাবার আশায় বসে না থেকে উল্লেখিত কাজগুলোর প্রতি আমাদেরকে অবশ্যই আন্তরিক ও সক্রিয় হতে হবে। কাজগুলোর উপকারিতা শুধু বন্যা সমস্যার সমাধানেই সীমাবদ্ধ নয়।

উল্লেখিত নীচু জমি ও বিল পলি মাটিতে ভরাটের ফলে কৃষি উপযোগী হয়ে উঠবে। এতদিন যেসব নীচু জমিতে আবাদ হতো না অথবা বছরে একটি ফসল হতো সেখানে তখন একের অধিক ফসল ফলানো সম্ভব হবে। এতে দেশের খাদ্যশস্য আমদানি ব্যয় হ্রাস পাবে। উল্লেখ্য, এখনো বাংলাদেশ প্রতিবছর দুই মিলিয়ন টনের মতো খাদ্যশস্য বিদেশ থেকে আমদানি করে থাকে।

নদীর বুকে গড়ে উঠা চরের মাটি দ্বারা দেশের রাস্তার দু'ধারের খাদগুলো পুরণ করলে নতুন জমি একোয়ার করা ছাড়াই সড়ক ও মহাসড়কগুলোকে দুই লেনের পরিবর্তে ৪ লেনে চওড়া করা যাবে। আর সে সড়কগুলোর দু'ধারে প্রচুর বৃক্ষ রোপন করা যাবে। নদী মোহনায় ড্রেজিং দ্বারা সমুদ্র উপকূলে পলি মাটি ফেলে নতুন জমি গড়ে তোলাও সম্ভব।

প্রস্তাবিত উপরোক্ত কাজগুলোকে বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পভূক্ত করে প্রকল্পটি হাতে নিলে তাতে হাজার হাজার শ্রমিকের যেমন প্রয়োজন তেমনি তার জন্য

একটি দক্ষ জনশক্তি ও আর্থিক ব্যবস্থাপনারও প্রয়োজন পড়বে। এর জন্য একটি লাগসই অবকাঠামো তৈরিতেও প্রয়োজন পড়বে সঠিক ও সুদক্ষ লোকবলের। আমাদের সেনাবাহিনীকেও এ মহান কাজে নিয়োজিত করা যেতে পারে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশ একটি ভাটির দেশ। উজান থেকে আসা পানি এদেশের নদ-নদীগুলো দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়। এ অঞ্চলের বৃহত্তর স্বার্থে পার্শ্ববর্তী সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সহযোগিতায় বন্যা-সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে হবে। এই ব্যাপারে প্রখ্যাত পানি ও বন্যা বিশেষজ্ঞ প্রয়াত বি.এম আব্বাসের একটি প্রস্তাবনায় নেপাল ও ভুটানে জলাধার নির্মাণ এবং পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প স্থাপনে সহায়ক ভূমিকার কথা রয়েছে। এমন ধরনের প্রস্তাবনা নিয়েই ভারত সহ সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর মধ্যে আলোচনা হওয়া উচিত। উজানে বাঁধ দিয়ে পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে একদিকে যেমন নিম্ন অঞ্চলের সমভূমিতে বন্যার প্রকোপ স্তিমিত করা যায়, তেমনি উত্তর-পূর্ব হিমালয় বেষ্টিত বিশাল উঁচু অঞ্চলের জন্য লক্ষ লক্ষ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনও করা যায়।

বন্যা সমস্যার সমাধানকল্পে রাজনৈতিক সদিচ্ছার কথা মুখে মুখে শোনা গেলেও পাকিস্তান আমল থেকে আজও পর্যন্ত তার রূপায়নে সুপরিকল্পিত তেমন কোন পদক্ষেপ হাতে নেয়া হয়নি। এ কারণে দেশ বিভাগের সময় থেকে বন্যা সমস্যা একটি প্রধান সমস্যা হিসেবে রয়ে গেছে। তখন অভিযোগ ছিলো যে, পাকিস্তানের ফেডারেল সরকার এ অঞ্চলের বন্যা সমস্যাকে বরাবরই অবহেলা করেছে। দুঃখের বিষয়, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে আজ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক অথবা অগণতান্ত্রিক কোন সরকারই বন্যা সমস্যা সমাধানের দিকে সক্রিয় ও ফলপ্রসূ দৃষ্টিপাত করেননি। যে কোন প্রচেষ্টা স্বার্থান্বেষী ও দুর্নীতিপরায়ণ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও আমলাদের শঠতা এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় মুখ থুবড়ে পড়েছে। বন্যা কবলিত দেশের অসহায় গণমানুষকে জিম্মি করে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে পরিস্থিতি মোকাবেলা ও বন্যা পুনর্বাসনের নামে যে অর্থ-সম্পদের সাহায্য পাওয়া গেছে তার প্রায় সবই লুটপাট হয়ে গেছে। অতএব, সময় এসেছে বন্যা নিয়ন্ত্রণে সক্ষমতার আত্মবিশ্বাসে জাগ্রত হবার এবং নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ শুরু করে এগিয়ে চলার।

২০০৪ সালের জুলাই-আগস্টের প্রলয়ংকারী বন্যার প্রেক্ষিতে তা' অত্যন্ত জরুরী। কারণ এখানে শুধু বন্যাই নয়, খরাও এক বড় সমস্যা। ভারত যেভাবে বাংলাদেশকে পানির হিস্যা থেকে নিয়মিতভাবে বঞ্চিত করে চলেছে তাতে সারা বছর প্রয়োজনীয় পানির সংকট মোকাবেলায় ভূগর্ভ থেকে পানি পাম্প করে উত্তোলন করতে হচ্ছে। এর ফলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ক্রমশ ও দ্রুত নেমে গিয়ে নানা সংকট সৃষ্টি করেছে, যার মধ্যে দুটি মারাত্মক। প্রথমতঃ বাংলাদেশ মরুভূমিতে পরিণত হওয়ার মতো শর্ত তৈরি হচ্ছে আর দ্বিতীয়তঃ পানিতে আর্সেনিকের পরিমাণ মারাত্মক ভাবে বৃদ্ধি পেয়ে দেশের জনগণের স্বাস্থ্যের জন্য এক বিরাট হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশে আর্সেনিকের ব্যাপকতার বিবরণ আগেই দেয়া হয়েছে।

ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গা বাংলাদেশে ঢোকার পর থেকে যমুনা ও পদ্মা নামে পরিচিত হয়ে কয়েকশ' কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। এ দীর্ঘ নদীপথের দু'পাশে উপযুক্ত জায়গায় ছোট বড় জলাধার খনন করে বর্ষা ও বন্যার মৌসুমে পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা বন্যা মোকাবেলার একটি ফলপ্রসূ উপায় হতে পারে। এ কাজের জন্য বিদেশী মুদ্রা অথবা বিশাল অংকের টাকার প্রয়োজন পড়ে না। উপরন্তু, এতে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর সমন্বয় করে জলাধার ও সংযোগ খাল খননের প্রকল্প সম্প্রসারিত করে স্বল্প সময়ের মধ্যেই বন্যা মোকাবেলায় সাফল্য অর্জন সম্ভব।

জাতীয় স্বার্থে এ সাফল্যের পথে কোন বাধা দূর করা কি অসম্ভব? সরকারী ঔদাস্য ও অনীহার কারণে তার জন্য যথাযথ উদ্যোগের অভাব থাকলেও ২০০৪ সালের জুলাই-আগস্টের সর্বগ্রাসী বন্যার পর তা' দূর হয়ে যাবে না কেন? তাছাড়া, আন্তর্জাতিক কোন স্বার্থ এতে বাধা হয়ে থাকলেও জাতীয় স্বার্থের কাছে তা' ম্লান হয়ে যাওয়ার কথা নয় কি? পানি সংকট নিরসনের জন্য বাংলাদেশে বিদেশ থেকে আমদানী করা লাখ লাখ গভীর এবং অগভীর নলকূপ বসানো হয়েছে। এর জন্য সরকারকে বৈদেশিক ঋণ নিতে হয়। এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে স্বার্থান্বেষীদের সম্পৃক্ততার কথা জানা যায়। স্বার্থান্বেষী নীতি-নির্ধারকদের প্রণীত নলকূপ আমদানী সংক্রান্ত নীতি কৃষিক্ষেত্রে দুর্নীতির জন্ম দেয়। দেশী-বিদেশী এ চক্রের তৎপরতা বাংলাদেশে দ্রুত বেড়ে যাওয়ার কারণে বর্তমানে পানি সংকট সমাধানের প্রধান উপায়—গভীর ও অগভীর নলকূপ অবাধ আমদানি বন্ধ

করা। এ লক্ষ্যেই দেশের স্বার্থ বিরোধী এ অপতৎপরতা বন্ধ করা জরুরী। কিন্তু নলকূপ আমদানি বন্ধ না হলে বাংলাদেশ যে দ্রুত মরুভূমিতে পরিণত হওয়ার দিকে অগ্রসর হবে!!

গভীর নলকূপ আমদানি বন্ধ করা সম্ভব। তার জন্য প্রয়োজন পানির বিকল্প ব্যবস্থার আশু পদক্ষেপ গ্রহণ। এ বিকল্প ব্যবস্থার পাশাপাশি একদিকে আন্তর্জাতিক পানির ন্যায্য হিস্যার জন্য নিকটতম প্রতিবেশী ভারতের সক্রিয় সহযোগিতা যেমন দরকার, তেমনি তার বেশী দরকার অভ্যন্তরীণ ভাবে প্রাপ্তিসাধ্য সব পানির যথাযথ ব্যবস্থাপনা।

যে অভিন্ন ৫৪টি নদ-নদী ভারতের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে ভারত ইতোমধ্যে তার ৫৩টিতে বাঁধ, গ্রোয়েন এবং স্পার নির্মাণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক আইন লংঘন করে অবৈধ ভাবে নদীশাসন করে চলেছে। এতে নদ-নদীগুলোর স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হওয়ার কারণে শীত মৌসুমে প্রচণ্ড খরা এবং বর্ষাকালে বাংলাদেশ সহ ভারতের আসাম, পশ্চিম বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যায় নেমে আসছে প্রলয়ংকারী বন্যা। এর ফলে, একদিকে বাংলাদেশের উর্বর জমিতে লবণাক্ততা যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি অন্যদিকে শুরু হয়েছে পরিবেশ ধ্বংস সহ মরুভূমিতে রূপান্তরের ভয়াবহতা। শুধু ফারাক্কার প্রভাবে বাংলাদেশের প্রায় ৪ কোটি মানুষ আর্সেনিকে আক্রান্ত হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতের এই পানি আগ্রাসন অব্যাহত থাকলে আগামী ৩০/৪০ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ নামক জনপদটির অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। আর যদি ভারত আন্তঃনদী সংযোগ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে, তবে নিশ্চিতভাবে বাংলাদেশ মরুভূমিতে পরিণত হয়ে যাবে।

এটা সত্যি যে, বাংলাদেশ হিমালয়ের ড্রেনেজ সিস্টেম হিসেবে কাজ করছে। খরা-বর্ষা উভয় মৌসুমে হিমালয়ের পানি বাংলাদেশের ওপর দিয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়ে। বাংলাদেশের অবস্থানজনিত বাস্তবতা এই যে, বর্ষা মৌসুমে হিমালয়ের পানি দ্বারা বাংলাদেশ প্লাবিত হয়। ভারতের ৫৩টি নদীতে বাঁধ, গ্রোয়েন এবং স্পার নির্মাণের দ্বারা অবৈধ, অমানবিক এবং নিষ্ঠুর নদীশাসনের ফলে বাংলাদেশে খরা এবং বন্যার তীব্রতা দিন-দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পাবে। এ-ই যখন বাস্তবতা তখন ঠাণ্ডা মাথায় যত

উচ্চাভিলাষী ও ব্যয়বহুল হোক না কেন, দেশ ও জাতিকে বাঁচাতে বাংলাদেশকে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

পাকিস্তানের সময়ই নির্মিত হয়েছিল ফারাক্কা বাঁধ। বাংলাদেশ ভারতের একতরফা ভাবে বাঁধ নির্মাণ ও পানি অপহরণ রোধ করতে পরেনি। দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে এর মারাত্মক প্রতিক্রিয়ায় বিপর্যস্ত হচ্ছে বাংলাদেশ। পুরো উত্তরবঙ্গে মরুকরণ হচ্ছে, লবণাক্ততা বাড়ছে, জীববৈচিত্র্য নষ্ট হচ্ছে। পদ্মা আন্তর্জাতিক নদী হিসেবে Lower reparian-এর অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফারাক্কা বাংলাদেশের জন্য এক চিরস্থায়ী অভিশাপ। বাংলাদেশের প্রায় চৌদ্দ কোটি মানুষ এ অভিশাপ থেকে মুক্তি চায়। ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদী আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ৩০ বছরের জন্য ফারাক্কা পানি চুক্তি সম্পাদিত হয়। কিন্তু তাতে অনেক ফাঁকি-প্রবঞ্চনা রয়ে গেছে। বাংলাদেশ পানির পুরো হিস্যা থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে। সে চুক্তিতে Guarantee Clause যেমন নেই তেমনি Arbitration Clause ও নেই। দেশের অপূরণীয় ক্ষতির প্রেক্ষিতে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ফরাক্কা ইস্যুকে জাতিসংঘেও উত্থাপন করেছিলেন।

পানি বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বড় সম্পদ। Bangladesh is a product of river system. বাংলাদেশ নামের এ জনপদ নদীমাতৃক এবং নদী অববাহিকার এক বদ্বীপ। দু'টি প্রধান আন্তর্জাতিক নদী বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্র। বাংলাদেশের পানি প্রবাহের যত নদ-নদী আছে তার প্রায় ৮০ ভাগই পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্রের উপনদী বা শাখা নদী হিসেবে প্রবাহিত। বাংলাদেশের ৫৭টি আন্তর্জাতিক নদী সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে, তার মধ্যে ৫৪টিই ভারতের সীমান্ত দিয়ে।

এখন ভারত ব্রহ্মপুত্রের পানি তথা বাংলাদেশের যমুনা থেকে প্রত্যাহার করতে চায়। ১৯৫৪ সালে সেনা প্রকৌশলী এক কর্নেল ভারতের উত্তরাঞ্চলে ক্রিসেন্টের মত খাল খনন করার পরিকল্পনা করেন। ব্রহ্মপুত্রের পানিকে এ খালে নিয়ে আসার কথা ছিল। তেমনি ১৯৭০ সালে Dr. K. L Rao নামে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর পদ্মার উজানে খাল কেটে ব্রহ্মপুত্রের পানি উড়িষ্যার মহানদীতে এবং মহানদী থেকে দক্ষিণ ভারতের কৃষ্ণা ও কাবেরী নদীতে বন্টনের পরিকল্পনা করেন। Dr. K. L Rao এক সময়ে নেহরু

মন্ত্রীসভার পানিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ১৯৭৫ সালে ভারতের প্রস্তাবিত জাতীয় পানি নীতিতে Inter Basin Water Transfer বিষয়টি ড. রাওয়ের সক্রিয় উদ্যোগে প্রাধান্য পায়। ১৯৮৭ সালে ভারতের জাতীয় পানি নীতিতে জাতীয় নদীগুলোর মধ্যে আন্তঃসংযোগ স্থাপন বিষয়টি অনুমোদিত হয়। ইন্ডিয়ান সুপ্রিমকোর্ট আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পটি সরকারকে ২০১৬ সালের মধ্যে বাস্তবায়নের নির্দেশ দেন। ২০০৩ সালে ১৫ আগস্ট ভারতের রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালাম আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পে ভারত সরকারের সর্বোচ্চ সক্রিয়তার কথা উল্লেখ করেন।

ভারতের Mega Interlinking River Project একটি ড্রিম প্রজেক্ট। এ ড্রিম প্রজেক্ট সম্বন্ধে এতগুলো কথা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য, ভারত প্রকল্প বাস্তবায়নে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। তারা বসে নেই। ভারত সরকার ইতো-মধ্যে প্রায় ছত্রিশ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করেছে বলে খবরে প্রকাশ। এ মহাপ্রকল্প বাস্তবায়নে বাংলাদেশের ওপর এর মহাপ্রতিক্রিয়া বাংলাদেশের মানুষ এখনও গভীরভাবে উপলব্ধি করেনি। Rhyme of the Ancient Mariner-এর কবি Colridge-এর সেই বিখ্যাত লাইন দুটো water water every-where, not a drop to drink পরিবর্তিত হয়ে বাংলাদেশের মানুষের জন্য হবে water water no where, if at all anywhere, not a drop to drink।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে বাংলাদেশের মোহনায় মিঠা পানির চাপ কমে যাবে। সমুদ্রের লবনাক্ততা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে। মাটির লবণাক্ততা বেড়ে যাবে। মাটি উর্বরতা শক্তি হারাবে, খাদ্যশস্য উৎপাদন কমে যাবে। ভূগর্ভস্ত পানির স্তর নেমে যাবে। আর্সেনিকের মাত্রা বেড়ে যাবে। World heritage সুন্দরবন ধ্বংস হয়ে যাবে। খাবার পানির সংকট দেখা দেবে। বাংলাদেশের নদীগুলো শুকনো মৌসুমে শুকিয়ে যাবে, নদীগুলো স্রোতহীন হয়ে পড়লে তার তলদেশ ভরাট হয়ে যাবে। নদীগুলো যেমন নাব্যতা হারাবে তেমনি পানি ধারণ ক্ষমতা কমে যাবে এবং বর্ষাকালে বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চল অতি দ্রুত মরুভূমিতে পরিণত হবে। স্থানীয় আবহাওয়ায় ও জলবায়ুতে ব্যাপক পরিবর্তন আসবে। ফলে, এখানকার সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য বিলুপ্ত হয়ে যাবে। ভূমিকম্পের আশংকা বেড়ে যাবে। এক কথায়, বাংলাদেশের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যেতে পারে।

২০০৪ সালের ১০ আগস্ট দেশের একটি দৈনিকে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এ বছরের জুলাই-আগস্টের প্রলয়ংকরী বন্যা ও ভয়াবহ নদীভাঙ্গনে ১১ লাখ বাড়িঘর ও প্রতিষ্ঠান, আড়াই লাখ একর ফসলী জমি এবং আড়াই হাজার কিলোমিটার বাঁধ এবং বন্যা প্রতিরোধ স্থাপনা সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। নদীভাঙনের ফলে আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রায় ১২ লাখ একর ফসলী জমি, ২৪ লাখ বাড়ি-ঘর, ১৮ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং প্রায় ৩ হাজার কিলোমিটার বাঁধ ও বন্যা প্রতিরোধ স্থাপনা। ছোট-বড় ১২টি নদীর ভাঙনের মুখে ২১টি জেলা শহর ও ১২০টি উপজেলা সদর বিলীন হতে চলেছে। প্রতি বছরই অব্যাহত ভাঙনের ফলে পাল্টে যাচ্ছে ভাঙনকবলিত এলাকার মানচিত্র। সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলার আয়তন। বন্যার পানি কমার সঙ্গে সঙ্গে নদীভাঙনের মাত্রাও বৃদ্ধি পায়। ভবিষ্যতে ভাঙন তীব্রতর হলে নতুন করে আরও লাখ লাখ মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়বে, হাজার হাজার বাড়ি-ঘর নিশ্চিহ্ন হবে, নদীগর্ভে বিলীন হবে লাখ লাখ একর ফসলী জমি। এ অবস্থায় নদীর পাড়ের মানুষদের দুঃখ, কষ্ট, দুর্ভোগ আরও বাড়বে। জীবন হয়ে পড়বে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। উদ্বাস্তু মানুষের শহরমুখী স্রোতও বাড়বে। বাড়িঘর, জমি-জমা ও সহায় সম্বলসহ সবকিছু হারিয়ে হাজার হাজার মানুষ পরিণত হবে ভূমিহীন, গৃহহীন ও উদ্বাস্তুতে। পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ, নদী গবেষণা ইনষ্টিটিউট সহ সংশ্লিষ্ট দফতর থেকে এসব তথ্য পাওয়া যায়।

হিসাব মতে, দেশের এক-তৃতীয়াংশ মানুষ কোন না কোন নদ-নদীর পাড়ে বসবাস করে। বন্যা ও ভাঙনে প্রতি বছর কমপক্ষে ৬০ হাজার মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে। প্রমত্তা পদ্মা, যমুনা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র, ধলেশ্বরী, তিস্তা, মহানন্দা, আত্রাই, মনু, সুরমা, করতোয়া, গজারিয়া, তেঁতুলিয়া, আড়িয়াল খাঁ প্রভৃতি নদীর পাড় প্রায় সারা বছর ধরেই ভাঙে। বন্যার পানি নেমে যাওয়া শুরু করলেই এ ভাঙন আরও প্রবল হয়। এসব নদীর প্রবল ভাঙনের মুখে ইতোমধ্যেই জেলা শহর পঞ্চগড়, দিনাজপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, পটুয়াখালী, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, চাঁদপুর, ভৈরবসহ ২১টি জেলা শহর মারাত্মক হুমকির মুখে। মুন্সীগঞ্জের লৌহজং, সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর, কাজীপুর, কৈজুরী, বেলকুচি, পাবনার সুজানগর, জামালপুরের ইসলামপুর, লালমনিরহাটের হাতিবান্ধা, বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জ, বাকেরগঞ্জ,

মুলাদী ও নাজিরপুর, ভোলার চরভদ্রাসন, পটুয়াখালীর দুমকী, ফরিদপুরের ভাঙ্গা, টাঙ্গাইলের ভুয়াপুর, সদর, কালিহাতি, বগুড়ার সারিয়াকান্দি, চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জসহ ১২০টি উপজেলা সদর এবং এর আওতাধীন এলাকা ব্যাপকভাবে ভাঙনের শিকার হয়েছে। বগুড়ার সারিয়াকান্দিতে যমুনা ও বাঙালি নদীর প্রবল ভাঙনের ফলে উভয় নদীর মধ্যে এখন ব্যবধান খুব সামান্য। সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরেও যমুনা-হুরাসাগর ও করতোয়া নদীর ভাঙনের ফলে এই তিন নদী একসঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছে। ভাঙনের বর্তমান তীব্রতা অব্যাহত থাকলে এসব নদী একত্রে মিশে গেলে পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করবে বলে পানি বিশেষজ্ঞদের আশংকা। মুন্সীগঞ্জের কীর্তিনাশা পদ্মার প্রবল ভাঙনে লৌহজং উপজেলা সদরও প্রায় পুরোটাই বিলীন হয়ে গেছে। যমুনা ও ধলেশ্বরীর প্রবল ভাঙনে গাইবান্ধা, জামালপুর, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, রংপুর, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, প্রমত্তা পদ্মার ভাঙনে চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, ফরিদপুর, শরীয়তপুর, মুন্সীগঞ্জ, খরস্রোতা মেঘনার ভাঙনে ভোলা, চাঁদপুর, কীর্তনখোলা, গজারিয়া, আড়িয়াল খাঁ ও ইলিশা নদীর ভাঙনে বরিশাল, পায়রা ও লোহালিয়া নদীর ভাঙনে পটুয়াখালী, তেঁতুলিয়ার ভাঙনে বাকেরগঞ্জ, সুরমা ও খোয়াই নদীর ভাঙনে সিলেট ও কানাইঘাট, তিস্তার ভাঙনে নীলফামারী, বড় গৌরাঙ্গ, দারুচিরা, রামনাবাদ ও ডিক্রী নদীর ভাঙনে গলাচিপা, লৌজহং নদীর ভাঙনে নওগাঁ ও মাদারীপুর, যমুনা, পদ্মা ও কুমার নদীর ভাঙনে লক্ষ্মীপুর সহ ভাঙন চলছে সারাদেশ জুড়েই। দেশের নদ-নদীগুলোর এই ভাঙন রোধে প্রতি বছরই পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে শত শত কোটি টাকার প্রতিরক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। কিন্তু বছরের পর বছর ধরে একদিকে ভাঙন যেমন অব্যাহত রয়েছে, তেমনি অব্যাহত রয়েছে ভাঙন প্রতিরোধ কর্মসূচীও।

২০০৪ সালের জুলাই-আগস্টের বন্যা ও ভাঙনে বাঁধ, বন্যা প্রতিরোধ বাঁধ ও গ্রোয়েন, নদীর পাড় সংরক্ষণ ও প্রতিরক্ষা স্থাপনার ক্ষয়ক্ষতির প্রাথমিক পরিমাণ ৬১১ কোটি টাকা। এর মধ্যে তাৎক্ষণিক প্রয়োজন প্রায় ১০০ কোটি টাকা। জরুরী মেরামত ও সংস্কারের জন্য সরকারের রাজস্ব খাতের অর্থ দিয়ে বন্যার পানি নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাজ করার নির্দেশ দেয়া হলেও বাকি ৫০০ কোটি টাকার ব্যবস্থা করাও জরুরী।

২০০৪ সালের উক্ত বন্যায় রাজধানীর এক-তৃতীয়াংশের বেশি প্লাবিত হয়েছে। রাজধানী ঢাকাকে বন্যা ও জলাবদ্ধতামুক্ত রাখতে প্রধানমন্ত্রী বেগম

খালেদা জিয়া সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণের কথা জানিয়েছেন। পশ্চিমাঞ্চলে শহররক্ষা বাঁধের কারণে উত্তরা, গুলশান, মোহাম্মদপুর, মিরপুর, ধানমন্ডি, লালবাগ, সূত্রাপুর প্রভৃতি এলাকায় পানি প্রবেশ করতে পারেনি। কিন্তু পূর্বাঞ্চলে এ ধরনের বাঁধ না থাকায় সবুজবাগ, মতিঝিল ও ডেমরার বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়েছে। বন্যার পাশাপাশি ড্রেন ও স্যুয়ারেজ লাইনের দূষিত পানি লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তোলে। পানি নামবার গতি ছিল ধীর। ড্রেন-স্যুয়ারেজ উপচিয়ে উঠা পানি কমার গতি আরও ধীর। বিপুল অর্থ ব্যয়ে রাজধানীর সড়কগুলো কাটাছেঁড়া করে বানানো ড্রেন ও স্যুয়ারেজ লাইন কেন এরূপ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হল তার কারণ পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ দরকার। ডিজাইনে ত্রুটি ছিল কিনা, রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সময়মত করা হয়েছিল কিনা, এ সব তলিয়ে দেখা জরুরী। জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সহ ওয়াসা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার কার্যক্রম ঢেলে সাজাবার আবশ্যকতাও রয়েছে। রাজধানীর চতুর্দিকে জনবসতি সম্প্রসারিত হচ্ছে। সহজেই বন্যাকবলিত হতে পারে, এমন নিচু এলাকায়ও বসতবাড়ি ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মিত হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে এ পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটবে, এমন সম্ভাবনা কম। এ বাস্তবতাকে সামনে রেখেই স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন আবশ্যক। জাতিসংঘের দুর্যোগ সহায়তা গ্রুপ এ কাজে সহায়তা করতে পারে। ১৯৯৮ সালের ভয়াবহ বন্যার পর পূর্বাঞ্চলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কাজও শুরু হয়। পানি উন্নয়ন বোর্ডের সূত্র মতে, বাঁধের জন্য নির্ধারিত এলাকার কোন কোন অংশের মাটি এ ধরনের স্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণের অনুপযুক্ত বলে বিশেষজ্ঞদের একটি প্রতিবেদন কাজের গতি মন্থর করে দেয়। দাতাদের সাহায্যও নিশ্চিত হয়নি। বিভিন্ন দাতা দেশ ও সংস্থা এ প্রকল্পে সহায়তা করতে আগ্রহ প্রকাশ করলেও বন্যামুক্ত এলাকার জমি কীভাবে ব্যবহার হবে, সে বিষয়ে বিশ্বব্যাংক আগাম পরিকল্পনার উপর গুরুত্ব দিচ্ছে। তবে এ কারণে কালক্ষেপন কাঙ্ক্ষিত নহে। ঢাকা যেভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে, বাঁধের স্থান নির্বাচনের সময় তাও বিবেচনায় রাখা দরকার। ২০০৪ সালের জুলাই-আগস্টের বন্যার পর অতিবৃষ্টিতে জলাবদ্ধ আট লাখ মানুষের আবাসিক ও শিল্প এলাকা—ডিএন্ডডি বাঁধ এলাকা একসময় ছিল কৃষি জমি। বুড়িগঙ্গা ও বালু নদীর অপর তীরও এখন 'ঢাকা শহর'। নারায়ণগঞ্জ, সাভার ও টঙ্গীকে রাজধানীর অংশ বলা যায়। গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ ও নরসিংদী-ভৈরবও বেশিদিন 'রাজধানীর বাইরে' থাকবে না। সড়ক, বিদ্যুৎ,

পানি, টেলিফোন, গ্যাস প্রভৃতি খাতের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ণের সময় এ বাস্তবতা বিবেচনা রাখা দরকার। এবারের ভয়াবহ বন্যার অভিজ্ঞতার পর স্বল্পমেয়াদে কিছু কাজ করতেই হবে। তবে মূল জোর দিতে হবে দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প বাস্তবায়নের উপর। এখন যে কাজে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করা হবে, দু-চার বছর পর তা যেন অপ্রয়োজনীয় না হয়ে পড়ে। এরূপ ঘটলে বড় ধরনের বন্যার প্রকোপ হতে রাজধানীকে রক্ষার লক্ষ্য ব্যর্থ হবে। জানমালের ক্ষয়ক্ষতি বাড়বে। একের পর এক বড় ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে অর্থনীতির যে হাল দাঁড়িয়েছে তাতে অপচয় করার মতো সামর্থ্য বাংলাদেশের নেই।

তেইশ

টাইম ম্যাগাজিন ও দাতাদের দৃষ্টিতে বাংলাদেশ

হংকং ভিত্তিক টাইম ম্যাগাজিনের এশিয়া রিপোর্টে বাংলাদেশ এশিয়ার মধ্যে সর্বাধিক অকার্যকর রাষ্ট্র : টাইম ম্যাগাজিনের এশিয়া এডিশন রিপোর্টে (১২ এপ্রিল ২০০৪ তারিখের সংখ্যায়) বাংলাদেশকে এশিয়ার সবচেয়ে অকার্যকর রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

রিপোর্টটিতে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দারিদ্র্য ও জনসংখ্যা হ্রাসে অগ্রগতির কথা স্বীকার করা হয়েছে এবং একই সঙ্গে বলা হয়েছে, তবে দেশটি নৈরাজ্যের দিকে যেভাবে এগুচ্ছে তাতে এসব অর্জন ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। সাময়িকীটির এ পর্যবেক্ষণ বিশেষভাবে ন্যায্য এবং সর্বাধিক মনোযোগের দাবি রাখে। সাময়িকীটিতে এরপরের পর্যবেক্ষণ হল: **'একটি আধুনিক দেশ অকার্যকর হয়ে পড়ার আগে কতটুকু দুর্নীতি সহ্য করতে পারে এদেশে তার একটি রাজনৈতিক গবেষণা যেন চলছে।'**

টাইম এশিয়া সাময়িকীটির এটি একটি সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণ। বাংলাদেশের রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজ-সংস্কৃতি সর্বত্রই অর্থনৈতিক দুর্নীতিতে সয়লাব। এ কথা মানার জন্য এখন আর অনেক তথ্য উপাত্তের দরকার নেই। যথার্থ নিখুঁত এবং পূর্ণাঙ্গ না হলেও ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) নামের সংস্থাটির তথ্য-উপাত্ত-পর্যবেক্ষণে বাংলাদেশ পর পর তিনবার (২০০৪ সহ চার বার) সারা বিশ্বের মধ্যে সর্বাধিক মাত্রায়

দুর্নীতিপরায়ণ রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। বিশ্বসেরা দুর্নীতিবাজ রাষ্ট্রের আখ্যার মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক দুর্নীতি বিস্তৃতির ধারণা। আর এ সর্বগ্রাসী অর্থনৈতিক দুর্নীতিগ্রস্ততার কারণেই বাংলাদেশ একটি অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত হচ্ছে। সাময়িকীতে বাংলাদেশকে সারা বিশ্বের মধ্যে সর্বনিম্ন কার্যকর রাষ্ট্রও বলেনি, বলেছে এশিয়ার মধ্যে সর্বাধিক অকার্যকর রাষ্ট্র। আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার আরও কয়েকটি রাষ্ট্র আছে, যেখানে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব, নিয়ন্ত্রন ও কার্যকারিতা বাংলাদেশের চেয়েও কম। কিন্তু সেসব দেশের রাষ্ট্রীয় অকার্যকারিতার মূল উৎস অর্থনৈতিক দুর্নীতি নয়, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জন্য গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব বা অন্য কিছু। বাংলাদেশের মূল সমস্যা অর্থনৈতিক দুর্নীতি এবং এই অর্থনৈতিক দুর্নীতির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবেই দেশটিতে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়েছে খুন-অপহরণ-সন্ত্রাস ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা। বাংলাদেশের মূল সমস্যা অর্থনৈতিক দুর্নীতি এবং এই অর্থনৈতিক দুর্নীতির জন্য প্রধান দায়িত্ব ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতাসংশ্লিষ্ট রাজনীতিকদের। এই রাজনীতিকরা কখনও কখনও হয়তো বা কৃত অর্থনৈতিক দুর্নীতির সর্বোচ্চ সুবিধাভোগী নয়। কিন্তু তারা অবশ্যই কোন না কোনভাবে এই অর্থনৈতিক দুর্নীতির প্রশ্রয়দাতা ও সংরক্ষক। এজন্যই কখনও কখনও প্রকাশ্যে তারা অর্থনৈতিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিলেও তাদের নেপথ্য সংশ্লিষ্টতার কারণে সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক দুর্নীতির প্রক্রিয়াটি থামছে না বা বন্ধ হচ্ছে না। ফলে, বাংলাদেশ একটি অবাধ দুর্নীতির দেশে পরিণত হচ্ছে। এ থেকে মুক্ত হতে হলে অবশ্যই সবার আগে এদেশের ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতাসংশ্লিষ্ট রাজনীতিকদের এবং অতঃপর অন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের অর্থনৈতিক অর্জন-উপার্জনের ন্যায্য স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার কাঠামোগত ও নৈর্ব্যক্তিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বিশ্ব ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্টের দৃষ্টিতে বাংলাদেশ একটি অকার্যকর রাষ্ট্র হতে চলেছে ঃ ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের বৈঠক (৮, ৯ ও ১০ মে, ২০০৪) শেষ হলে বিশ্ব ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রফুল্ল সি প্যাটেল সংবাদ সম্মেলনে বলেন, বাংলাদেশকে অতিরিক্ত সাহায্য পেতে হলে আইনশৃংখলা পরিস্থিতির উন্নতি, দুর্নীতি হ্রাস, সংঘাতমুখর রাজনীতি পরিহার সহ শাসন ব্যবস্থার উন্নতি করতে হবে। তা না হলে অতিরিক্ত বা বাড়তি সহায়তা দেওয়া হবে না। আর, পরিস্থিতি আরো অবনতি হলে অনেক দাতা সহায়তা প্রত্যাহার করতে পারে। প্রফুল্ল প্যাটেল

যে কথাটা পরিষ্কার করে একটি দৈনিককে দেয়া সাক্ষাৎকারে (১১ মে ২০০৪) বলেছেন, তা হলো, দাতারা বাংলাদেশের অকার্যকর রাজনীতি নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন। দেশের সামষ্টিক অর্থনীতি এবং সামাজিক কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেশ কিছু সাফল্য সত্ত্বেও বাংলাদেশ একটি অকার্যকর রাষ্ট্র হয়ে চলেছে, এ প্রশ্ন এখন দেশে-বিদেশে আলোচিত হচ্ছে।

বিশ্ব ব্যাংক বাংলাদেশ প্রতিনিধির দৃষ্টিতে বাংলাদেশ ব্যর্থ রাষ্ট্র নয়, ভঙ্গুর রাষ্ট্র ঃ বিশ্ব ব্যাংকের আবাসিক প্রতিনিধি ক্রিস্টিন আই ওয়ালিখ বলেছেন, বাংলাদেশ ব্যর্থ রাষ্ট্র না হলেও ভঙ্গুর। বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো খুবই দুর্বল এবং এ দুর্বলতাই ভঙ্গুরতার কারণ, যা ক্রমাগত বাড়ছে। ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০০৪ ঢাকার শেরাটন হোটেলে ফরেন ইনভেস্টরস চেম্বার আয়োজিত এক সভায় তিনি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশে দুর্নীতি এখনও সর্বত্র গ্রাস করছে। ব্যবসার অনুকূল পরিবেশ নেই, সন্ত্রাস ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে, অপরাধীরা থেকে যাচ্ছে ধরা ছোয়ার বাইরে। আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি, বিচার বিভাগের অবস্থা এতই নাজুক যে, সাধারণ নাগরিক ও ব্যবসায়ীদের জন্য তা উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে ক্রিস্টিন ওয়ালিখ বলেন, সরকার ও বিরোধী দল সংঘাতময় রাজনীতির দিকে ক্রমেই ধাবিত হচ্ছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে দেশের বিনিয়োগের পরিবেশ কখনও ভাল হবে না। এর ফলে ব্যাহত হবে বিনিয়োগ প্রবৃদ্ধি। তিনি দেশের স্বার্থে প্রধান দু'টি দলকে সংঘাতময় রাজনীতি পরিহারের আহ্বান জানান। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বিশ্বব্যাংকের আবাসিক প্রতিনিধি বলেন, আমি মনে করি বাংলাদেশ ব্যর্থ রাষ্ট্র নয়, তবে ভঙ্গুর রাষ্ট্র। এর কারণ উল্লেখ করে তিনি বলেন, পুলিশ প্রশাসন, সিভিল প্রশাসন ও বিচার প্রশাসনে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এতই দুর্বল যে, সাধারণ নাগরিকরা ন্যূনতম সেবা পান না। তিনি বাংলাদেশের দুর্বল প্রবৃদ্ধির জন্য আর্থিক ও অবকাঠামোগত দুর্বলতা, অদক্ষ প্রশাসন, সংঘাতময় রাজনীতি, ক্রমাগত অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধিকে দায়ী করেন। আগামীতে জিডিপির প্রবৃদ্ধি বছরে শূন্য দশমিক ৪ শতাংশ করে কমার আশংকা প্রকাশ করেন তিনি।

যুক্তরাষ্ট্রের এশিয়া বিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্রিস্টিনার দৃষ্টিতে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। ২০০৪ সালের ৩ ফেব্রুয়ারী নিউইয়র্কে

এশিয়া সোসাইটিতে দেয়া এক বক্তৃতায় যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্রিস্টিনা রোকা বলেছেন, বাংলাদেশের প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে গভীর ও তিক্ত রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব বিরাজ করছে। বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশগুলোর শীর্ষে। এ কারণে দেশটির গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতা যেমন হুমকির মুখে পড়েছে, তেমনি এর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও ব্যাহত হচ্ছে।

রোকা আরও বলেছেন, বাংলাদেশের প্রধান সমস্যাগুলো যে আমাদের নিজেদের কাছে অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে তা নয়। আমাদের বরং মনে হয়, গত এক দশকের বেশি সময় ধরে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচিত সরকারগুলো এবং প্রধান বিরোধী দলগুলো আর সকলের চেয়ে অনেক বেশি জানে এ ব্যবস্থার সমস্যাগুলো কি। সংসদ কার্যকর হলে, সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলো কাজ করলে কী ধরনের বাস্তব সুফল ফলতে পারে এরকম অভিজ্ঞতার ছিটেফোঁটা স্বাদও তারা পেয়েছেন। ক্রিস্টিনা রোকা তার বক্তৃতায় বলেছেন, বাংলাদেশের বিরোধী দলের উচিত বিক্ষোভ ও হরতালের মতো বিঘ্ন সৃষ্টিকারী কর্মসূচী থেকে সরে এসে সংসদে যোগ দেয়া। কারণ এ ধরনের কর্মসূচী শুধু দেশবাসীর ভোগান্তিই বাড়ায় না, এর ফলে সংসদে জনগণের প্রতিনিধিত্বও ক্ষুণ্ন হয়।

মার্কিন কংগ্রেসে বাংলাদেশ ক্যাক্যাস্-এর কো-চেয়ারম্যান জোসেফ ক্রাউলিও বাংলাদেশ সফরশেষে দেশে ফিরে গিয়ে বলেছেন, বাংলাদেশের ব্যাপক দুর্নীতি ও আইনশৃংখলার চরম অবনতির কথা। কিন্তু দেশের মানুষের সমস্যাবলী নিয়ে সরকার ও বিরোধী দলের মাথা ব্যথা আছে বলে মনে হচ্ছে না। একদিকে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলছেন, আওয়ামী লীগের আমলে দেয়া লাইসেন্সের অস্ত্র দিয়ে দেশে পারিকল্পিতভাবে সন্ত্রাস চালানো হচ্ছে। বিরোধী দল কোন ইস্যু খুঁজে না পেয়ে নিজ দলীয় কর্মীদের হত্যা করে এবং পরে হরতাল ডেকে ইস্যু সৃষ্টির চেষ্টা করছে। অন্যদিকে প্রধান বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী নিজেই দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছেন। এ সরকারকে উৎখাত করার কোন বিকল্প নেই বলে বিরোধী নেত্রী তার দলের লোকজনকে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানিয়েছে।

সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যকার বিরোধ ও অসহযোগিতার সম্পর্ক বাংলাদেশকে যে এক অশুভ আবর্তে নিমজ্জিত করেছে, তা থেকে বেরিয়ে

আসার কোন প্রয়াস, কোন পক্ষেই দৃশ্যমান নয়। প্রধান বিরোধী দলবিহীন সংসদ কার্যত অকার্যকর। রাজপথে সরকার উৎখাতের ডাক এবং তৎপরতা শুরুর কথা বলা হচ্ছে। অন্যদিকে সরকার বিরোধী দলের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের কোনো প্রয়াস না নিয়ে বিরোধ জিইয়ে রাখা এবং মাঝে মাঝেই উস্কানিমূলক উক্তি করে বিরোধী দলকে ক্ষেপানোর খেলায় মেতে রয়েছে। ফলে দেশের বর্তমান সমস্যাগুলো ক্রমশ আরো জটিল ও গুরুতর আকার ধারণ করছে আর ভবিষ্যৎ হয়ে উঠছে ভীষণভাবে অনিশ্চিত। তাই বিরোধ ও বৈরিতার রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। দেশের উন্নতি ও জনগণের কল্যাণের জন্য তাদের আন্তরিক অঙ্গীকার থাকা প্রয়োজন। সে শুভ উপলব্ধি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মনে জাগ্রত হোক, এই কামনা করা ছাড়া আমারা আর কী-ই বা করতে পারি। (৮ ফেব্রুয়ারী, ২০০৪ একটি দৈনিকে প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে)

উপসংহার

দেশে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা অনেক। কিন্তু প্রকৃত অর্থে দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি এখনও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক মুক্তি তথা জাতির অর্থনৈতিক মুক্তিমুখী হতে সক্ষম হয়নি। দেশের সিংহভাগ মানুষের দারিদ্র্য-পীড়ার মধ্যে বিরাজমান রাজনৈতিক দূবৃত্তায়ন, ব্যাপক সন্ত্রাস ও নজিরবিহীন দুর্নীতিগ্রস্ততার ফলশ্রুতিতে সংকটাপন্ন আর্থ-সামাজিক পরিবেশ প্রকৃত গণতন্ত্রের কাংক্ষিত প্রাতিষ্ঠানিকতায় এক জটিল প্রতিবন্ধক। গণজীবনমুখী শিক্ষানীতি ও গণ উন্নয়নমুখী অর্থনীতির মধ্যে সমন্বয়হীনতার কারণে দেশে মানব উন্নয়নের গতি ব্যাহত ও বাধাগ্রস্ত এবং দেশ আজ ক্ষমতাকেন্দ্রিক অদূরদর্শী রাজনীতির শিকার। এ গ্রন্থে বর্ণিত সমস্যাবলীর দুষ্ট চক্রে আবদ্ধ দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সামষ্টিকতার সীমানা পেরিয়ে গণউন্নয়ন তথা ব্যাষ্টিকতায় বিস্তৃত হতে পারছে না। জাতীয় প্রবৃদ্ধির হার এবং মাথাপিছু আয়ে কাংখিত উন্নতিও সাধিত হচ্ছে না। দেশের অধিকাংশ মানুষ অজ্ঞানতার কারণে এসব পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন নয়। সংশ্লিষ্টরা তা' করতে চায় বলে মনেও হয় না। যে কারণে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, মাথাপিছু আয় এবং মানসম্পন্ন শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ যেমন এতদিনেও নিশ্চিত

হয়নি, তেমনি দেশকে 'দরিদ্রতম' উপাধির কলংক থেকে মুক্ত করাও সম্ভব হয়নি। এমতাবস্থায়, সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবধর্মী মানব উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন জরুরী। সে লক্ষ্যে অবিলম্বে সবার জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষা, সুস্বাস্থ্য ও সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ এবং তার বাস্তবায়ন অত্যাবশ্যক। তবে দেশে মানবাধিকার বাস্তবায়ন, আইনের শাসন, জনগণের অংশগ্রহণমূলক প্রকৃত গণতন্ত্র ও 'বটম-আপ' নির্বাচন পদ্ধতি ও উৎপাদনক্ষম রাজনীতি প্রতিষ্ঠা এবং তা' অব্যাহত রাখার ওপরই এ সমন্বিত কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়ন নির্ভরশীল। বিরাজমান সংকটময় পরিস্থিতি মোকাবেলার লক্ষ্যে দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় আমূল সংস্কার অত্যন্ত জরুরী, যাতে দেশে দক্ষতা, সততা, সহনশীলতা ও ন্যায়-নীতি ভিত্তিক একটি ফলপ্রসূ রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও জনপ্রশাসন গড়ে ওঠতে পারে এবং রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে সুশাসন অব্যাহত থাকতে পারে। বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি সৈয়দ জে, আর মোদাস্‌সির হুসেইন বলেছেন, শক্তি ও অস্ত্রের গুণে নেতৃত্ব দখল করা যায়, কিন্তু নেতা হওয়া যায় না। যারা নিজেদের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে পরের স্বার্থ রক্ষায় কাজ করেন তারাই নেতা। গত ২০ মে, ২০০৪ চট্টগ্রাম বন্দর নগরীর মুসলিম ইন্সটিটিউট হলে আয়োজিত অবিভক্ত ভারত ও বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য মরহুম খান বাহাদুর বদি আহমদ চৌধুরীর ৪২তম স্মরণসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। প্রধান বিচারপতি বলেন, সমাজে অনেক অবস্থাপন্ন শিক্ষিত মানুষ আছেন যাদের মধ্যে জনসেবার আকুতি নেই। অথচ সমাজে মানবতা আজ বিপর্যস্ত, বিপন্ন। চারদিকে বিরাজ করছে অশান্তি। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে আমাদের উচিত মহাপুরুষদের জীবনাচরণ ও কর্ম অনুশীলন করা। প্রশ্ন হচ্ছে, দেশের বিজ্ঞ রাজনীতিকরা তা' করেন কি? তাঁরা শুধু তাঁদের স্ব-স্ব দলীয় নেতা-মহান নেতাদের আদর্শ বাস্তবায়নের সংগ্রাম এবং দেশ ও জাতির উন্নতি সাধনের প্রতিশ্রুতিতেই তেত্রিশ বছর পার করে দিলেন। কিন্তু তাতে কি তাঁরা সফল হতে পেরেছেন? আজ তাঁদের কাছে দেশবাসীর একটিই প্রশ্ন, আর এভাবে কত সময় নিতে চাঁন তারা? এ প্রশ্নের সঠিক জবাব তাঁরা দেবেন কি? যদি না পারেন, দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে স্বাধীনতার প্রায় তিন যুগের ব্যর্থ রাজনীতিকদের অবসর গ্রহণ করা শ্রেয় নয় কি?

-সমাপ্ত -